

শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের  
পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে  
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত  
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক  
সাবলু বর্মণ

তত্ত্বাবধায়ক  
অধ্যাপক (ড.) অক্ষয় ভট্ট  
বাংলা বিভাগ  
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ  
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়  
সেপ্টেম্বর, ২০১৭



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম: ৩০ শে মার্চ, ১৮৯৯

মৃত্যু : ২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

## ঘোষণা

আমি 'শরদিন্দুর ইতিহাসাপ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস' শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এটি অধ্যাপক (ড.) অক্ষুশ ভট্টের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোন অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

সাবলু বর্মণ  
২০.০৯.২০২৭(ইং)

(সাবলু বর্মণ)

গবেষক,

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, সূচক - ৭৩৪০১৩

অধ্যাপক (ড.) অক্ষুশ ভট্ট  
অবসৃত অধ্যাপক,  
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়



ডাকঘর : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি  
রাজা রামমোহনপুর, জেলা : দার্জিলিং  
সূচক - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : .....

তারিখ : .....

### শংসাপত্র

সাবলু বর্মণ আমার তত্ত্বাবধানে 'শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস' শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভ তাঁর মৌলিক রচনা।

এটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা বিভাগ) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি। আমি সাবলু বর্মণের সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক (ড.) অক্ষুশ ভট্ট)

অবসৃত অধ্যাপক,

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,

ডাকসূচক সংখ্যা- ৭৩৪০১৩

## গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

রবীন্দ্র-পরবর্তীযুগের বাংলা কথাসাহিত্যের একজন খ্যাতিমান কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোল পত্রিকার সমকালীন হয়েও তিনি কখনো কল্লোলের লেখক ছিলেন না। প্রধানত: বসুমতী, ভারতবর্ষ ও প্রবাসী পত্রিকাকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন। কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্যকে তিনি কখনোই মানতে পারেননি। কল্লোলপত্রীরা যেভাবে বাস্তবতাকে গ্রহণ করে গল্প ও উপন্যাসে মানব জীবনের উন্মোচন ঘটাচ্ছিলেন সেই তীব্র কটুবাস্তব জীবন চর্চার জগৎ থেকে সরে গিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক অভিনব সৌন্দর্য চেতনার জগৎ। জীবনের অর্থকে তিনি সমকালীন লেখকদের মতো দারিদ্র্য বিলাসে বা যৌনচেতনার গূঢ় অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে খোঁজেননি; জগদীশ গুপ্ত বা মানিকের মতো নিয়তি বা অদৃষ্ট কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টি প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যেও অনুসন্ধান করেননি ; এক দেশ-কালাতিশায়ী নির্বিশেষ সৌন্দর্যলোক সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় তাঁর শিল্পীমন সর্বদাই উপযুক্ত জীবনপটের সন্ধান করে গেছে। শরদিন্দুর কথায় — “রসসৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়।” আর বাংলা সাহিত্যে তিনি রোমান্স যুগেরই ব্যাপ্তি দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কিছু মন্তব্য না করলেও একটি মন্তব্য থেকে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়— “যেদিন সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যকার রিয়ালিস্টিকের আবির্ভাব হয় সেদিন তার রসের ফসলে অজন্মা দেখা দেয়, সাহিত্যের সেটা ডিকেডাস।” এই সাহিত্য দৃষ্টি এবং সৌন্দর্যবোধ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। শরদিন্দু রিয়ালিস্ট নন, তাঁর কবি দৃষ্টিতে রোমান্স চেতনা আর লিরিক কবির ধর্ম দুই-ই মিশে আছে। বিংশ শতকের আধুনিক পাঠকের খণ্ড-বিখণ্ডিত ক্লিষ্ট মনকে তিনি দূরবিসর্পিত অতীতশয়ী জীবনের বিস্তৃত আকাশে ডানা মেলে উড়বার আনন্দ এনে দিয়েছেন। তাঁর রচনায় কিন্তু জীবন পলাতকের মনোবৃত্তি নেই, আছে জীবনকে সহজ সরল অনাবিল অনুভবের মধ্যে আশ্বাদনের ইচ্ছা। যেহেতু স্বকালের স্থানিক পটভূমিতে সেই পূর্ণবৃত্ত জীবনের রসাস্বাদনের সম্ভাবনা নেই, তাই তিনি দেশ ও কালের অতীত এই সমগ্রতার সন্ধানে তাঁর গল্পের পটভূমিকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন কখনো দূর অতীতে, কখনো অতিপ্রাকৃতে, আর কখনোবা ডিটেকটিভ গল্পের অঙ্গণে। ডিটেকটিভ গল্পের মূল কথাও এই সহজ জীবনানন্দকে অনাবিল করা। যে আদিম অপরাধ প্রবণতা মানুষের এই সহজমুক্ত জীবনের উপর চেপে বসে তাকে ধ্বংস করত উদ্যত হয় — তার হাত থেকে জীবনের সহজ রূপকে মুক্তি দেওয়াই ডিটেকটিভের কাজ। এতেও আছে জীবনপ্রীতির একটি বৈশিষ্ট্য। শরদিন্দু নিজেও একথা স্পষ্ট বলেছেন — “ডিটেকটিভ গল্প সত্যই

অবজ্ঞার পাত্র নয়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্র এত প্রশস্ত যে তাহা অসীম বলিলেও অতুক্তি হয় না। ... ডিটেকটিভ গল্প যদি অপাঙক্তেয় হয় তবে historical romanceও অপাঙক্তেয়। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? একটি অতীতের রোমান্স অন্যটি বর্তমানের romance।”

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৯২৯ থেকে তাদের কালসীমার সূচনা। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ‘জাতিস্মর’ (১৯২৯), ‘বোমকেশের কাহিনী’ (১৯৩৪), ‘ডিটেকটিভ’ (১৯৩৭), ‘চুয়াচন্দন’ (১৯৪২), ‘কাঁচামিঠে’ (১৯৪২), ‘দত্তরুচির’ (১৯৪৬), ‘পঞ্চভূত’ (১৯৪৬), ‘শাদাপৃথিবী’ (১৯৪৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরসগল্প’ (১৯৫২), ‘কালকূট’ (১৩৫১), ‘গোপন কথা’ (১৩৫২), ‘বুমের্যাং’ (১৩৫৩), ‘ছায়াপথিক’ (১৩৫৬), ‘বিষকন্যা’ (৩য় - সংস্করণ, ১৩৫৯), ‘দুর্গরহস্য’ (১৩৫৯), ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ (১৩৬১), ‘কানু কহে রাই’ (১৩৬১) এবং গল্প সংগ্রহ ‘মায়াকুরঙ্গী’ (১৩৬৫)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — ‘কালের মন্দির’ (বাংলা ১৩৫৮, ইং. ১৯৫০), ‘গৌড়মল্লার’ (বাংলা ১৩৫৯, ইং. ১৯৫২), ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ (বাংলা ১৩৬৫, ইং. ১৯৫৮), ‘কুমার সম্ভবের কবি’ (বাংলা ১৩৭০, ইং. ১৯৬৩), ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৭২, ইং. ১৯৬৩-১৯৬৫), ‘ঝিন্ডের বন্দী’ (প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৪৫, ইং. ১৯৩৮)। ‘বিষের ধোঁয়া’ (বাংলা ১৩৪০, ইং. ১৯৩৩), ‘ছায়াপথিক’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬, ইং. ১৯৪৯), ‘দাদার কীর্তি’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, ইং. ১৯১৫ লেখা হয়), ‘মনচোরা’ (বাংলা প্রথম প্রকাশ ১৩৭০, ইং. ১৯৬৩) ইত্যাদি। এছাড়াও কাব্য, নাটক, চিত্রনাট্য, দিনলিপি, মনকণিকা, চিঠিপত্র, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট মুনশীয়ানা দেখিয়েছেন।

তিনি বিভিন্ন ধারার গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই রস সাধক শিল্পীর গল্প ও উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি :

যেমন — ১. ইতিহাসাশ্রিত গল্প (জাতিস্মর প্রসঙ্গ মূলক গল্প)

২. ডিটেকটিভ গল্প

৩. অতিপ্রাকৃত গল্প

৪. সামাজিক-পারিবারিক

৫. হাসির গল্প

৬. অন্যান্যশ্রেণির গল্প (কিশোরদের গল্প ইত্যাদি)

উপন্যাসগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে ভাগ করে নিতে পারি —

১. ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস

## ২. পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস

**ভূমিকা :** রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত রসসাহিত্যিক। বস্তুনিষ্ঠ রচনা নয়, রসসৃষ্টিই তাঁর মূলকথা। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য সম্ভার তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রাচীন ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি এইসব গল্প-উপন্যাসগুলির প্রাণ। শুধু তাই নয়, এখানে ইতিহাস মুখ্য নয়, সৃজনী কল্পনাই কিন্তু মুখ্য বিষয়। ইতিহাস এবং রসসাহিত্যের পার্থক্যটুকুও কিন্তু তার এই ধারার গল্প-উপন্যাস পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি তাঁর এই ইতিহাসাশ্রিত গল্প-উপন্যাসগুলি নিয়ে আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভটি তৈরি করেছি।

**প্রথম অধ্যায় :** ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিগূঢ়। অতীতের সাহিত্য থেকে যেমন ইতিহাসের তথ্য নিষ্কাশন করা হয় তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচনাও হয়ে থাকে। মহাভারত থেকে যেমন আমাদের দেশের ইতিহাস জানা যায় তেমনি হোমারের মহাকাব্য থেকে গ্রীকদের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করা হয়। ইতিহাস অতীত কাহিনি, ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ, অতীতকালের মানুষের জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে কালজ্ঞানের ও তথ্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে। সেখানে কল্পনার কোনো স্থান নেই। ইতিহাসই মুখ্য। কিন্তু একজন লেখক যখন উপন্যাস লেখেন তখন কিন্তু তাকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তিনি ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে সাহিত্য সৃজন করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে বর্ণিত সেই অতীত যুগের মেজাজ ও মানসিকতা, যুগজীবন ও সভ্যতাকে যে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। উপন্যাস আগে পরে ইতিহাস। তাই-ই ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখকের ভাষার Fictionised History নয়, Historical Fiction। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ইতিহাস ও ইতিহাসের সামগ্রিক উপাদান ও লেখকের কল্পনা-প্রবৃত্তির জারক রসেই নির্মিত উপন্যাসই ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তাঁদের কিছু বিশিষ্ট লেখার ভিতর থেকে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসাশ্রিত রচনার চরিত্র নিরূপণ করা করেছি।

**দ্বিতীয় অধ্যায় :** শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাস কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে কিংবা কতটা ইতিহাসমুখ্য রচনা আমি তারও বিচার ও মূল্যায়ন করেছি। তিনি ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন বাংলা কিংবা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি। এ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইতিহাস ও ইতিহাসের উপাদান, প্রাচীন শব্দ নিয়ে আলোচনা, পরামর্শ তার প্রমাণ। শরদিন্দু ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন কিন্তু ইতিহাসবিদ ছিলেন না। তথাপি তাঁর লেখাগুলিতে ইতিহাস যতটুকুই থাক না কেন, ছোটগল্প

উপন্যাস সৃষ্টিতে কিন্তু তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা ফ্রেম এবং উপাদান ইতিহাসের, লেখক শুধুই কল্পনা, অনুভূতি ও উপলব্ধিকে সংযোজনায় মূর্ত করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও গল্পের পটভূমিতে যে ইতিহাসের ছায়া আছে এখানে তার ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি।

**তৃতীয় অধ্যায় :** শরদিন্দু তাঁর গল্পের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় জীবন প্রণালীকে মূর্ত করে তুলেছেন। এগুলির অধিকাংশই তাঁর স্বকপোল কল্পিত — কিন্তু ইতিহাসের দূরছায়া বিসর্পিত এই রচনাগুলি কখনোই ইতিহাসের গোত্রবিচ্যুত নয়। ইতিহাসকে কীভাবে গল্প উপন্যাসে ব্যবহার করা যায় তারও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ কৌশলকেই মুখ্য হিশেবে বেছে নিয়েছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের কাহিনিকে অবলম্বন করে মোট সতেরটি ছোটগল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। গল্পগুলি মূলত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গল্পগুলি হল — ১. ‘অমিতাভ’, ২. ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ৩. ‘মৃৎপ্রদীপ’, ৪. ‘বাঘের বাচ্চা’, ৫. ‘রুমাহরণ’, ৬. ‘অষ্টমসর্গ’, ৭. ‘চুয়াচন্দন’, ৮. ‘বিষকন্যা’, ৯ ‘চন্দন-মূর্তি’, ১০. ‘সেতু’, ১১. ‘মরু ও সগুঘ’, ১২. ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’, ১৩. ‘তক্ত্ মোবারক’, ১৪. ‘ইন্দ্রতুলক’, ১৫. ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ১৬. ‘বেরা রোধসি’ এবং ১৭. ‘আদিম’। ড. সুকুমার সেন ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাংশে যথার্থই বলেছেন — “দূরকালের ইতিহাসকে বর্তমানকালের গোচরে আনবার যে অভিনব কৌশলটি শরদিন্দুবাবু অবলম্বন করেছেন তা হ’ল জাতিস্মর কল্পনা। শরদিন্দুবাবু জাতিস্মর ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা ঠিক জানি না — বোধ হয় ছিলেন। কিন্তু সে যাইহোক তিনি যে গল্প রচনায় স্বীয় জাতিস্মরতা প্রতিপন্ন করেছেন তা সহৃদয় পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন।” এই সতেরটি গল্পের মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধযুগের ও কালের কেননা এই যুগের প্রতি শরদিন্দুর আলাদা আকর্ষণ ছিল। এছাড়া হিন্দু সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়েও তিনি গল্প ফেঁদেছেন। ‘অমিতাভ’ গল্পটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’ (১৩৩৯)-এর অন্তর্ভুক্ত। লেখক ‘অমিতাভ’ গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — “অমিতাভ গল্পের মূলে একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই।” বৌদ্ধযুগের অনুসঙ্গ গল্পটিতে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধদেবের কথা প্রসঙ্গে সেকালের জীবনযাত্রার প্রণালী ও মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পটিতে। দুই বা ততোধিক জাতিস্মরতায় প্রবেশ করে লেখক বৌদ্ধযুগ, কণিষ্কের যুগের জীবনকাহিনি বিধৃত করেছেন। ইতিহাসের অনুসঙ্গ থাকলেও গল্পটি মূলত মানবিক আবেদনে পূর্ণ। এই ধারার প্রায় আরও পাঁচটিরও বেশি গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলিতেও মূলত প্রাচীন ভারতবর্ষের পৌরাণিক তথা ক্ল্যাসিক্যাল জীবনধর্ম ও রাজ রাজ্যের কাহিনি চকিতে বর্ণনা করে

ধূসর অতীতকে খুব সহজে বর্তমানের তথা নিকটের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে মিলিয়ে দিয়েছেন। দূরের দৃশ্যপটকে নিকটের দৃশ্যপট করে অঙ্কন করেছেন। ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘সেতু’, ‘বিষকন্যা’, ‘রুমাহরণ’ প্রভৃতি গল্পগুলিতেও লেখক ইতিহাসের বিশেষ পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে গল্প গড়ে তুলেছেন। তিনি আনুমানিক দুই হাজার, আড়াই হাজার কিংবা আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাসকে স্থান দিয়েছেন। এছাড়াও ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পে আর্যদের আগমনের পূর্বের ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু যুগটির অসাধারণ বর্ণনা উঠে এসেছে। ‘রুমাহরণ’ গল্পে প্রাচীন নৃগোষ্ঠীগুলির নারীহরণ প্রক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের লড়াই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাব ও ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে লেখক মানুষের উদগ্র কামনার ছবি ও জিঘাংসার মনোভাবটিকে রূপ দিয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও ষড়যন্ত্র স্পৃহা কতটা যে নিচে নেমে যেতে পারে তার রূপচিত্র দেখতে পাওয়া যায় এই গল্পটিতে। ‘বিষকন্যা’র মতো গল্পে একটি নারীর জন্ম-সংক্রান্ত কুসংস্কার কীভাবে তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গল্পটিতে। অন্যদিকে ‘আদিম’ গল্পটি একটু অন্য জাতের। মিশরের পটভূমিকায় গল্পটি রচিত। ‘ভাই-ভগিনী’র বিয়ে আমাদের বাঙালী সমাজে ঘণ্য ঠেকে। কিন্তু মিশরীয় সভ্যতায় সেটাই আবার প্রচলিত প্রথা। সেই প্রচলিত প্রথা ভাঙার লড়াই আমরা দেখতে পাই এই ‘আদিম’ নামক গল্পটিকে।” এই অধ্যায়ে আমরা এই গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করে শরদিন্দুর গল্পে ইতিহাসের অনুষ্ঙ্গ ব্যবহারের কৌশলটি পর্যালোচনা করেছি। কী অভিনব উপায়ে তিনি ইতিহাসের সংস্পর্শে কাহিনিগুলিকে গঠিত করে তাকে এমন আকর্ষণীয় করে তুললেন — দীর্ঘ অতীতের অন্ধকার থেকে একটা জীবনের আলোকরেখা পুনর্নির্মাণ করে তুললেন — এই অধ্যায় তারই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।

**চতুর্থ অধ্যায় :** ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে আমরা শরদিন্দুর বিশেষ কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের আলোচনা করেছি। উপন্যাসগুলি হ’ল— ‘কালের মন্দির’, ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, ‘ঝিন্দের বন্দী’ ইত্যাদি। ‘কালের মন্দির’র পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — “গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সময় হুণ আক্রমণের পটভূমিকায় এই কাহিনী বর্ণিত। আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক; কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক। পটভূমিকা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণ) হইতে গৃহীত।” উপন্যাসটির ঘটনা মূলত পঞ্চনদ প্রদেশের ক্ষুদ্র পাহাড়ী বিটক রাজ্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে। একদা দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক এই রাজ্যটি হুণদের হাতে অধিকৃত ছিল। স্কন্দগুপ্ত ও বিটকের রাজা রোড়ধর্মাদিত্যের বাক্ব বিতণ্ডা, করপ্রদানে অস্বীকার হেতু দুর্গে বন্দী হওয়া ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। চষ্টনের অধিপতি কিরাত বিটকের রাজা রোড়ধর্মাদিত্যকে দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। রত্নাযশোধরা পিতাকে উদ্ধারের

জন্য স্কন্দের শরণ নিলেন। স্কন্দের চরিত্রটি ঐতিহাসিক তা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন। চিত্রকবর্মার সঙ্গে যশোধরার প্রেম লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। প্রেম ও প্রতিহিংসা এই দু'য়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শরদিন্দু এই উপন্যাসে মানব হৃদয় ও মানব চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে মানুষের অন্তর্লোকে আলো ফেলেছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিছক অতীত যুগের হয়ে থাকেনি বর্তমান কালেরও হয়ে উঠেছে। ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ও ‘ঝিন্দের বন্দী’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতেও লেখক ইতিহাস প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের জটিল রহস্য, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র, কামনা-বাসনা, প্রেম-ভালোবাসা এককথায় গোটা মানুষের জৈবিক রূপ তথা মানবিক রূপটিকে সুপরিষ্কৃত ভাবে অঙ্কন করবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন — “... আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন — এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ — কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না — কিন্তু আপনার বই পড়িবে।” (চিঠি, ২৬ নভেম্বর ১৯৬৫) সত্যিই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলি আজও সমানভাবে আদৃত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতেও এর জুড়ি মিলবে না। লক্ষণীয় তিনি অতীত ঐশ্বর্যকে, অতীত গৌরবকে পুনর্নির্মাণ করে প্রাচীন ভারতীয় জীবন-যাপন পদ্ধতিকে নিখুঁতভাবে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন। তাঁর এই সফলতার নেপথ্যে ইতিহাসের পুনর্গঠনই মুখ্য হাতিয়ার।

**পঞ্চম অধ্যায় :** তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ কৌশল বিশ্লেষণে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, প্রতিবেশ, আখ্যান-বিন্যাস, চরিত্র বিশ্লেষণ ও ভাষাশৈলীর প্রসঙ্গ। তাঁর রচিত আখ্যান মূলত স্বতন্ত্র ধরণের। প্রথাগত আখ্যান নির্মাণ পদ্ধতির পথ ছেড়ে তিনি নিজস্ব রচনা রীতির ওপর নির্ভর করে সাহিত্য সৃজন করেছেন। সেক্ষেত্রে অতীত ইতিহাসের পটভূমি ও প্রতিবেশকে আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করে দূরকালের জীবনচিত্রকে বর্তমানকালের জীবনপটে বিধৃত করেছেন। এর জন্য কিন্তু তাঁকে জাতিস্মর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা। অন্যদিকে চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপন ও ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার আখ্যানকে আরও মজবুত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমি পরবর্তীকালে উল্লিখিত বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রেখেছি। শুধু তাই নয়, তিনি কীভাবে, কী উপায়ে, এই অভিনব প্রকরণ কৌশলের প্রয়োগ ঘটালেন তারও অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে গেলে প্রথমেই লেখকের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে style দেখাবার প্রয়োজন নেই, মনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিটিকে প্রকাশ করাটাই একান্ত

জরুরী। তাহলেই style আপনি স্বতোৎসারিত হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তিনি এও বলেন যে, ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতন, বেতো ঘোড়ার মতন নয় — শুধু গতিবেগ নয় — ছোট্টার মধ্যেও যেন সৌন্দর্য ফুটে বেড়ায়। — এরকম মন্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিছক বাঁধা ধরা style সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অমনোযোগী। তবে ভাষার যথাযথ প্রয়োগের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। কেননা, তিনি বলতেন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটিও যেন অযথা শব্দ এসে না পড়ে। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যগুলিতে সেই কথাই যথাযথ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যটি লক্ষ করবার মতো — “শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগর সঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুঞ্চিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই — স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর।” (শরদিন্দুর অমনিবাস ১-ম খণ্ডের ভূমিকাংশ)। অপরপক্ষে সাহিত্যিক রাজশেখর বসুও শরদিন্দুর ভাষা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। লক্ষণীয় শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত গল্প উপন্যাস পাঠে তা উঠে এসেছে। তিনি যখন জাতিস্মর ধারার ইতিহাস প্রসঙ্গ মূলক গল্পগুলি লেখেন সেখানে ভাষা হয়ে ওঠে ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা। ওজস্বী, আড়ম্বরপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর। তাঁর ব্যবহৃত ভাষাই যেন চিনিয়ে দেয় এই গল্প উপন্যাসটি তাঁরই রচনা। এখানে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে ধ্রুপদীযুগের জীবনচিত্রের পরিপূরক। প্রাচীন ভারতীয় প্রবহমান সংস্কৃতির চিত্র অঙ্কনে প্রবহমান ভাষারই ব্যবহার দেখা যায় তাঁর লেখাগুলিতে। যেমন— “তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তম্বী; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মন:শিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে।” (সেতু, পৃ. ১৯৩) ‘সেতু’ গল্পটি ব্যতিরেকেও ‘রুমাহরণ’, ‘অমিতাভ’, ‘রক্তসন্ধ্যা’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে লেখক অতীত যুগ জীবনকে বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করতে গিয়ে উল্লিখিত ভাষা রীতিরই আশ্রয় নিয়েছেন। উপন্যাসগুলিতেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে খাঁটি ইতিহাস নির্ভর গল্পগুলিতে কিন্তু সাধু-চলিত ও চলিত-সাধু উভয় রীতির পরিচয় পাই। যেমন— ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পে — ‘ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কালরাত্রি প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম’ খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট

হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।” স্পষ্টতই লক্ষণীয় ব্যবহৃত এই ভাষা আমাদের অন্য চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে সাধু-চলিত আবার চলিত-সাধু রীতির প্রয়োগ কী অপূর্বভাবে করেছেন তিনি। ‘গুরু চণ্ডালী’ ভেদাভেদকে তিনি মান্যতাই দেন নি। ফলত প্রথম বাক্যের শেষে ‘পড়তে’ ‘পড়তে’ চলিত রীতির ক্রিয়াপদ পরক্ষণেই দ্বিতীয় বাক্যে কথকের কথায় ‘পড়িতে’ ‘পড়িতে’ সাধু রীতির ক্রিয়াপদে পরিণত হয়েছে। এরকম বহু উদাহরণ চোখে পড়বার মতো। কারণ হিশেবে বলা যায় যে, কথাকার ভাষার গতিকে প্রবহমান করতে চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে, ক্রিয়াপদের জাড্যদোষ মুক্ত করতে, আখ্যানের সাবলীল গতি আনতে এরকম মিশ্র রীতির ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন। পেয়েছেন কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, ভারততাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদদের অকৃত্রিম প্রশংসাও। তাঁর উপন্যাসের ভাষাতেও এসেছে ধূসর মায়াময় জগতের বাস্তব রূপচিত্র। প্রাচীন কালের অনির্দেশ্য চিত্রাঙ্কন, সংস্কৃতির অন্তর্ভলয়, গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মানুষের মানুষে হানাহানি, জটিল জীবনাবর্ত, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা ও দ্বন্দ্বমথিত প্রেম তাঁর উপন্যাসগুলিতেও বর্তমান। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি থেকে উদাহরণ চয়ন করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে — “কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দু’টি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাঁহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্গিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল।” (তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৪৬) রূপাসক্তি, লোভ, লালসা, উদগ্রকামনা মানুষকে যে কতটা নৈতিক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ এই উপন্যাসের কম্পনদেব চরিত্রটি। নারীর প্রতি অনির্বাণ মোহ শুধু সে যুগে কেন এযুগেও বর্তমান ভবিষ্যতেও থাকবে। লেখক শরদিন্দু কৌশলে মানুষের অমিতাচারী জৈবিক ক্রিয়াকে চিরকালের সমস্যা রূপে দেখাতে চেয়েছেন। বিপ্রতীপভাবে মহারাজ দেবরায়কে শৌর্ষবীর্ষ ও শাস্ত সমাহিত জৈবিক মানুষ রূপে অঙ্কন করেছেন। জৈবিক চাহিদা মানুষের সহজাত। কিন্তু মানুষই পারে তাকে শুচিন্মিত করে তুলতে। যিনি পারেন তিনিই তো মহৎ। যিনি পারেন না তিনি তো অসৎ। এই দুই বিপরীত মুখী ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব লেখক রূপদঙ্কের মতো চিত্রিত করেছেন। এছাড়াও উপন্যাসটির পাতায় পাতায় আরও নানা দিকের পরিচয় উঠে এসেছে। কারণ নিরপেক্ষ যুক্তি নির্ভর বিচার ও বিশ্লেষণেই একটি উপন্যাস ও রচয়িতার সঠিক ধারণার ও মনস্তিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

**উপসংহার :** কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মনস্তিতার পরিচয়ের পাশাপাশি পুরাতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিকতারও পরিচয় লাভ করি তাঁর গল্প উপন্যাসগুলির

পাঠের মধ্য দিয়ে। তিনি একাধারে সুসাহিত্যিক ও সমালোচকও বটে। তিনি সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে কবি, লেখক ও ঔপন্যাসিকদের লেখা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ মেনে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের যুগবৈশিষ্ট্যকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি জাতির ইতিহাসানুসন্ধান করে গেছেন আজীবন। শরদিন্দুর সাহিত্যের প্রেক্ষাপট শুধু বাংলা বা বাঙালির নয়, ভারত তথা ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি। বাংলা সাহিত্যে তিনি তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতির যুগের লেখক হয়েও এই তিনজন লেখকের জগৎকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

**পরিশিষ্ট :** এই অধ্যায়ে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাচীন শব্দ ও জনপদের উল্লেখ করে তার পরিচয় ও ব্যবহারের তাৎপর্য আলোচনা করেছি। এখানে কিছু প্রাচীন শব্দ ও জনপদের পরিচয় দেওয়া হ'ল : পটমহাদেবী, মিথিলা, কুমরাহার, উজ্জয়িনী, বিজয়নগর, গৌড়, পুরোডাশ, স্থপতি, পরাত, নবপত্রিকা, ইন্দ্রকীলক, কূটমল, মুঙ্গের, বৈশালী, লিচ্ছবি, কঞ্চুকী ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রাচীন শব্দ ও জনপদগুলি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কায়া নির্মাণে ও প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্গঠনে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে প্রাচীন 'কঞ্চুকী' শব্দটির ব্যবহার আখ্যান নির্মাণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তারও আলোচনা করেছি।

## নিবেদন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়বার সময় উপন্যাস ও ছোটগল্প বিশেষ পত্র হিশেবে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রতি আমার অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে তাই আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক (ড.) অক্ষুশ ভট্ট মহাশয়কে তত্ত্বাবধায়ক হিশেবে বেছে নিই। অধ্যাপক ভট্ট মহাশয়ের সান্নিধ্য, সহযোগিতা ও পরামর্শক্রমে “শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস” শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরি করি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরিতে উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করেছেন বিভাগীয় অধ্যাপিকা (ড.) মঞ্জুলা বেরা, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক (ড.) সুবোধকুমার যশ, (অবসৃত অধ্যাপক), বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক (ড.) নিখিলেশ রায়, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক (ড.) মীর রেজাউল করিম, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান কর্মক্ষেত্র আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক (ড.) দীপককুমার রায়, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান কর্মক্ষেত্র রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক (ড.) উৎপল কুমার মণ্ডল মহাশয়, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. তপনকুমার মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান কর্মক্ষেত্র ডায়মণ্ড হার্বার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। পাশাপাশি আমার বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষণারত ও ডিগ্রী লাভকারী সহপাঠী গবেষক ভাই, বন্ধু, বিভাগীয় অফিসকর্মী এবং মুদ্রণকার শ্রীবুবুনকুমার বর্মণের সহযোগিতার কথা অনস্বীকার্য।

তারিখ : ২০.০৯.২০১৭ (ইং.)

সাবলু বর্মণ

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

## সূচিপত্র

নিবেদন		
মুখবন্ধ	....	i-viii
প্রথম অধ্যায় : বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ধারা	....	১-২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের ভূমিকা	....	২২-৪৭
তৃতীয় অধ্যায় : শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ	....	৪৮-১২৩
চতুর্থ অধ্যায় : শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ	....	১২৪-২০৫
পঞ্চম অধ্যায় : শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিচার	....	২০৬-২৩৭
উপসংহার	....	২৩৮-২৩৯
গ্রন্থপঞ্জি	....	২৪০-২৪৭
পরিশিষ্ট	....	২৪৮-২৫০
নির্ঘণ্ট	....	২৫১-২৫২

## মুখবন্ধ

‘ইতিহাস’ বলতে আমরা জানি, ইতি-হ + আস্ অর্থাৎ অতীতে যে রূপে ছিল। ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের ভিন্ন ভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ইতিহাস হ’ল— “মানুষদের একটা সময়ের বিজ্ঞান।”<sup>১</sup> আবার ইতিহাসকে বলা যায়, সমসাময়িক বিষয়ের চর্চা ও আলোচনা। এককথায় মানুষের সামগ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা হ’ল ইতিহাস। সময় থেমে থাকে না। পলকে পলকে বর্তমান অতীত হয়ে যায়। আর এই নিকট অতীত, দূর অতীত, দূরের দৃশ্যপট, কাছের দৃশ্যপট মিলে মিশে ইতিহাস রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ‘মহাভারত’ সম্পর্কে বলেছেন—“ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।”<sup>২</sup> আবার এই গ্রন্থেই রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই মন্তব্য করেছেন— “মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানব সমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।”<sup>৩</sup> কাজেই ইতিহাস বললেই যে একটা কাঠখোঁটা শুষ্ক ধারণার কথা আসে তা কিন্তু নয়। যেখানে মানুষ ও তার সভ্যতার ইতিহাস থাকে তাকে কখনোই নিঃসার বলতে পারি না। আশীন দাশগুপ্ত তাঁর ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’ গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন—“অতীত এবং ইতিহাসের অতীত এক নয়। সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষ নবাগত। ... ইতিহাসের অতীত যেহেতু সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত সে জন্য সাধারণ অতীতের সামান্য অংশ। অন্যদিকে অতীত প্রতি মুহূর্তের সৃষ্টি।”<sup>৪</sup> অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে মানুষের দূর অতীতের যোগের সঙ্গে ও নিকট অতীতের যোগ সূত্রেই ইতিহাস তৈরি হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি ইতিহাসের তথ্য ও সত্য মানুষের জীবনেরই সত্যের দিক। তবে ইতিহাসবিদদের ধারণা অতীতের ধারণা থেকে আধুনিককালে অনেকটাই আলাদা হয়ে পড়েছে। আধুনিককালে ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন ইতিহাসবেত্তারা।

আবার এই ইতিহাসকে নূতন করে পুনঃরূপ দানের পরিচয়ও কম নয়। ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বলতে বোঝায় ইতিহাসের কোনো বিষয় বা বস্তুর পুনঃরূপ দান বা পুনর্গঠন। অর্থাৎ যা ছিল তারই পুনর্নির্মাণ। এবার প্রশ্ন হ’ল এই পুনর্নির্মাণ কেমন হবে? ছবছ নকল হবে কি? উত্তরে বলা যায়, কোনো বস্তু, চিত্র, মূর্তি বা রূপের পুনর্নির্মাণ হলে এককথা আর কোনো অতীত যুগের বা ইতিহাসের অতীত উপাদান ও বিষয়ের পুনর্নির্মাণ হ’লে আর এক কথা। যদি বলি পূর্বোক্ত পুনর্গঠন বা পুনঃরূপ তাহলে ছবছ নকল করা হয়। অর্থাৎ যা ছিল তাই-ই থাকবে। আর যদি ইতিহাসের অতীত উপাদান ও বিষয়বস্তুর পুনর্নির্মাণ হয় তাহলে সেটা কীসের মাধ্যমে হবে সেটা দেখা দরকার। ধরাযাক, যদি সাহিত্যের রূপে ভাষার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয় তাহলে ছবছ বা অবিকল

হবে না। সাহিত্যের নিয়ম নীতি একটু আধটু আলাদা। সাহিত্য ইতিহাসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে না। অ্যারিস্টটলের মতও তাই—“Poetry... is a more philosophical and a higher thing than history; for poetry tends to express the universal, history the particular (ix).”<sup>৬</sup> ইতিহাসে ইতিহাসের সত্য ও তথ্য যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়। সেখানে যা ঘটেছে তারই বিবরণ দেওয়া হয়। যা ঘটতে পারে তার ধারণা ইতিহাসে নেই। কিন্তু সাহিত্যে যা ঘটতে পারে, যা সম্ভাব্য বা সম্ভাব্যতার সূত্রে নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার কথা বলে তাই-ই সাহিত্যের মূল শর্ত। অশীন দাশগুপ্ত মহাশয়ও তাঁর ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—“শুধু ইতিহাসের কল্পনা এবং সাহিত্যের কল্পনা এক জাতীয় নয়। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ঘটনার বাইরে থাকে। ঐতিহাসিক, দর্শক। সাহিত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য তুলে ধরে। সাহিত্যিক, স্রষ্টা।”<sup>৭</sup> সাহিত্যে লেখকের মনন সঞ্জাত কল্পনা থাকবে তবে সেই কল্পনা মুখ্য নয়; জীবন নির্ভর, জীবন মুখ্য। তাই সমগ্র মানুষের জীবন ও কর্মের কথা বলে সাহিত্য। সাহিত্যের মাধ্যমে একজন খাঁটি মানুষকে চেনা যায়। এককথায় দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে তার সন্ধান পাওয়া যায় সাহিত্যে। বিশেষ করে কথাসাহিত্য তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

পাশাপাশি সাহিত্য যখন ইতিহাসের পটভূমি, প্রেক্ষিত, বিষয় উপাদান চরিত্র নিয়ে রচিত হবে তখন সেই সাহিত্য ইতিহাস আশ্রয়ী বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হবে। তবে ইতিহাসের সত্য ও তথ্যকে বজায় রেখেও একজন দক্ষ সাহিত্যিক ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য রচনা করবেন। যেখানে অবিকল ইতিহাসের তথ্যের পরিবেশন দেখা যায় যা, ইতিহাস যেখানে নীরব থাকবে সেখান থেকেই সাহিত্যের শুরু হবে। কিম্বা ইতিহাসের অস্পষ্টতা নিয়েও একজন সাহিত্যিক বা স্রষ্টা ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। স্রষ্টার মূল লক্ষ্য হবে সত্যিকারের রস সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যাকে বলা হয় ‘ঐতিহাসিক রস’। এভাবেই ইতিহাসের অনুষ্ঙ্গ ব্যবহারের ফলে তৈরি হয় ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রভৃতি। আর ইতিহাসের তথ্য ও সত্যকে যখন নতুন রূপে নতুন ভাবে পুনঃরূপ দেওয়া হয় তখন সেটা হয় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ। বাংলা সাহিত্যে যার সূত্রপাত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে। বিশেষ করে রামরাম বসুর ‘রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসের মাধ্যমে ইতিহাসের অনুষ্ঙ্গ, চরিত্র ও উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যাকে বলা হয় ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। সেই লক্ষণ থেকে ছোটগল্পও বাদ পড়ে নি। এভাবেই ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের জন্ম হয়। বাংলা সাহিত্যে শশিচন্দ্র দত্তের পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ (১৮৫৭) যার দুটি পর্ব, যথা; ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ ও ‘সফল

স্বপ্নে’ ইতিহাসের উপাদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এরপরে সার্থকভাবে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণকুমারীদেবী, চণ্ডীচরণ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করলেও উল্লিখিত ঔপন্যাসিকগণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইতিহাসের অনুবঙ্গ, উপাদান, বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই ধারায় কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের জগৎ বাংলা সাহিত্যের জগতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের একজন জনপ্রিয় কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোল পত্রিকার সমকালীন হয়েও তিনি কখনো কল্লোলের লেখক ছিলেন না। প্রধানত বসুমতী, ভারতবর্ষ ও প্রবাসী পত্রিকাকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন। কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্যকে তিনি কখনোই মানতে পারেন নি। কল্লোলপত্নীরা যেভাবে বাস্তবতাকে গ্রহণ করে উপন্যাস ও গল্পে মানব জীবন সম্পর্কে লিখছিলেন সেই তীব্র রুঢ় বাস্তব জীবন সম্পর্কে চর্চা না করে তিনি এক রমণীয় সৌন্দর্যের জগৎ গড়েছিলেন। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে তিনি সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের পথ অনুসরণ না করে এক অভিনব সৌন্দর্য লোকের সন্ধান করেছেন। দারিদ্র্য বিলাস বা যৌনচেতনার উদগ্র প্রকাশ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। জগদীশ গুপ্তের ‘লঘুগুরু’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ কিংবা ‘প্রাগৈতিহাসিক’ ও ‘সরীসৃপ’-এর মতো আখ্যান রচনায় তিনি পক্ষপাতী নন। কল্লোলীয়ানদের কুটিল-জটিল মনস্তত্ত্বের বিপ্রতীপে থেকে তিনি সত্যিকারের রস সাহিত্য রচনা করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন—“রসসৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। যাঁহারা কেবল সত্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত তাঁহারা ঋষি হইতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক নহেন।”<sup>১১</sup> শিশু কিশোর কাহিনি সামাজিক কাহিনি, ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা, গোয়েন্দা কাহিনি, ঐতিহাসিক আখ্যান, অতীতাশ্রয়ী রোমান্টিক আখ্যান ও কৌতুক রসের রচনায় তিনি রোমান্স রসেরই অবতারণা করেছেন যার ব্যাপ্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত। সমকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেও একটি মন্তব্য থেকে তাঁর সাহিত্যিক মানসতার রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—“আমি সাহিত্যিক, কোনও ism-এর ধার ধারি না। Realism, Romanticism প্রভৃতি বাক্য আমার কাছে সমান নিরর্থক। আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রস সৃষ্টি করাই আমার

স্বধর্ম।”<sup>৮</sup> রোমান্স প্রিয়তা ও সাঙ্গীতিক ধর্ম উভয়ই তাঁর কবিত্বে মিশে রয়েছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের আত্মবঞ্চনা, নিষ্ঠুর স্বপ্নভঙ্গ, মূল্যবোধের নৈতিক অধঃপতন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। জীবনকে সুন্দর সহজ ও অনাবিল রূপেই দেখতে চেয়েছেন। তাঁর লেখায় নারী পুরুষের আকর্ষণের ছবি থাকলেও তা কখনোই উদগ্র কামনায় পর্যবসিত হয়নি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৯২৯ থেকে তাদের কালসীমার সূচনা। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ‘জাতিস্মর’ (১৯২৯), ‘বোমকেশের কাহিনী’ (১৯৩৪), ‘ডিটেকটিভ’ (১৯৩৭), ‘চুয়াচন্দন’ (১৯৪২), ‘কাঁচামিঠে’ (১৯৪২), ‘দস্তুরুচি’ (১৯৪৬), ‘পঞ্চভূত’ (১৯৪৬), ‘শাদাপৃথিবী’ (১৯৪৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরসগল্প (১৯৫২), ‘কালকূট’ (১৩৫১), ‘গোপন কথা’ (১৩৫২), ‘বুমেরাং’ (১৩৫৩), ‘ছায়াপথিক’ (১৩৫৬), ‘বিষকন্যা’ (৩য় - সংস্করণ, ১৩৫৯), ‘দুর্গরহস্য’ (১৩৫৯), ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ (১৩৬১), ‘কানু কহে রাই’ (১৩৬১) এবং গল্প সংগ্রহ ‘মায়াকুরঙ্গী’ (১৩৬৫)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — ‘কালের মন্দির’ (বাংলা ১৩৫৮, ইং. ১৯৫০), ‘গৌড়মল্লার’ (বাংলা ১৩৫৯, ইং. ১৯৫২), ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ (বাংলা ১৩৬৫, ইং. ১৯৫৮), ‘কুমার সম্ভবের কবি’ (বাংলা ১৩৭০, ইং. ১৯৬৩), ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৭২, ইং. ১৯৬৩-১৯৬৫), ‘ঝিন্দের বন্দী’ (প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৪৫, ইং. ১৯৩৮)। ‘বিষের ধোঁয়া’ (বাংলা ১৩৪০, ইং. ১৯৩৩), ‘ছায়াপথিক’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬, ইং. ১৯৪৯), ‘দাদার কীর্তি’ (বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, ইং. ১৯১৫ লেখা হয়), ‘মনচোরা’ (বাংলা প্রথম প্রকাশ ১৩৭০, ইং. ১৯৬৩) ইত্যাদি। এছাড়াও কাব্য, নাটক, চিত্রনাট্য, দিনলিপি, মনকণিকা, চিঠিপত্র, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

তিনি বিভিন্ন ধরার গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই রস সাধক শিল্পীর গল্প ও উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি :

- যেমন —
১. ইতিহাসাশ্রিত গল্প
  ২. ডিটেকটিভ গল্প
  ৩. অতিপ্রাকৃত গল্প
  ৪. সামাজিক-পারিবারিক
  ৫. হাসির গল্প
  ৬. অন্যান্য শ্রেণির গল্প (কিশোরদের গল্প ইত্যাদি)

উপন্যাসগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে ভাগ করে নিতে পারি —

## ১. ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস

## ২. পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস

তবে ইতিহাসাশ্রিত গল্প ও উপন্যাসগুলি নিয়েই সাহিত্যে তাঁর জনপ্রিয়তার সিংহাসন দখল। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’-এর উৎকর্ষতার গুণে ১৯৬৭ তিনি রাজ শিরোপা স্বরূপ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। শরদিন্দু এই জাতীয় ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য নিয়ে আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর ছয়-সাতের দশক পর্যন্ত এই উপন্যাস ও গল্পগুলির সময় সীমা। অতীতের মায়াময় ধূসর জগতকে তিনি কাছের দৃশ্যপটরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাসের সত্য ও তথ্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনার ফলে অতীত জীবন আমাদের কাছে রমণীয় হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ চিত্র এই জাতীয় লেখাগুলিতে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত। ইতিহাসের নীরবতাকে কাজে লাগিয়ে সত্যিকারের সাহিত্য সৃষ্টি করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। তাছাড়াও জাতিস্মর ধারার গল্পগুলিও আমাদের মন কাড়ে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলির প্রশংসা করে বলেছেন— “তুমি যখন সেই ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গল্প উপন্যাস লেখ, অতীতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি কর, সে কালের সন্ন্যাসী, সেনাপতি সামন্ত, সেই নাম ধাম, সেকালের উপযোগী কথোপকথন সে এক অভিনব কল্পলোক।”<sup>৯</sup> কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘অমিতাভ’ গল্পটি পড়ে মন্তব্য করেন— “তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে কেঁদেছি। এখনও কাঁদি। তোমার দিঙনাগের মত কেঁদে গেলে যেতে চাই পারি না।”<sup>১০</sup> আবার কবি ও সমালোচক মোহিতলাল লেখেন— “আপনার শক্তি ও সাধনা দুই-ই আছে তাহার প্রমাণ আপনার ওই গল্পগুলি।”<sup>১১</sup> ইতিহাসাশ্রিত রমণীয় সুখপাঠ্য উপন্যাস সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য— “তোমার লেখার একটা যাদু আছে, তুমি আনায়াসে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি কর যে পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও। তুঙ্গভদ্রার তীরে তোমার সে সুনাম রক্ষা করিয়াছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী - দুই-ই তোমার তুল্যমূল্য।...”<sup>১২</sup>

ভাষা ব্যবহারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, style তৈরির ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত, আখ্যান নির্মাণে প্রথাগত নিয়মের পরিপন্থী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মৌলিক চিন্তার অধিকারী। রাজশেখর বসুর মতো শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রয়ী বলুন বা অন্যান্য শ্রেণির গল্প উপন্যাসের কথা বলুন তাঁর প্লট বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণের কথা আমরাও অনুভব করি। বাস্তবিকই ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ জাতীয় গল্প কিংবা ‘তুমি সন্ন্যাসীর মেঘ’, ‘তুঙ্গ ভদ্রার তীরে’র মত উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান পাঠককে আদ্যন্ত

আকর্ষণ করে রাখে। তাই শরদিন্দুর সমকালের পাঠক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, ভারতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে আজকের দিনের পাঠক, সমালোচক, অধ্যাপক সকলই একবাক্যে তাঁর প্লটের দুর্নিবার আকর্ষণ শক্তির কথা বলেন। তাছাড়া তিনি নিজেই বলেছেন রস সৃষ্টিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহিত্যে সেই রসসৃষ্টির ব্যাপারটিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাসে থাকে সময়ের কালজ্ঞান কিন্তু সাহিত্যিককে কল্পনা শক্তির জোরে ইতিহাসের তথ্য ও সত্যকে সম্ভাব্যতার সূত্রে গ্রথিত করে রচনা করতে হয় রসসাহিত্য। নিছক ইতিহাসের ঘটনা বিবরণের পরিচয় দেন না। অতীত যুগের ঘটনা, সমাজ-পরিবেশ মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়কে বর্তমানের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেন। বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন পাঠক ও পাঠিকার। ইতিহাসের স্বল্পোজ্জ্বল উপাদানের ভিত্তিতেও একজন মহৎ সাহিত্যিক বড়মাপের ও উঁচুমানের সাহিত্যও সৃষ্টি করে থাকেন। যেমন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইতিহাস নামমাত্র, সাহিত্য পদবাচ্য রূপই একজন ঐতিহাসিক আখ্যান নির্মাতার একমাত্র ও আদিতম শর্ত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিন্তু তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে এই বিষয়টিরই ওপর অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রচিত অতীতশ্রয়ী কথাসাহিত্যে ইতিহাসের কথা-প্রসঙ্গ এনে তিনি একদিকে যেমন অতীত যুগচিত্রকে বাস্তবোচিত রূপ দান করেছেন তেমনি অন্যদিকে ইতিহাস ও সাহিত্যের ব্যবধান কমিয়েছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিষ্ট চিন্তে উপলব্ধি করেছেন উপন্যাসে অতীত যুগচিত্র ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র রাজরাজড়ার কথা, ইতিহাসের যুগবৈশিষ্ট্যের কথা, ধ্রুপদী যুগের ভাষা, উচ্চমার্গের কল্পনাশক্তির সহযোগে পরিবেশন করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন কৌশলের মধ্যে দিয়ে অতীত জীবনের প্রবেশ করার রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শরদিন্দু তাতে আর একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করলেন। জাতিস্মরণ-প্রকরণ কৌশলকে সযত্নে ব্যবহার করে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ধ্রুপদী যুগ ও জীবনকে গল্প উপন্যাসে স্থান দিলেন। পূর্বজন্মের কথা প্রসঙ্গ আখ্যান-বস্তুতে নিয়ে এসে সুকৌশলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে রসনিবিড় করে সাহিত্যে রসঘন করে তুললেন। ড. নিতাই বসু মন্তব্য করেছেন — “সর্বাধিক সফল শরদিন্দুর জাতিস্মরণ-ধারার গল্পগুলো। প্যাশন এখানে প্রেমের উপর স্পর্ধিত ভঙ্গিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তা নিছক যৌন-আবেগ নয়, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন নয়, বাসনায় বন্ধোমাঝে চিরবিচিত্র অতৃপ্ত মানব মনেরই চিরন্তন হাহাকার। জন্মান্তরের স্মৃতি, জাতিস্মরের কল্পনা যেন ফ্রেম, যার মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবি বসানো হয়েছে।”<sup>১০</sup> তিনি কখনো স্বপ্নে, কখনো বা বস্তু সাদৃশ্যে আবার কখনোবা গন্ধে, অবচেতনায় জাতিস্মরণতায় ডুব দিয়ে দক্ষ ডুবুরীর

মতো ধূসর মায়াময় কুণ্ডলায়িত অতীত জগতকে তুলে নিয়ে এসেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘সেতু’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘রুমাহরণ’, ‘বিষকন্যা’, ‘প্রত্নকেতকী’, ‘দেখা হবে’, ও ‘মায়া কুরঙ্গী’ প্রভৃতি গল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির অধ্যায় বিভাজন নিম্নরূপ—

মুখবন্ধ	:	
প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ধারা
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের ভূমিকা
তৃতীয় অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ
চতুর্থ অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ
পঞ্চম অধ্যায়	:	শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিচার
উপসংহার	:	
গ্রন্থপঞ্জি	:	
পরিশিষ্ট বা সংযোজিকা	:	
নির্ঘণ্ট (ইনডেক্স)	:	

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির উল্লিখিত অধ্যায়গুলিতে ‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাস’ বিষয়টি যথাসাধ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মানসতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তির স্বরূপটিও উল্লিখিত বিষয়টিকে অবলম্বন করে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। সাহিত্যের বিন্যাসে শাখায় অন্যান্য প্রকরণ তাঁর সফলতার দিকটি ধরা পড়লেও বলা যায় যে, তিনি কথাকার হিশেবে সফল হয়েছেন মূলত ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য রচনায়।

নির্দেশিকা :

১. ইতিহাস লেখকের কাজ, মার্ক ব্লক, ভাষান্তর—আশিস কুমার দাস, সম্পাদনা—প্রভাত দাশগুপ্ত, পৃ. ১৫
২. প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, সম্পাদনা—ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার, পৃ. ২৩২
৩. তদেব,
৪. ইতিহাস ও সাহিত্য, অশীন দাশগুপ্ত
৫. অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৩
৬. ইতিহাস ও সাহিত্য, অশীন দাশগুপ্ত, পৃ. ২৮
৭. শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮
৮. শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৪৭৪
৯. শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, চিঠিপত্র, পৃ. ৪৩৭
১০. তদেব, পৃ. ৪৪৯
১১. তদেব, পৃ. ৪৩২
১২. শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৬১৬
১৩. সত্যশ্লেষী শরদিন্দু, ড. নিতাই বসু, পৃ. ৪৯

## প্রথম অধ্যায়

### বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ধারা

বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। যদিও এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধরা যাক, “সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস।”<sup>১</sup> আবার ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শন কথা দু’টিকেও কেউ কেউ<sup>২</sup> মেলাতে চেয়েছেন। অ্যারিস্টটল কিন্তু আলাদা কথা বলেছেন। তিনি সাহিত্যিকে অত্যন্ত দার্শনিকতাপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনকে অত্যন্ত দার্শনিকতাপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করবার পক্ষপাতী তিনি নন। বলা যায়, ইতিহাসবিদ একজন সাংবাদিক কিংবা দর্শক মাত্র। বিজ্ঞানী একজন যুক্তিবাদী একলা মানুষ। অপরাপর পক্ষে দার্শনিক মানুষটিও যুক্তি বুদ্ধি চিন্তাশীল মনের অধিকারী। উপরোক্ত তিনজন মানুষেরই কাছে হৃদয়-আবেদনের জায়গা নেই, একমাত্র রয়েছে একজন সাহিত্যিকের। তাই তো আখ্যানের বাইরে অবস্থান করে ইতিহাসবিদ; ভেতরে প্রবেশে তাঁর ছাড়পত্র নেই। কেননা, যাঁরা তথ্যনিষ্ঠ, প্রমাণিত সত্যকেই একমাত্র প্রমাণ বলে জানে তাঁদের কাছে কল্পনা নির্ভর সত্য কিংবা কবির সত্য একেবারে অগণ্য; ভিত্তিহীন। আর একেলা ব্যক্তি মানুষের মনের কথা ইতিহাস পান্ডা দেয় না। একলা মানুষ হোক আর সমষ্টিগত হোক ইতিহাস লক্ষণাক্রান্ত মানুষের জীবন-ব্যাখ্যাই তো ইতিহাস-সম্মত। অন্যদিকে সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের মনের গভীরে ডুব দিয়ে তার আঁতের কথা তুলে আনে। ঔরঞ্জিব একজন সম্রাট যখন তিনি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কিংবা সামাজিক রাজনৈতিক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হবেন তখন তিনি ইতিহাসের সম্পদ আর যখন তিনি সাহিত্যে স্থান পাবেন তখন কিন্তু তিনি সাহিত্যের সম্পদ। ইতিহাসের ব্যক্তির মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু সাহিত্যে তা অকল্পনীয় নয়। তাইতো ইতিহাসে নিষ্ঠুর প্রেমহীন ঔরঞ্জিব সাহিত্যে প্রেমিক ও অশ্রুসজল। এদিক থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি সেই বৈশিষ্ট্যই চিহ্নিত। তবে ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পের সংখ্যা উপন্যাসের তুলনায় ন্যূন। সর্বোপরি একজন ঐতিহাসিকের কাজ হ’ল—

“তিনি যখন কাজ করতে থাকেন তখন, বাছাই ও বিন্যাস—দু-এরই সূক্ষ্ম ও বোধহয় আংশিকভাবে অচেতন পরিবর্তন ঘটে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের মধ্যকার পরস্পর সম্বন্ধও জড়িয়ে থাকে, কারণ ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ

আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য—দু-এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অমূল ও ব্যর্থ; ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যের মৃত ও অর্থহীন। অতএব, ‘কাকে বলে ইতিহাস?’—এই প্রশ্নে আমার প্রথম উত্তর ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তর্হীন সংলাপ।”<sup>৩</sup>

পঞ্চাশতের সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশেষ মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে—

“ইতিহাসের সংক্ষেপে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি উপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনের স্বাদ দিতে পারেন, তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।”<sup>৪</sup>

সুতরাং বলা যায়, একজন সাহিত্যিক কিংবা কথাকার অতীতাশ্রয়ী উপাদানগুলিকে নিজের মনের শিল্প সুসমা ও কবিকল্পনা মিলিয়ে অতীতের, দূর অতীতের কিংবা নিকট অতীতকে পুনর্নির্মাণ করেন। দূরের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চালচিত্রকে নিমেষেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দূরের সঙ্গে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সম্পর্কও তৈরি করেন। দূর যেমন ভবিষ্যৎকে জন্ম দেয় তেমনি বর্তমান জন্ম দেয় ভবিষ্যৎকে। এভাবেই দূরকালের উপাদান বর্তমান কালের প্রেমে বন্দী হয়ে নূতন রূপ পায়। তৈরি হয় এক নূতন সাহিত্য প্রকরণের— ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য। নিম্নে সময়ের নিরিখে ক্রমানুসারে বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্ণয়।

বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের পরিচয় এই অধ্যায়ে অত্যন্ত জরুরি। তবে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যালোচনার পূর্বে বঙ্গে ইতিহাস চর্চার বিষয়টি একনজরে দেখে নেওয়া যাক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে মূলত বাংলায় ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। বিদেশীদের দ্বারা এই মহাবিদ্যালয়ে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাসচর্চাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারই ফলস্বরূপ এই কলেজের অধ্যাপক রামরাম বসু ‘রাজাপ্রতাপাদিত্যচরিত্র’ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। সকল যুক্তিতর্ক ও মতামত নির্বিশেষে এই গ্রন্থখানিই বাংলায় ইতিহাস চর্চার প্রথম স্মারক।

ইতিহাসকার ও ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির উল্লেখ বাংলায় ইতিহাস চর্চার ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্’, (১৮০৫)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—‘রাজাবলি’ (১৮০৮)

মার্শ-ম্যানের—‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ (১৮৩১)

রামগতি ন্যায়রত্ন—‘বাংলার ইতিহাস’ (১৮৫৯)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—‘বাংলার ইতিহাস’ (১৮৭৫)

রজনীকান্ত গুপ্ত—‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’ (১ম ভাগ ১৮৭৯, ২য় ভাগ ১৮৮৬, ৩য় ভাগ ১৮৯২, ৪র্থ ভাগ ১৮৯৭, ৫ম ভাগ ১৯০০)<sup>৫</sup>

শ্যামধন মুখোপাধ্যায়—‘মুরশিদাবাদের ইতিহাস’ (১৮৬৪)

উমেশচন্দ্র রায়—‘সিকিমের ইতিহাস’ (১৮৭৫)

হরিমোহন সান্যাল—‘দার্জিলিংয়ের ইতিহাস’ (১৮৮০)

এছাড়াও বিদেশী পণ্ডিত উইলিয়াম কেরির ছেলে ফেলিক্স কেরি ‘ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়’ (১৮২০), গোল্ড স্মিথ রচিত ‘An Abridgment of the History of England’<sup>৬</sup> নামক পুস্তকটির অনূদিত গ্রন্থ। পুস্তকটি বাংলা ভাষায় তিনি অনুবাদ করেন। এই সময়ে আরও অনেক ইতিহাস লেখকের নাম পাওয়া যায়। যেমন—গোবিন্দচন্দ্র সেন ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪০), রাজনারায়ণ বসু—‘আত্মীয় সভার সভাদিগের বৃত্তান্ত’ (১৮৬৭) প্রমুখ তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪৮) মার্শম্যানের ‘History of Bengal’-এর অনুবাদ (প্রথম খণ্ড ১৮৪৮, ২য় খণ্ড ১৮৪৯) এছাড়াও তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকার হিসেবে প্রথম বাঙালি লেখক।

পরবর্তীকালে বিশ শতকের ইতিহাসকারগণ বাংলার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মন দিলেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ আদর্শের ওপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক রচনাই এঁদের হাতে লেখা হয়েছে। ইতিহাসের টেক্সট বই মূলত এরা লিখেছেন। উল্লেখ্য, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ঘব নগেন্দ্রনাথ বসুর ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ (রাজন্য কাণ্ড, ১৩২১), রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের—‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ (১ম খণ্ড, ১৯১৫, ২য় খণ্ড, ১৯১৭), রমেশচন্দ্র মজুমদারের—‘বাংলাদেশের ইতিহাস’, J. N. Sarkar, 'History of Bengal', শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের—‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ (আদির্পব, ১৩৫৯), শ্রীসুকুমার সেনের—বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড), সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে বাংলার সীমার বাইরে থেকেও

করদ মিত্র রাজ্য হিসেবে ‘কোচবিহার’ রাজ্যেও ইতিহাস চর্চার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার দিক থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় হোক বা জাতীয় স্তরের হোক সেটা গবেষণার দাবি রাখে। উল্লেখ্যণীয়, মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের (১৭৮৩-১৮৩৯) রাজত্বকালে ‘গোসানীমঙ্গল’ ও মুন্সী জয়নাথ ঘোষের ‘রাজোপাখ্যান’ (১৮৪৫), আনন্দচন্দ্র ঘোষের ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ (১৮৬৫), রিপুঞ্জয় দাসের ‘মহারাজ বংশাবলী’ (১৮৪৭), মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীর ‘বেহারোদন্ত’ (১৮৫৯), ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ (১৮৮২) ও যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ (১৮৮৩) প্রভৃতি।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থগুলির উল্লেখের অন্যতম কারণ হ’ল—  
১. ইতিহাস চর্চার ধারা, ২. ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য ব্যবহার করে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের সৃষ্টি।

উল্লেখ্য কোচবিহারের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করে শঙ্করদেবের ‘রামবিজয়’ নাটক ‘রাজভটিমায়’<sup>৭</sup> যথাক্রমে শুল্কধ্বজ ও নরনারায়ণের প্রশস্তি করেছেন, এছাড়াও কুচবিহার দেশীয় রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্য (১৮২৩ বা ১৮২৪)<sup>৮</sup> ‘বেহারোদন্ত’<sup>৯</sup> (১৮৫৯) ইত্যাদি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচিত হয়েছে।

যাইহোক, বাংলা ভাষায় ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংখ্যা কম নয়। তবে ছোটগল্পের সংখ্যাটা কিছুটা কম। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনাগুলি অমূল্য সম্পদ। বহুকাল থেকেই এই প্রবণতা কবি, ঔপন্যাসিকদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। সামাজিক উপন্যাস দিয়ে বাংলা উপন্যাসের সার্থক পর্বের সূচনা হলেও কিন্তু সে সময় ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কম ছিল না। বরং সামাজিক উপন্যাসের তুলনায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকেই সেসময় ঝাঁক বেশি ছিল ঔপন্যাসিকদের। স্বাভাবিকভাবে উপরোক্ত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে বহু ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছেন। আজও কেউ কেউ ইতিহাসের উপাদান বা তথ্য ব্যবহার করে উপন্যাস রচনা করে চলেছেন। শ্রীপারাবত বা প্রবীরকুমার গোস্বামী ও অমর মিত্ররা উজ্জ্বল উদাহরণ। ইতিহাসের ক্রমপঞ্জি অনুসারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক রামরাম বসুর ‘রাজাপ্রতাপাদিত্যচরিত্র’ (১৮০১) গ্রন্থটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ।<sup>১০</sup> অন্যদিকে ড. সুকুমার সেন মনে করেন—

“উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ পাদরী উইলিয়াম কেরির পণ্ডিত সেক্রেটারি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইঁহার সঙ্কলিত ‘রাজাবলি’ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে।”<sup>১১</sup>

যথার্থ উপন্যাস রচনার সময় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতেই প্রথম যথার্থ বাংলা উপন্যাস আমরা পাই। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) তাঁর ইতিহাসাশ্রিত রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে প্রায় বাংলা উপন্যাসের কোনো কপি আমাদের হাতে পড়েনি। শুধুমাত্র, ‘বাবুর উপাখ্যান’ (১৮২১), ‘নববাবু বিলাস’ (১৮২৫), কিছু কিছু লোকরঞ্জক প্রিয় অদ্ভুদ রসমূলক সামাজিক নকশাধর্মী লেখা পাওয়া যায়। যেমন—প্যারীচাঁদ মিশ্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন হিংমের ‘ছতোম পাঁচার নকশা’ (১৮৬২), হ্যালা ক্যাথারিস মুলেসের ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ (১৮৫২) এবং রেভারেণ্ড লালবিহারী দে চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (১৮৫৯) ইত্যাদি। তারপর ইতিহাসকে নিয়ে লেখকগণ উপন্যাস রচনায় হাত পাকালেন। পাশাপাশি সামাজিক উপন্যাসের ধারাও চলেছিল সমানতালে। ঐতিহাসিক উপাদান সমন্বয়ে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার পূর্বে কেউ কেউ বাংলা ও ইংরেজিতে ইতিহাসের অনুষ্ণ নিয়ে কবিতা ও গল্প লিখেছেন। হরচন্দ্র দত্তের পাওয়া যায়— ‘The Flight of Humayun’, শশিচন্দ্র দত্ত কৃত লেখাগুলি হ’ল— ‘Jelaludeen Khilji’, ‘Sivaji’ ইত্যাদি, মধুসূদন দত্তের ‘The captive lady’ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ‘Asoka's Lessage to his people’<sup>১১</sup> এছাড়াও দু’টি ইংরেজি বইয়ের নাম এক্ষেত্রে বলা প্রাসঙ্গিক। যেমন টডের ‘Annals of Rajasthan’ কন্টারের ‘Romance of History - India, Vol. I & II’।<sup>১২</sup> অর্থাৎ বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত উপাদানগুলি বাংলা ঐতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। পাশাপাশি সেদিনের মানুষের জাতীয়তাবাদ, নবজাগরণ, দেশপ্ৰীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রেরণার কথা জানা যায় যা বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ দেয়।

এরপর এল ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের যুগ। বিশেষ করে উপন্যাসের যুগ। ১৮৫৭ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে এল ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’। দু’টি কাহিনি নিয়ে লেখা এই উপন্যাস ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’। কাহিনি দুটি কন্টারের ‘Romance of History - India’ থেকে নেওয়া ‘The Traveller's Dream’ ও ‘The Maharatta Chief’-এর অনুসরণে লেখা। শাজাহান, শিবাজী, আওরঙ্গজেব, রোশিনারা প্রত্যেকেই ইতিহাসের চরিত্র। ‘সফল স্বপ্নে’ আবেগের আতিশয্য, রচনাগত দুর্বলতা থাকলেও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়ে’ উপন্যাসের যথার্থ লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম যুগের পটভূমিকায় সমন্বয়ের কথা প্রসঙ্গ বইটিকে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। শিবাজী ও রোশিনারার প্রেম তার প্রমাণ। হিন্দু পুনরুত্থান, ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব-ভাবনায় গঠন-চিন্তা, হিন্দু সম্রাটদের বীরত্ব বটে ইত্যাদির পরিচয়ও পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। এই হ’ল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। এই প্রবণতায় যিনি যথার্থ প্রাণমন

ঢেলে কাজ করেছেন তিনি হ'লেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চোদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে যদিও তিনি 'রাজসিংহ'কেই (১২৮৮, পুনঃপ্রণীত ১৮৯৩) যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। বাকী উপন্যাসগুলি ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চ ও সামাজিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। ইতিহাস মূলক উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ের হিন্দুদের বাহুবল, হিন্দু মহারাজাদের বীর প্রতাপাষিত মহিমা, শৌর্যবীর্যের কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি হিন্দু জাতীয়তাবাদ, নবজাগরণ, দেশ প্রেম, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, বন্দেমাতরম রব ইত্যাদি বিষয় জায়গা পেয়েছে। উপন্যাস শিল্পের দিক থেকে হোক আর বিষয়-আশয়ের দিক থেকেই হোক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের দিক থেকে প্রথম সার্থক শিল্পীতরুপ লাভ করে। সামাজিক উপন্যাসগুলিতে জমিদার ও সামন্ত শ্রেণির মানসিকতার রূপ পেলেও একটা নিয়ম-নীতি বঙ্কিমকে প্রেরণা যুগিয়েছিল যা অনেকক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষণশীল ও নীতিবাদী হতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস ও রোমাঞ্চমূলক উপন্যাসগুলি হ'ল— 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃগালিনী' (১৮৬৯), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও যুগ মানসিকতার পরিচয় সম্পর্কে আমরা নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করতে পারি—

“বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলমান আমলের আসানের যুগ, এক বিরাট শূন্যতা ও অরাজকতার যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এই যুগের কথা ও কাহিনী লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক জ্ঞান যেখানে অসম্পূর্ণ, খণ্ডায়িত, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ স্তরের ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করিয়া লইয়াছেন;”<sup>১৪</sup>

স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বঙ্কিমী ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রথম ধারার উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। রোমাঞ্চরস ও ইতিহাসের তথ্য ও সত্য সেগুলি তৈরি। তবে কখনো কখনো ইতিহাস সাহিত্যের গভীর বাইরে গিয়ে প্রকাশিত হয়েছে কখনোবা ইতিহাস নীরব অস্পষ্ট। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চমূলক উপন্যাসের কিছুটা তফাৎ তৈরি করেছেন। এক. খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং দুই. ইতিহাসাশ্রিত ও রোমাঞ্চমূলক।

তবে দু'টি পর্যায়েই রোমাঞ্চরস মিশ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'কেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'তে গেলে তিনি বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। আজ রোমাঞ্চ কিংবা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় কিছুটা পৃথক বৈশিষ্ট্যের কথা

ভেবেছেন। তাই তিনি স্পষ্টভাবে ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। আমরা এই দুই প্রকরণের পার্থক্যের কথা নিচে তুলে ধরছি—

১. খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হ’ল :

ক. ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের যথাযথ ব্যবহার।

খ. ইতিহাসের অস্পষ্টতা কাঙ্ক্ষিত নয়।

গ. কল্পনার আড়ম্বর হীনতা, জীবনটাই মুখ্য।

ঘ. ইতিহাসের অতীতকে বাস্তবের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা।

ঙ. অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা।

চ. ঐতিহাসিক রস তৈরি করা।

ছ. এক্ষেত্রে আগে উপন্যাস ও পরে ইতিহাস হতে হয়। অর্থাৎ রসসাহিত্য সৃষ্টিই কাম্য।

২. ইতিহাসাশ্রিত ও রোমান্স আশ্রিত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

ক. ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের যথাযথা ব্যবহার অত্যাবশ্যিক নয়।

খ. ইতিহাসের অস্পষ্টতার সুযোগ ব্যবহার করে একজন ঔপন্যাসিক এধরণের আখ্যান-কথন তৈরি করেন।

গ. কল্পনা নির্ভর অথচ জীবনমুখ্য।

ঘ. দূরের বা নিকটের দৃশ্যপটকে কাছের দেখান।

ঙ. অতিপ্রাকৃত ঘটনা ব্যবহার করে ইতিহাসের অস্পষ্ট অতীতকে লেখক ঢাকবার করবার চেষ্টা করেন।

চ. ঐতিহাসিক রস ও রোমান্সরস তৈরি করা।

ছ. রসবর্জিত সত্য নয়, রস সাহিত্য সৃষ্টিই লক্ষ্য এক্ষেত্রে। এতে ইতিহাসের আড়ম্বর নেই অর্থাৎ আগে উপন্যাস ও পরে ইতিহাস।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ তাঁর সমকালীন, পূর্বকালীন, উত্তরকালীন প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা এই তত্ত্বেই বিশ্বাস করতেন। এই তত্ত্বেই নির্মিত তাঁদের ইতিহাস আশ্রয়ী কথাসাহিত্য বিশ্ব।

উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে যাঁরা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের রচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। যেমন—

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুসারী লেখক হয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ছাপ রেখেছেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি হ’ল—

‘বঙ্গবিজেতা’ (১৮৭৪), ‘মাধবী কঙ্কণ’ (১৮৭৭), ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ (১৮৭৮),

‘রাজপুত জীবন সন্ধ্যা’ (১৮৮৯) ইত্যাদি। উল্লিখিত রচনাগুলিতে প্রধানত। ইতিহাসের পটভূমিকায় ইত্যাদি প্রেম-প্রণয়, গার্হস্থ্য জীবন ভাবনা, নিষ্ঠুরতা, ত্রুরতা, আত্মত্যাগ মানুষের দিকগুলি প্রস্ফুটিত। বলা যায়, আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পটভূমি। যেমন—‘বঙ্গ বিজেতা’র সময় ১৫৮০ খৃঃ। অন্যদিকে শিবাজীর নেতৃত্বে ও কৌশলে মারাঠাদের জাগরণ ও বিকাশ উত্থানের কাহিনি বর্ণিত। পাশাপাশি রাজপুত জাতির পতনের দিকটিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শেষোক্ত দু’টি উপন্যাসে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কুটিলতা, শৌর্য বীর্য, প্রেম-প্রণয়, আত্মত্যাগ ইত্যাদি বিষয় রূপ পেয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) এই জাতীয় উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখায় যথেষ্ট পারহম। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি হ’ল— ‘দীপ নির্বাণ’ (১৮৭৬), ‘মিবাররাজ’ (১৮৮৭), ‘ছগলীর ইমামবাড়ি’ (১৮৮৮), ‘বিদ্রোহ’ (১৮৯০), ‘ফুলের মালা’ (১৮৯৫)।

ছোটগল্প লেখাতেও তাঁর পরিণত ভাব-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—‘কুমার ভীম সিংহ’, ‘ক্ষত্রিয় রমণী’, ‘ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী ইত্যাদি নবকাহিনী’ (১৮৯২) গল্প সংকলনে সংকলিত গল্প। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির বিষয়-আশয়ের ছবিটি স্পষ্টত ইতিহাস-সম্মত। ইতিহাসকে ছাপিয়ে গেছে কখনো কখনো। বলা যায় তাঁর স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলিতে মূলত রাজস্থান ও বাংলার ইতিহাস বর্ণিত। প্রধানত দু’টি বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছেন। যথা; দেশ প্রেম, দেশভক্তি ও দেশ মাতৃকার চরণে সেবা ও আত্মত্যাগ। দুই. রাজ-মহারাজার জীবন প্রণালী ও কর্মসাধনা, দেশপ্রীতি ও দেশ গঠন। ঐতিহাসিক না হলেও তিনি ইতিহাসের অনুষ্ঙ্গ-উপাদান পুরোপুরি আত্মস্থ করে কল্পনার রঙে উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। গল্পগুলিতেই সেই হিন্দুত্বের ছাপ ও হিন্দু মেলার আদর্শের আঁচ বর্তমান। জাতীয়তাবাদ ও আর্য়দের কাহিনি তাঁর লক্ষ্য, সেই সঙ্গে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করা।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বদেশী যুগের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) রচিত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি হ’ল—‘মহারাজ নন্দকুমার’ (১৮৮৫) অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা, অনেকের মতে প্রকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, (বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৭২), ‘দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ’ (১৮৮৬), ‘অযোধ্যার বেগম’ (১৮৮৬), ‘বান্সীর রাণী’ (১৮৮৮), ‘এই কি রামের অযোধ্যা সিংহ’ (১৮৯৫)।

চণ্ডীচরণ সেন নিজেই দাবি করেছেন যে, তিনি ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, উপন্যাস রচনা করেন নি। কাজেই তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্যাবলী পাওয়া যায়; উপন্যাস শিল্পের শিল্পীত

রূপ পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ তাকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে তা স্বদেশ প্রেরণা। রচনাগুলির উৎসও তাই। ইতিহাসের দায়ের প্রতি তাঁর ঝাঁক লক্ষণীয়; উপন্যাস সৃষ্টির দিকে নয়। বলা যায় তাঁর লেখাগুলি উপন্যাসের ঢং-এ ইতিহাস। সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বদেশানুরাগ, বাঙালির আলস্য, বাণিজ্যে উৎসাহহীনতা, চাকুরীতে অংশগ্রহণ, ইংরেজ বিদ্রোহ, জাতীয় ভাব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুশাসন রংপুরের বিদ্রোহ, সিরাজ হেস্টিং কাহিনি বিষয় সিরাজের রাজ্য বিষয় উপন্যাসগুলিতে লোভ বর্ণিত হয়েছে। ঝাঁসীর প্রতি কৌতুহলোদ্দীপক মন্তব্য, ইতিহাসের তথ্য ও সত্য।

চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসগুলি মূলত সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রচিত। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসন, কোম্পানী শাসনের তীব্র প্রতিবাদ প্রতিরোধ স্বরূপ মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, অযোধ্যার বেগম ও ঝাঁসীর রাণী উপন্যাসের আখ্যান নির্মিত। বাংলা বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবাদ ও সনাতন হিন্দুত্ববাদের মত দিকগুলি সেদিনের প্রেক্ষিতে পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষকে প্রেরণা ও উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। কারণ তাঁর ধারণা ছিল হিন্দু ধর্মের দেশাচার হিন্দু জাতির অধঃপতনের জন্য দায়ী। বাল্য বিবাহের মতো প্রচলিত দেশাচার তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। চণ্ডীচরণ সেনের লেখাগুলি সেদিনের প্রেক্ষিতে মূল্যবান। বলার কারণ, ইতিহাসের উপাদান, তথ্য ও সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যিক মূল্য উঁচু মানের না হলেও ইতিহাস চর্চার দিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি উঁচু পর্যায়ের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ইতিহাসকে অবলম্বন করে খুব বেশী উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখেননি। তবে ইতিহাসকে সাহিত্যের আধারে তিনি যথায় ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে জানিয়েছেন সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক রস কীভাবে তৈরি করতে হয়। তাঁর রচিত এই জাতীয় উপন্যাস হল—‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ (১৮৮৩), ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯৬১), ‘গোরা’ (১৯১০), ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তিনি ইতিহাস ও রাজনীতিকে পটভূমি হিসেবে স্থান দিয়েছেন। যেমন—‘দালিয়া’ (ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ), ‘মেঘ ও রৌদ্র’ (ইংরেজদের হাতে দেশীয় মেয়েদের দুর্দশা, লাঞ্ছনা ও অপমান প্রসঙ্গ), ‘মুসলমানীর গল্প’। যদিও (ঘরে বাইরে, গোরা, চার অধ্যায়) এই তিনটি উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাতে বিদেশী জিনিস বর্জন, স্বদেশীয়ানা, রাজনীতি, সামাজিক সংকট, পরাধীনতা,

সম্ভ্রাসবাদী কার্য-কলাপ, উগ্র হিন্দুত্বাদ, ব্রাহ্ম আন্দোলন, প্রগতিশীল মন মানসিকতার ছাপ সর্বোপরি মানবতাবাদে দীক্ষিত হওয়া ইত্যাদি ঘটনার ছাপ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে অর্থে বউ ঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষি ইতিহাসাশ্রিত রচনা ঠিক সেই অর্থে ঘরে বাইরে, গোরা ও চার অধ্যায় ইতিহাস মূলক রচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসবিদ নন। তিনি কথাসাহিত্যিক। তাঁর বড় পরিচয় তিনি বিশ্বকবি। নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, নাট্যাভিনেতা, প্রাবন্ধিক প্রভৃতি। তবুও ইতিহাস পাঠ ও ইতিহাসের তথ্য ও সত্য তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস কিংবা আন্তর্জাতিক ইতিহাস তিনি পড়েননি এটা বলা বড় ভুল হবে। কেননা একাধিকবার তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা লিখি করেছেন। স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। বাঙালির আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন। বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি নিয়ে বারংবার ভেবেছেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের পরম বাসনা ছিল যে, পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণ সাধনা, পক্ষান্তরে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা। মানবতাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা বারে বারে তাঁর লেখাগুলির আধেয় হয়ে উঠেছে। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে উঠলেন—‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ অর্থাৎ বিশ্বের আত্মীয় বা আত্মজন।

প্রসঙ্গত তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান অনুযায় ও বিষয়-আশয় কোথাও স্পষ্ট আবার কোথাও অস্পষ্টভাবে পরিবেশিত হলেও মানবতার আদর্শ বিদ্বিত হয়নি।

‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে বাংলা এবং ত্রিপুরার ইতিহাস প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথমটিতে রাজা প্রতাপাদিত্যের কথা ও দ্বিতীয়টিতে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দ মাণিক্যের বিষয়টি বর্ণিত। দু’টি গ্রন্থই ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত। ইতিহাসের তথ্যের ও সত্যের পরিবেশনের দিক থেকে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটি উৎকৃষ্ট। তবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসেবে ততটা সমালোচকদের চোখে প্রসংশা পায়নি। এই রকমভাবে ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসটি ইতিহাসের ছোঁয়ায় পরিবেশিত। ইতিহাস এখানে প্রকট নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তা চেতনার ছাপ এতে রয়েছে। বিশেষ করে রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোর বয়সে রাজাপ্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যে-যে গ্রন্থগুলি পড়েছেন তার থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে নূতন ভাবে ভাবিত হয়ে রাজা প্রতাপাদিত্যকে নূতনরূপে আঁকলেন। অনেকে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে গৌরব করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা করেননি বরং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতাপাদিত্যের অগৌরবের কাহিনি শোনালেন যা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে প্রসংশা লাভ করেছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিংবা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো তিনি ইতিহাসাশ্রয়ী রচনায় মনোযোগী হতে পারলেন না। ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে জানালেন আসলে প্রকৃত ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস কি ধরনের হওয়া উচিত। ইতিহাস ও উপন্যাসের পার্থক্যও বোঝালেন। ইতিহাস ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্য ও সত্য পরিবেশন করে আর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ঐতিহাসিক কল্পনার আশ্রয়ে ‘ঐতিহাসিকরস’ পরিবেশনের মাধ্যমে নির্মিত হয়। নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর ‘রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকায়’ লিখেছেন—“প্রাচীন সামন্ত-সমাজের ছায়াময়ী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিদায় লইল।”<sup>১৬</sup> অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিম যুগের রোমাঞ্চ প্রবণতায় ঝুঁকে এ ধরনের উপন্যাস লিখেছেন। তিনি বুঝেছেন ইতিহাস যেখানে অপূর্ণ, খণ্ডিত, অস্পষ্ট ও ছায়াময় ঠিক সেখান থেকেই এ ধরনের উপন্যাসগুলির যাত্রা শুরু। কিন্তু যুগের প্রবণতায় বঙ্কিমের মতো তাঁকেও এই প্রবণতায় দাঁড়ি টানতে হ’ল। পাশাপাশি ‘ঘরে বাইরে’, ‘গোরা’ ও ‘চার অধ্যায়’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে স্বদেশী ভাবনা, স্বদেশী আন্দোলন, গৌড়ীয় হিন্দুধর্মের রক্ষণাশীল প্রচলিত দেশাচার, ব্রাহ্মধর্মের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা, মানবতাবোধের আদর্শবাদের প্রকাশ, গোরার মধ্যে বিশ্বাত্মবোধের চেতনা ইত্যাদি নিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে ‘দালিয়া’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘একরাত্রি’, ‘দুরাশা’, ‘স্ত্রীরপত্র’, ‘শেষকথা’, ‘নামঞ্জুর’, ‘ধ্বংস’, ‘বদনাম’ প্রভৃতি গল্পে রাজনীতি, সামাজিক সংস্কার হিন্দু ও মুসলমানদের প্রচলিত প্রথা, সাম্প্রদায়িক চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমন্বয়ের চিত্র বর্ণিত। বিশেষ করে ইংরেজের অপশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার, শোষণ, নিষ্ঠুর অকারণ নির্যাতন, অত্যাচার, দুর্বলের ওপর আঘাত রূপায়িত। এগুলির বিষয়-আশয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অনুষ্ঙ্গ নির্মিত। তবে ‘দালিয়া’ নামক গল্পটিতে ইতিহাস ও রোমাঞ্চরসের মিশ্রণে তৈরি। সাজাহানের পুত্র সুজা ঔরঙ্গ জেবের সঙ্গে পরাজিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আরাকানের হিন্দু রাজার ঘরে। পরবর্তীকালে মেয়েদের জন্য সুজার সঙ্গে আরাকান রাজের দ্বন্দ্ব সুজা পরাজিত ঘটে ও তার মৃত্যুবরণ করে। পরে সেই কন্যারা পিতৃ হত্যার প্রতিশোধে উদ্দীপ্ত না হয়ে হৃদয় ধর্মের কাছে সুজার কন্যা প্রেমের বাঁধনে আরাকান রাজকুমার দালিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়। মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় অঙ্কিত তথা ইতিহাস কল্পনায় নির্মিত এই গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য গল্পরস তৈরি করা ও মানববন্ধনের বা হৃদয়ধর্মের মানুষকে মানবিক হিশেবে আঁকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছের মানুষ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন ও বালক পত্র-পত্রিকায় ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হ’ল— ‘শক্তিকানন’ (১৮৮৭), ‘ফুলজানি’ (১৮৯৪), ‘বিশ্বনাথ’ (১৮৮৬), ‘রাইবনীদুর্গ’ (১৩১৩-

১৩১৪), নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে বের হয়।

মূলত সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাসগুলি রচিত। পল্লী বাংলার প্রতি অনুরাগের কারণে তাঁর উপন্যাসের আখ্যান পল্লীশ্রীর ছবি অধিক প্রকটিত। বলা যায় পল্লীশ্রীর প্রতি তাঁর ছিল প্রীতিপূর্ণ পক্ষপাতিত্ব। বাংলা ও বাঙালির জীবনের ছবি অঙ্কনেও তাঁর প্রেরণার কথা জানা যায়। শাক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের দ্বন্দ্বও ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসগুলিতে। আসলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও উপন্যাসিকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথা জানা যায়। প্রসঙ্গত ‘শক্তিকানন’, ‘রাইবনীদুর্গ’ তার উদাহরণ। এছাড়াও তাঁর বৈষ্ণব প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগে লেখা ‘বৈষ্ণব চয়নিকা’ গ্রন্থটিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের দস্যুপ্রীতির প্রভাবের কথাও জানা যায় তাঁর ‘বিশ্বনাথ’ নামক উপন্যাসটিতে। বিশেষ করে ‘Robinhood’ গাথার সাদৃশ্যে এই উপন্যাসটি রচিত।

পাশাপাশি, তাঁর ইতিহাস প্রীতিরও পরিচয় পাই ‘রাইবনীদুর্গ’ নামক উপন্যাসটিতে। ‘শক্তিকানন’, ‘ফুলজানি’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের উপাদান-অনুষঙ্গ চরিত্র-ঘটনাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিজিতকুমার দত্তের ভাষায়—“ ‘শক্তিকানন’ এবং ‘ফুলজানি’ উপন্যাসে ইতিহাস চিত্রডোরের কাজ করেছে। ‘বিশ্বনাথ’ ঐতিহাসিক বনাম জীবনী পর্যায়ের গ্রন্থ। ‘রাইবনীদুর্গই শ্রীশচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।”<sup>১৬</sup>

‘শক্তিকাননে’র ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই আবার ‘ফুলজানি’র অন্তঃপুরের ঘটনা কিংবা সিরাজের বিচারের ছবি রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস-বর্ণনা কৌশলের কথাই মনে করায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিকতার ছাপটিও বর্তমান। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় তাঁর লেখাগুলি ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান পাঠে আমাদের আকর্ষণ বাড়ায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক উপন্যাসিকদের ইতিহাস চর্চার প্রবণতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হ’ল— হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘জয়াবতী’ (১৮৬৩), ‘কমলাদেবী’ (১৮৮৫) ইত্যাদি উপন্যাসে ইতিহাস নাম মাত্র। বলা যায় অনূদিত গ্রন্থ। যদিও লেখক বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন—“জয়াবতীর উপাখ্যান প্রচারিত হইল। ইহা ইংরেজি রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনুবাদিত। ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। স্থানে স্থানে অনেক ভাব পরিত্যক্ত ও নূতন ভাব সমাবেশিত হইয়াছে।”<sup>১৭</sup>

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৫-১৯২১) ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ (১ম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪) বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপনার্থে ও রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মূলানুসন্ধানে রচিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র নিয়ে উপন্যাস

রচনা করেছেন কিন্তু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’ (দ্বিতীয় খণ্ডে) এই চরিত্রটির দোষ-গুণ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুলনায় এটি অধিক ইতিহাস তথ্য নির্ভর। এখানে ইতিহাসের তথ্য ও সত্য অনেক বেশি উজ্জ্বল। ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হয়েই তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এদিক থেকে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নিষ্ঠার পরিচয় ও পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন।

পাশাপাশি, রামগতি ন্যায়রত্নের ‘ইলছোবা’, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের ‘চিত্ত বিনোদিনী’ (১৮৭৪), কালীকৃষ্ণলাহিড়ীর ‘রশিনারা’ (১২৭৬), হারাণচন্দ্র রাহার ‘রণচণ্ডী’ (১৮৭৬), মনমোহন বসুর ‘দুলীন’ (১৮৯৩), কেদারনাথ চক্রবর্তীর ‘চন্দ্রকেতু’ (১২৮৫), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘জাল প্রতাপচাঁদ’ (১২৮৯), কালীপ্রসন্ন দত্তের ‘বিজয়’ (১২৯১), ক্ষেত্রগোপাল রায়ের ‘ইন্দুকুমারী’ (১৮৯১), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘অমরসিংহ’ (১২৯৬) প্রভৃতি উপন্যাস মূলত স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক কাহিনি নির্ভর। পাশাপাশি কিছু কিছু উপন্যাসে সিপাহী বিদ্রোহ, ইংরেজ বিদ্রোহ, বর্গির হাঙ্গামা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভাবনা, কাছাড় অঞ্চলের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। অগ্রজ ঐতিহাসিক উপন্যাসিকদের প্রভাব এঁদের মধ্যে বর্তমান। দু’একজন মৌলিকতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। যেমন—‘রশিনারা’, ‘রণচণ্ডী’ ও ‘জাল প্রতাপচাঁদ’ প্রভৃতি। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জাল প্রতাপচাঁদ’ সম্পর্কে বলেছেন—“ জাল প্রতাপচাঁদ’ নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনা সংস্থান প্রমাণ-বিচার এবং লিপি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতুহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকেন না—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হয়, ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, ‘সঞ্জীবচন্দ্র’)

অন্যদিকে এসময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা হ’লেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায় ও দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘কাঞ্চনমালা’ (১২৯০) ও ‘বেনের মেয়ে’ (১৩২২) ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। হিন্দু-বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় রচিত। বৌদ্ধ-হিন্দু বিরোধের কাহিনি উপস্থাপনার ফলে উপন্যাস দু’টি নূতনত্বের দাবি রেখেছে। বৌদ্ধদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি থাকলেও ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধে হিন্দুদের জয় ঘোষিত হয়েছে। ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে দেখা যায় বান্ধাণ্য শক্তির প্রাধান্য। বৌদ্ধধর্মের মানুষরা মূলত বাগ্দী সম্প্রদায়ের। তাই তাদের রাজাকে ব্রাহ্মণরা মানতে নারাজ। শিষ্যা মায়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের চিত্রটি

ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি ‘নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব, ১৩৫৯, পৃ. ২৯২) গ্রন্থে বলেছেন—মূলত বর্মণ রাষ্ট্রকে অবলম্বন করেই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এই বাংলাদেশে প্রসারিত হ’তে আরম্ভ করে। তাছাড়াও রাজা হরিবর্মদেব, মহীপাল, ভবদেব ভট্ট প্রমুখ চরিত্র ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব। ‘বেনের মেয়ে’ ইতিহাস নয় বলে দাবি করলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ‘বেনের মেয়ে’র আখ্যান রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত পথ থেকে সরে এসে কাহিনি নির্মাণ করেছেন। সেকালের বাংলা ও বাঙালির জীবন, বাংলার বসবাসকারী অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের জীবন-যাপন ও সামন্তরাজা বা স্বাধীন দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা বর্ণন ইত্যাদি অনুপূজ্যভাবে ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। হরিবর্মদেবের রাজ্যবিজয়ের পর উপন্যাসের আখ্যান কিছুটা শিথিল হলেও হিন্দু বৌদ্ধ বিরোধের পটভূমিকায় বাংলার ইতিহাসকে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনায় ‘বেনের মেয়ে’র কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘বীরপূজা’ (১৩১২), ‘রাজা গণেশ’, ‘রানী ব্রজসুন্দরী’, ‘বাঙালীর বল’ (১৩১৮) ইত্যাদি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতে বাংলার বীর চরিত্র পূজার পাশাপাশি বাঙালির ক্ষমতা, বাহুবল ও বাঙালির ইতিহাস স্পষ্টভাবে চিত্রিত। বিশেষ করে ‘বঙ্গভঙ্গ’ আন্দোলনের পটভূমিকায় ‘বাঙালীর বল’ উপন্যাসটি বাঙালিদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ‘রানী ব্রজসুন্দরী’ উপন্যাসে কালাচাঁদ ওরফে কালাপাহাড়ের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে সেকালের বাংলার চিত্র উঠে এসেছে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সংহতির কথা ‘রাজাগণেশ’ উপন্যাসটির ভিত্তি ও ইতিহাসের তথ্যের আটসাঁটো বর্ণন এই উপন্যাসটির উপজীব্য। বলাবাহুল্য, হিন্দু গৌরব গাঁথার ছবি পাওয়া গেলেও মুসলমান বিদ্বেষ দেখা যায় না। লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থেকে পুরোপুরি যুক্ত হতে পারেনি বলেই উপন্যাসগুলির চরিত্র চিত্রণে ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বর্ণনায় বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষণীয়। ‘বাঙালীর বল’ ও ‘রানী ব্রজসুন্দরী’ উপন্যাসে যথাক্রমে মায়ার চরিত্রে ‘সীতারাম’ উপন্যাসের শ্রীর প্রভাব ও উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্তির প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধার কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের কথা স্মরণ করায়। এছাড়াও রমেশচন্দ্র দত্তের ‘মাধবী কঙ্কণে’র অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই ‘রানী ব্রজসুন্দরী’ উপন্যাসে ‘কালচাঁদের করনাগীর কার্যভার গ্রহণের ঘটনায়। সর্বোপরি বতে দ্বিধা নেই যে, শীশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বাংলার ও বাঙালির ইতিহাস উদঘাটনে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছে এবং বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুরিপুষ্ট করে তুলেছে।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬২-১৯৩৮), ‘রঙ্গমহাল’ (১৯০১), ‘শীশমহল’ (১৯১২), ‘নূরমহল’ (১৯১০), ‘সুবর্ণ প্রতিমা’ (১৯১৩), ‘রঙ্গমহল রহস্য’ (১৯১৪) ইত্যাদি

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত। ইতিহাস, ইতিহাস কল্পনা, রোমাঞ্চ ও রূপকথার বৈশিষ্ট্যে ভরপুর তাঁর উপন্যাসগুলি। ষোড়শ-শপ্তদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় মোগল ও রাজপুত দ্বন্দ্বের ছবি চিত্রিত হওয়ার ফলে মোগল রাজ অন্তঃপুরের প্রেমের কাহিনি বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসগুলির পাতায় পাতায়। বেশিরভাগ চরিত্রই উপন্যাসের পাতা থেকে নেওয়া। কল্পিত চরিত্ররা ইতিহাসের চরিত্রদের ক্রিয়া কলাপ-সম্পদনার্থে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের চরিত্রে সঙ্গতি রঙ্গিত হয়নি। যেমন—সেলিমের চরিত্রে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গমহাল সিরিজ, আটআনা সিরিজগুলিতে অনৈতিহাসিক গল্পও পাওয়া যায়। বলা যায়, তাঁর ‘শীশমহল’ উপন্যাসটি কাহিনির প্রথম অংশের চমৎকারিত্বে, ইক্কান্দার খাঁর রূপ তৃষ্ণা, বর্ণনা ও লালসায়, প্রেম ও পতিসেবার নিষ্ঠায় সর্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

শরৎকুমার রায়ের ‘মোহনলাল’ (১৯০৬) বাংলায় মুসলমান পতনের সময়ে রচিত। বাংলার মুসলমান আমলের চরিত্র ও ঘটনা বর্ণনায় উপন্যাসটি পাঠকের নজর কেড়েছে। সিরাজের পক্ষে মোহনলাল ঘসিটি, রাজবল্লভ ও মীরজাফরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। সিরাজের সিংহাসন লাভের মুহূর্ত কি সংকটময় ছিল তা বোঝাতে লেখক ‘মোহনলালে’র মত উপন্যাস লিখেছেন। তাছাড়াও ইংরেজদের কুটকৌশল ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা লোভের বিষয়টি বাদ পড়েনি। সর্বোপরি মানুষের ত্যাগের মানসিকতার কথা জানা যায়।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর ‘রানীভবানী’ (১৩১৬), ‘রাজারামকৃষ্ণ’ (১৩১৭) ও ‘লক্ষ্মণ সেন’ (১৩২০) প্রভৃতি উপন্যাস ইতিহাসের অনুষ্ণ উপাদানের আশ্রয়ে রচিত। ঐতিহাসিক কাহিনি বর্ণনায় এগুলির মূল্য স্বীকার করতেই হয়। রানীভবানীর জীবনে ‘গীতা’র জীবনদর্শনের ছাপ বর্তমান। রানীভবানীর আদ্যোপান্ত জীবন কাহিনি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক কাহিনি সংঘটন-সংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইতিহাসের সংস্রবের খাতিরে বইটি পাঠকের আকর্ষণ বাড়ায়। সিরাজের অত্যাচার, রাজনৈতিক অস্থিরতা ষড়যন্ত্র, কুটচাল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ইংরেজের আক্রমণ ইত্যাদি তার উদাহরণ। অন্য দু’টি সিরাজের পতন, আত্মত্যাগ ও জয়দেব পদ্মাবতী কাহিনি সম্বলিত রচনা। ‘রাজারামকৃষ্ণ’ সংসারধর্ম ছেড়ে ত্যাগের জীবনে প্রবেশ ও গীতোক্ত কর্ম সাধনাই বড় হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত পরিচয় ও পতনের দিকটি ‘লক্ষ্মণসেন’ উপন্যাসে বর্ণিত হলেও কল্পনাকেই ঔপন্যাসিক যথাসম্ভব বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ইতিহাস মুখ্য নয়, কল্পনা চারিতাই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালের উপন্যাস স্রষ্টাদের মধ্যে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের ‘বঙ্গের শেষ

বীর’ (১৩০৪), ‘রানীভবানী’ (১৩১০), ‘মস্তুর সাধন’ (১৩০৫), ‘প্রতিভাসুন্দরী’ ও ‘জ্যোতিময়ী’ (১৩০৭) ইত্যাদি কথাসাহিত্যের ধারাকে পুষ্ট করে তুলেছিল। রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি ‘বঙ্গের শেষ বীর’ উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যকে বীর সন্তান হিসেবে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের প্রতাপাদিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অমিল চোখে পড়ে। হারাণচন্দ্র রক্ষিত বইটির ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ—“বাঙ্গালী পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহে না,—তাই এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবতারণা।”<sup>১৮</sup> অর্থাৎ লেখক বাঙালির মনে অতীত ইতিহাস মনে করিয়ে বাঙালির চরিত্র ধর্মকে জানাতে চেয়েছেন। বাংলার গৌরবকে বোঝাতে চেয়েছেন—এতে সন্দেহ নেই।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ‘স্বপ্নসুন্দরী’ (১৩১৫), ‘যোগরানী’ (১৯১১), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘শোভা সিংহ’ (১৩১৫), দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘নানা সাহেব’ (১৯২৯) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘ডক্টা নিশান’ (১৩৩০) উল্লেখযোগ্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০) ইতিহাসবিদ হিসেবে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি ইতিহাস চর্চার মধ্যদিয়ে তিনি দেশসেবার কাজ করেছেন। তাঁর ইতিহাস চর্চা বাঙালির জাতীয় জীবনের পরিচয়কে তুলে ধরতে উজ্জ্বল রূপে সমর্থ হয়েছিল। আমাদের দেশে-ইতিহাসে দৈন্যদশা দেখা যায়, প্রকৃত ইতিহাস এখনও পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের দীনতা সত্ত্বেও ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। কারণ তিনি প্রকৃত ইতিহাস জানার চেষ্টা করলেন। মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার তাঁর কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। মূলত শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রাকে অবলম্বন করে বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। এমনকি সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন, সামাজিক রীতিনীতি, ও কাহিনিকেও ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসেবে গণ্য করলেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের উদ্ধারে তথ্য ও সত্য নির্ণায়, অনুদানে-কল্পনায়, যুক্তি ও প্রামাণিকতায় ইতিহাস রচনার পাশাপাশি ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করে কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনা করলেন। এই উপন্যাসগুলি ‘ইতিহাসের পরিপূরক’<sup>১৯</sup> হয়ে দেখা দিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হল—‘শশাঙ্ক’ (১৩২১), ‘ধর্মপাল’ (১৩২২), ‘করণা’ (১৩২৪), ‘ময়ূখ’ (১৯১৬), ‘অসীম’ (১৩৩১), ‘লুৎফউল্লা’ (১৩৩৪-১৩৩৬), ‘প্রব্বা’ (১৩৩৮) প্রভৃতি।

ইতিহাসের মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাবনার কথা ভেবে নিয়েই তিনি মূলত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ‘শশাঙ্ক’ সহ সমস্ত উপন্যাসই তার প্রমাণ। মুসলমানের দ্বারা বিজিত হওয়ার ঘটনা, দেশ-প্ৰীতি, ভারতের ইতিহাসের প্রতি প্রবল আসক্তি, বাংলা তথা

ভারতের মানুষকে সদ্য অতীত ইতিহাস, দূরকালের ইতিহাস মনে করানোর মধ্যে দিয়ে আপন আপন গৌরব ও মর্যাদার কথা জানানো, প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান, হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব যুগের প্রকৃত চিত্র, বৈষ্ণববাদ-বৈষ্ণবপ্রীতি, মুগল-পাঠান, পর্তুগীজ, বাঙালির ইতিহাস ইত্যাদি অনুষঙ্গের মধ্যেই আখ্যানের সম্ভাবনা বর্তমান। তাই তিনি যুগপদ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাসটিতে ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনজীবন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রথা-ঐতিহ্য ইত্যাদি বাংলার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি ইতিহাসের কচকচানিতে গা ডুবিয়ে না দিয়ে সাধারণ মানুষের আটপৌরে ভিটেমাটি হীন মানুষের কথা মহাকালের গতির নিয়মে উত্থান-পতনময় কাহিনিতে দক্ষ ডুবুরির মত ডুব দিলেন। এখানেই তাঁর সাফল্য। তাঁর ধারণায় 'ইতিহাস মূক-জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজরাদের বিজয় কাহিনী নয়।' (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ১২, গ্রন্থ পরিচয়) চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা' থেকে ইতিহাস সম্পর্কিত উক্ত ধারণাগুলির পরিচয় দিয়েছেন। এই 'ইছামতী' উপন্যাসে তারই প্রতিফলন লক্ষণীয়। সে সময়ের নীলকুঠির কথা, ইংরেজদের কথা-প্রসঙ্গ, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার ইতিহাসের ফ্রেমে সাধারণ মানুষের জীবনী গাথা হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাহিত্যে ব্যবহৃত ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকগান, ইতিকথাকে সম্বল করে মানুষের ইতিবৃত্ত আঁকতে চেয়েছেন। মানুষের জীবন ইছামতী নদীর মতোই বহমান। কখনো গড়ে কখনো বা ভাঙে। ভাঙা-গড়াই নদীর ধর্ম। এই ভাঙা-গড়ার মাঝখানে মানুষের জীবন কাহিনি জড়িয়ে থাকে। নিকট অতীতের জীবন ইতিহাসের সম্পদ। এই নিকট অতীতের জীবন মহাকালের শ্রোতপতে সুদূর অতীত হয়ে ওঠে। আর তাতেই মানুষ ইতিহাসের মহা উপাদানে পরিণত হয়। তৈরি হয় খাঁটি ইতিহাস। এই মানুষের ইতিহাসই 'ইছামতী'র আখ্যান-নির্মাণ করেছে। যদিও তিতুমীরের কাহিনি, নীলকরদের জুলুম অত্যাচার সম্পর্কে কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের শিথিলতা এই উপন্যাস পাঠে আমাদের মনে আসে।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১), 'রাধা' (১৯৫৯), 'জঙ্গলগড়' (১৯৬৪), 'গন্নাবেগম' (১৯৬৫) প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসের পদ ধ্বনি শোনা যায়। যদিও তিনি 'গন্নাবেগম' বইটিকে ভূমিকাংশে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এর পূর্বে 'রাধা' ও 'জঙ্গলগড়' প্রকাশিত হয়েছে। অতীত ইতিহাস কল্পনায় রোমান্সের ছোঁয়ায় এগুলি রচিত। ইতিহাসের তুচ্ছ উপাদান ব্যবহৃত হলেই যে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে পদবাচ্য হবে তা কিন্তু নয়। উল্লিখিত

উপন্যাসগুলিও কিন্তু এই গোত্রেরই পরিচয় বহন করে।

‘রাধা’ উপন্যাসটিতে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, তান্ত্রিকতার প্রভাবে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের পরকীয়াতত্ত্ব, স্বকীয়াতত্ত্ব, আদিরস, নারী সাধনা, কুমারী পূজা, সহজিয়াদের অত্যাচার মদনমহোৎসব, ব্যভিচার, নিষ্ঠা, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনেই তৈরি হতে পারে অমরাবতী, বৈষ্ণবের প্রতি শ্রীতি পক্ষপাত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রাজনৈতিক তুমুল সংঘাত, বর্গির আক্রমণ, লুণ্ঠরাজ, নারীহরণ, শিশু হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা বলতে পারি যে, এই উপন্যাসটি মূলত জাতীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস। বৈষ্ণব ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈষ্ণববাদকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে তা শিল্পীত রূপ লাভ করেছে।

‘গন্যবেগম’-এ মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দিকটি ফুটে উঠেছে। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন, সে সময়ের সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার, অবিচার, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস ঘাতকতা, আমির ওমরাহদের ব্যভিচার, বিলাসিতা, মদ্যাশক্তি, নারীর প্রতি আসক্তি ইত্যাদি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গন্যবেগমের করুণ জীবন কাহিনি চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা কীভাবে একটি নারীর জীবনকে দুর্বিবহ করে তোলে তার নিপুণ চিত্র ‘গন্যবেগম’র আখ্যানে বর্ণিত। লেখক ইতিহাসের অতি তুচ্ছ উপাদানের সঙ্গে কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে এক রমণীয় কাহিনি রচনা করেছেন।

‘জঙ্গলগড়’ উপন্যাসটি পাঠে বীরভূম, মালভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জনজাতি ও ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস ও কল্পনার সহযোগে ‘জঙ্গলগড়ে’র আখ্যান নির্মাণ করেছেন। তবে লেখকের দূর অতীতের চেয়ে সমকালের অতীত ইতিহাস বেশি পছন্দ। এই উপন্যাসটি পড়লে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গৌড়মল্লার’ (১৯৫৪) নামক ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসটির কথা এসে যায়। তবে উভয়ের লেখকের রচনাগত, কৌশলগত পার্থক্য বিদ্যমান। তারশঙ্করের উপন্যাসের চেয়ে শরদিন্দুর উপন্যাসে অনেক বেশি ঐতিহাসিক উপাদান লক্ষণীয়।

ইতিহাসের প্রসঙ্গ বলতে বর্গির আক্রমণ, আলিবর্দীর সঙ্গে বর্গির দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস ঘাতকতা, আঞ্চলিক ইতিবৃত্ত, লোকসাহিত্য ও লৌকিক উপাদানের ওপর নির্ভরতা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ইতিহাসের চাকচিক্য নেই রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনগাথার অপূর্ব চিত্র। ইতিহাস মুখ্য নয়, জীবন নির্ভরতাই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একজন সর্বজন

পরিচিত লেখক। বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ধারায়ও তিনি বহুল পরিচিত ও বহুচর্চিত। এককথায় জনপ্রিয় কথাশিল্পী। তিনি সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের থেকে নিজেকে আলাদা করে গড়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য আমাদের নজর কাড়ে। সত্যিকারের রস সাধকের যা সাধনা তাই-ই তিনি করেছেন সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে। ভাব-ভাবনা-রচনা রীতি-ভাষারীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। বস্তুনিষ্ঠ, কটুতিক্ত, জঠরের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা ইত্যাদি থেকে সরে এসে এক রমণীয় কল্পলোক গড়ে তুলেছেন। অভিনব সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করে সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি হ'ল—‘কালের মন্দিরা’ (১৯৫০), ‘গৌড়মল্লার’ (১৯৫৪), ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ (১৯৫৮), ‘কুমার সম্ভবের কবি’ (১৯৬৩) ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (১৯৬৫)।

এছাড়াও আরও কয়েকটি এই জাতীয় উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—‘ঝিন্ডের বন্দী’ (১৯৩৮), ‘বহুযুগের ওপার হতে’ (১৯৬০), ‘রাজদ্রোহী’ (১৯৬১) প্রভৃতি।

প্রথমপর্বের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের জগৎ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের চূড়ান্ত স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর লেখক প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ বললেও অত্যুক্তি হবে না। যদিও গোয়েন্দা গল্পগুলিও চূড়ান্ত জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গেছে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র জন্য তিনি ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ লাভ করেন।

‘ঝিন্ডের বন্দী’, ‘বহুযুগের ওপার হতে’, ‘রাজদ্রোহী’ প্রভৃতি রচনাও ইতিহাসের উপদানের সংমিশ্রণে রচিত। লক্ষণীয়, রোমান্স পিপাসু মানুষের জন্যই এগুলি সমাদৃত হয়েছে। ইতিহাস এখানে উজ্জ্বল নয়, মূলত Anthony Hope-এর The Prisoner of Zenda বইটিকে অনুসরণ করে লেখা ‘ঝিন্ডের বন্দী’ উপন্যাসটি পরাধীন ভারতের (মধ্যভারত) করদমিত্র রাজ্য ঝিন্দঝাড়ায়ার পটভূমিকায় রচিত। এর কাহিনি রোমান্সরসের আকর্ষণে পাঠককে অদ্যন্ত মুগ্ধ করে রাখে। ষড়যন্ত্র, প্রেমপিপাশা, বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রভুপ্রীতি, ঈর্ষা-বিদ্বেষ প্রভৃতি ময়ূর বাহনের চরিত্রে আরোপিত হওয়ার কারণে চরিত্রটি খলনায়কে পরিণত হয়েছে। সর্দার ধনঞ্জয়ের চরিত্র আমাদের অনুকম্পা লাভ করে সতেজ হয়ে উঠেছে। শঙ্কর সিং ও গৌরীশঙ্করের চরিত্র অবতারণার মধ্যে লেখকের গোয়েন্দাগিরি সুলভ মনোভাবের পরিচয়ই লক্ষণীয়। সর্বোপরি কাহিনি বিন্যাসে নাটকীয়তা, সংঘাত, আবেগ থাকলেও শিথিলতাও চোখে পড়ে।

‘রাজদ্রোহী’ উপন্যাসটিও মূলত প্রাক-স্বাধীনতা পূর্বযুগে রচিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে অবস্থিত একেবারে আরবসাগরের উপকূলে স্থিত কাথিয়াবাড় রাজ্যকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটির কাহিনি নির্মিত। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের দস্যুপ্রীতি শরদিন্দুর মধ্যেও বর্তেছে তাই এই উপন্যাসটিতে

নায়ক চরিত্রকে অত্যাচারিতের, আতের, নিপীড়িতের সহায়ক বন্ধু হিসেবে দেখানো হয়েছে। রাজদ্রোহী রাজপুত্র প্রতাপ সিংহ বলিষ্ঠ পুরুষ সিংহ। তিনি অসাধু, সুদখোর, কুসীদজীবী মানুষের আতঙ্ক। নিপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত ও দরিদ্র মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে চিত্রিত। কাথিয়াবার প্রদেশের মানুষ তাই তাঁকে পরোপকারী ও উদ্ধারকর্তা ভাবে। রবিনছডের আদর্শেই এই চরিত্র অঙ্কিত। পাশাপাশি মানবিক ও প্রেমিক এই উভয় গুণও তাকে অন্যমাত্রা দান করেছে। ফলত চরিত্রটি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়।

‘বহুযুগের ওপার হতে’ মূলত ‘বিষকন্যা’ নামক গল্পের অন্য রূপ। যেমন— ‘রাজদ্রোহী’, ‘যুগে যুগে’ নামে চিত্রনাট্য হিসেবে প্রকাশ পায়। ‘বিন্দের বন্দী’ ও চিত্রনাট্যের জন্য লেখা। ‘বহুযুগের ওপার হতে’ উপন্যাসটি (১৯৬০) ‘বিষকন্যা’র কাহিনির ধারাবাহিক বিবরণ মাত্র। বিষয়গত, কাহিনিগত, চরিত্রগত ও ঘটনাসংস্থানগত সাদৃশ্যের কারণে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কারণ ‘বিষকন্যা’ নামক গল্পটি সম্পর্কে এই অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে (শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ) বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আসলে এই কাহিনিগুলি শরদিন্দু চিত্র নাট্যের জন্য রচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁকে চিত্রনাট্যের শর্তানুসারে প্রয়োজন মতো নামবদল সহ আংশিক দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ নাটকীয় কাহিনির কায়ারূপ নির্মাণ করতে হয়েছে। কাহিনিগুলিতেও ইতিহাসের উপাদান ও কল্পনার মিশ্রণ লক্ষণীয়। রোমান্সের প্রাচুর্যের দরণ এই রচনাগুলি পাঠে পাঠকের মনোযোগ বাড়ায়।

ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের ‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে। উল্লেখ্য, গল্প রচনার সময় ধরে নয় গল্পের পটভূমির কাল-সীমা ধরে আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি উল্লেখ করছি। যথা; ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘রুমাহরণ’, ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’, ‘আদিম’, ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘অষ্টমসর্গ’, ‘মরু ও সঙ্ঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘রেবা রোধসি’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘চুয়াচন্দন’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘তক্ত মোবারক’, ‘চন্দন-মূর্তি’ ইত্যাদি।

অন্যদিকে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি (শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস) নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিচার করেছি এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের ‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’ শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে।

নির্দেশিকা :

১. অশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, পৃ. ১২
২. মার্ক ব্লক, ইতিহাস লেখকের কাজ, ভাষান্তর - আশিষকুমার দাস, সম্পাদনা - প্রভাত দাশগুপ্ত, পৃ. ১২
৩. ই. এইচ. কার, কাকে বলে ইতিহাস?, অনুবাদ - স্নেহোৎপল দাস, সম্পাদনা - রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও সৌমিত্র পালিত, পৃ. ২১
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য (ঐতিহাসিক উপন্যাস), পৃ. ১৬১
৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯
৬. তদেব, পৃ. ৪৩৬
৭. শচীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার, পৃ. ৩৫
৮. হরিশ্চন্দ্র পাল (সম্পাদিত), গোসানীমঙ্গল, ভূমিকাংশ
৯. নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পাদিত), বিষয় : কোচবিহার, বেহারোদন্ত, পৃ. ৪
১০. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৮৮
১১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৫
১২. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৮
১৩. তদেব, পৃ. ১৬
১৪. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম, ১৪০১, পৃ. ৩৯২
১৫. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম, ১৪০১, পৃ. ৩৯৪
১৬. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ২০০-২০১
১৭. তদেব, পৃ. ২০২
১৮. তদেব, পৃ. ২৪৪
১৯. তদেব, পৃ. ২৫৫

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের ভূমিকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ইতিহাসের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ইতিহাস সম্পর্কে দু'চার কথা বলা এই অধ্যায়ে অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাস সম্পর্কে তথাকথিত ধারণা যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে, সময় বদলের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণভাবে বদলে গেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাসকে বলেছেন—বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে অনেকেই তা অস্বীকার করেছেন। যুক্তি দিয়ে অন্যমত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। কারণ, মানব বিষয়ক বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান কিংবা অতীত বিষয়ক বিজ্ঞান এক নয়। ইতিহাস যেহেতু মানুষের সামগ্রিক জীবনের সংবাদ বা খবরাখবর দেয় সেজন্য ইতিহাস মানব বিষয়ক বিজ্ঞান; অতীত বিষয়ক বিজ্ঞান নয়—“মানুষদের একটা সময়ের বিজ্ঞান।”<sup>১</sup> তদুপরি বিজ্ঞান মানে তথ্য নিষ্ঠতা, তথ্য যা বলে তাঁর বাইরে না যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাস হ'ল সমসাময়িক বিষয়ের চর্চা ও আলোচনা। একজন ইতিহাস লেখক ইতিহাসের তথ্যকে নিজের সৃষ্টি ক্ষমতা বলে সেই তথ্যের মধ্য থেকে সত্যটি বের করে এনে ইতিহাস লেখেন। তবে তা বিমূর্তভাবে নয়, উজ্জ্বলরূপে; মানুষ ও সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। আমাদের চিন্তা-চেতনা, আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, ষড়যন্ত্র, সখ্যতা, জিঘাংসা, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমস্তই অবলীলাক্রমে একজন ঐতিহাসিক সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইতিহাস শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে হয় কোনো বিষয় বা বস্তুর পুনঃরূপ দান কিংবা পুনর্নির্মাণ। কারণ একজন ঐতিহাসিক অতীতের বিষয়কে বর্তমানে বসে নবরূপ দান করেন। ইতিহাস লেখকের কাজ নিয়ে বিস্তারিত বলবার অবকাশ আমাদের নেই, কারণ আমরা ইতিহাস আলোচনা করব না। আমাদের গবেষণার বিষয় হ'ল ইতিহাসের তথ্য ও সত্য মেশানো ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য। তবুও ই. এইচ. কারের মন্তব্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য—“ঐতিহাসিকও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তর্হীন সংলাপ।”<sup>২</sup> অর্থাৎ বলা যায়, ইতিহাসের লেখক ও ইতিহাসের তথ্য দুয়েরই গুরুত্ব অপরিমিত। কারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি মানুষটি ছাড়া ইতিহাসের তথ্য মৃত কিংবা অর্থহীনতার নামান্তর। যাইহোক, ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের উপাদানের নিরিখে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের বিষয়। আর একটি কথা না বললে নয়, তা হ'ল—“আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে কেউ যদি সত্যিই ঐতিহাসিক হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে, যে-দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা ‘প্রদান’ ও ‘প্রতিদান’

বলেন সে দুটি একসঙ্গে চলতে থাকে এবং আসলে তারা একই প্রক্রিয়ার দুটি অংশ। কিন্তু আপনি যদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন আর একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তাহলে আপনি দুটি বিপ্রবণতার একটিকে পড়ে যাবেন। হয়, আপনি অথহীন তাৎপর্যহীন ‘কাঁচি ও আঠা’ মার্কা ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার-কাহিনী বা ঐতিহাসিক উপন্যাস।”<sup>৩০</sup>

ঐতিহাসিক উপন্যাস কি? ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলে? এ সম্পর্কে সকলেরই ধারণা রয়েছে। তবুও সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক যথার্থ ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনা করতে পারেননি। মূলত দু’একজন ব্যতিরেকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বিশ শতকের তিনের দশকের কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয় ও সার্থক শিল্পী। ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারও পান। বহু সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ তাঁর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—“আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন—এ জন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না কিন্তু আপনার বই পড়িবে।”<sup>৩১</sup> এ থেকে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত রচনা সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিকের সমর্থন মেলে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই কেন লোক পড়বে? তারও অনুপুঞ্জ বিচার ও বিশ্লেষণের কথা এখানে এসে যায়। বলাবাহুল্য যে, তাঁর রচনায় সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর রচনা সত্যিকারের রস সাহিত্য। সময়ের অভিজ্ঞান স্বরূপ তাঁর ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলিতে অতীত সময়ের বিষয়বস্তুকে সেকালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে অতীতের জনজীবনকে জীবন্ত করে তুলেছেন, যা থেকে আমরা এ কালের মানুষেরাও সেকালের জীবনের রস আশ্বাদন করতে পারি। অতীতেও বর্তমানের আশ্চর্য সন্মিলন। ভবিষ্যতের জগৎ নির্মাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও মানব সমাজের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ভাষ্য তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় ইতিহাস চর্চা ও দেশানুরাগ তাঁর আত্যন্তিক ভাবনার ফসল। বিশেষ করে তাঁর রচিত সতেরোটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প ও পাঁচটি ঐতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের তার প্রমাণ পাই। ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলি হ’ল—১. ‘ইন্দ্রতুলক’, ২. ‘রুমাহরণ’, ৩. ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’, ৪. ‘আদিম’, ৫. ‘অমিতাভ’, ৬. ‘বিষকন্যা’, ৭. ‘সেতু’, ৮. ‘মৃৎপ্রদীপ’, ৯. ‘অষ্টম সর্গ’, ১০. ‘মরু ও সগুঘ’, ১১. ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ১২. ‘রেবা রোধসি’, ১৩. ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ১৪. ‘চুয়াচন্দন’, ১৫. ‘বাঘের বাচ্চা’, ১৬. ‘তক্ত মোবারক’, ১৭. ‘চন্দন-মূর্তি’।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি হ’ল—১. ‘কালের মন্দির’, ২. ‘গৌড়মল্লার’, ৩. ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ৪. ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ৫. ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’।

ইতিহাসমূলক ছোটগল্পগুলি পাঠে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাই। তিনি ইতিহাসের দু-চারটি সূত্র মাত্র সম্বল করে তিনি ইতিহাসের নবরূপ দান করেছেন। ইতিহাস লেখা তাঁর কাজ নয় বরং ইতিহাসের যুগের মানুষ ও তার জীবন কথা রচনাই তাঁর লক্ষ্য। সেজন্য তিনি ইতিহাসের তথ্যকে সম্ভব মতো এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে কাহিনিগুলি গড়ে তুলেছেন। পুরাতন ঐতিহ্যের, অতীত ভাবনার, সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগচিত্রের অপূর্ব ছবি ধরা পড়ে তাঁর রচিত কথাবিশ্বে। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের জগৎ আমাদের চকিতে যেন মানব সভ্যতার প্রাচীন রূপের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। আমরাও অত্যন্ত একত্বতা অনুভব করি। মনে হয়, অতীতের জগৎকে এক নিমেষে আমাদের স্পর্শের ভেতরে এনে দিয়েছেন। সে যে কালেরই হোক না কেন—তা একান্তই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। আমরা তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে সে যুগে উত্তীর্ণ হই। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—

“প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক গল্পের কাল প্রসার। এর মধ্যে কোথাও গল্পের পরিবেশ গল্প রসের তীক্ষ্ণতার হানি করে নি। দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খানেই ঐতিহাসিক গল্প লেখক রূপে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।”<sup>৫</sup>

আলোচ্য ছোটগল্পগুলির স্থানিক পটভূমি, ইতিহাসের উপাদান-অনুসঙ্গ ও সময়কালের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল :

‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি প্রাক্ আর্যযুগের পটভূমিকায় রচিত। মূলত আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিলো—এই ঐতিহাসিক তর্কের মীমাংসা নিয়েই গল্পটির সূত্রপাত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটির মধ্যে একটি প্রশ্ন তুলেছেন যে, আর্যগণ কি যুরোপের আদিম অধিবাসী? আজ পর্যন্ত সঠিক ভাবে আর্যদের বাসস্থান কোথায় ছিল তা বলা যায় না। আর ইতিহাসের এই নির্দিষ্ট তথ্যের অভাবের সুযোগ নিয়ে মানব সভ্যতার গোড়ার দিক সম্পর্কে গল্প লিখলেন। অনেকেই একে সীমিতবিস্তারিত কল্পনার বিস্তার বলতে পারেন। সেজন্য গল্পটির বহিরবয়ব স্বপ্নমূলক। পুরোটাই স্বপ্নের মধ্যে দেখা আর শেষ পর্যন্ত যাকে গল্পটা বলা হ'ল সেই শ্রোতা পুরো গল্পটা শোনার পর স্বপ্নটা বাস্তবের আঘাতে ভেঙে দিলেন। যেহেতু স্বপ্ন তাই পুরোপুরি তথ্যের দায় রইলো না, আর শেষে সেই স্বপ্নটাকেও ভেঙে একটা অবিশ্বাস তৈরি হ'ল। আর এর ভিতরে রইলো পণ্ডিতের তত্ত্বটা। গল্পের কথক নৃতাত্ত্বিকের মতো আর্য পূর্ব অবস্থার উৎসস্থলের সন্ধান প্রয়াস তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাছাড়াও একটি সম্ভাব্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তিনি এই গল্পটিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যার সূত্র ঋগ্বেদের দেবতাদের কথা, দেশের ভূগোল এবং কিছু কিংবদন্তি।

“দেশটা ইন্দ্রের দেশ বলে পরিচিত হল; প্রাচীন দেশ অবশ্য বরুণের দেশই রইল।

ইন্দ্রের দেশে যারা বাস করতে লাগল, তাদের নাম হল ইন্দ্র। কালক্রমে ইন্দ্র অপভ্রংশ

হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। এখনও সেই নাম চলে আসছে। আমরা হিন্দু অর্থাৎ ইন্দ্রপূজক।”<sup>৬</sup>

গল্পটি পাঠে বোঝা যায়, লেখক মূলত ইন্দ্রদেবতার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে প্রকল্প বিন্যাস করেছেন। আর্যদের বাসস্থান সম্পর্কে একটা নূতন ধারণার সূত্র নির্দেশ করেছেন। স্পষ্টতই কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্ আর্যযুগের দেশ সংস্থান এবং কিংবদন্তি অবলম্বনে এই কাহিনি রচনা করে পুরানো ধারণার পুনর্নির্মাণ করেছেন। গবেষকরা বলেন আর্যরা রাশিয়ার উরাল পর্বতের কিরখিজ নামক স্থান থেকে পৃথিবীর নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একটি শাখা ইরাণ হয়ে এদেশে প্রবেশ করে এবং ভারতের সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি গড়ে। ‘ইন্দ্রতূলক’ গল্পটি পাঠে আমাদের মনে আর্য সভ্যতার আদি অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগে ওঠে। এই প্রশ্নটি তোলা হয়েছে কথকের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস প্রসঙ্গে, শ্রোতা সেই ইতিহাসকে অবিশ্বাস্য বলে স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে দিয়েছেন। শরদিন্দু এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—“... আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিকতর্কের মীমাংসা হয় নাই। আর্যগণ যুরোপের আদিম অধিবাসী ছিলেন ইহা যেমন সাহেবদের আঘাতে গল্প, আমাদের গল্প হয়তো ততটাই আঘাতে, তাহার বেশী নয়।”<sup>৭</sup>

‘রুমাহরণ’ গল্পটিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মানব সভ্যতার গোড়ার কথা বলবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগকে গল্পের পটভূমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সে যুগের লিখিত কোনো দস্তাবেজ, পুথি বা অন্য কোনো নিদর্শন নেই। যা আছে নানা ধরনের পাথরের অস্ত্র এবং পাথ্রে তার পরিচয়। শরদিন্দু এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন যুগের মানুষের সম্ভাব্য জীবনরূপটি চিত্রিত করেছেন। ইতিহাস না থাকলেও নানা দিক থেকে বিচার করে ঐতিহাসিকেরা সেই অতীতের একটা রূপ ধরতে চেষ্টা করেছেন। ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিদ্যার সহযোগে এই কাজ করা হয়েছে। রাখল সাংকৃত্যায়ণের লেখা ‘ভোল্গা থেকে গঙ্গা’ বইটিতেও মানব সভ্যতার গোড়ার কথাটির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। শরদিন্দুবাবু যুগপৎ ঐতিহাসিক ও কল্পনা কুশলী সাহিত্যিক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চালচিত্র সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন।

‘রুমাহরণ’ গল্পটি বিবাহের জন্য ‘নারীহরণ’ করার গল্প, বস্ত্র সামান্য কিন্তু লেখার কৌশলে প্রাচীনযুগের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সেযুগের মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিগত দিকটি এ গল্পে ধরা পড়েছে। নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব, ভিন্ন গোষ্ঠীর নারীহরণ, নারীর জন্য যুদ্ধ, এই ব্যাপারগুলি ভালো ভাবেই দেখানো হয়েছে। অতীতে অতি নগণ্য কারণেও একজন অপরকে হত্যা করতো। পশুর মতন আচরণ, পশুর মতন জীবনযাপনে সেদিনের মানুষকে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। একজন

নিরপেক্ষ দায়িত্ববান লেখক রূপে তিনি বলেছেন—

“প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া অধুনা লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যে সকল অস্থি কঙ্কাল বাহির করেন, তাহাতে রক্তমাংস সংযোগ করিয়া তাহার জীবিত কালের বাস্তব মূর্তিটি তৈয়ারি করিতে গিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে নিছক কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলে যে মূর্তি সৃষ্টি হয়, সত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কিনা এবং থাকিলেও তাহা কতদূর, সে সম্বন্ধে মতভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদ কিছুতেই শেষ হয় না।”<sup>৮</sup>

বস্তুতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের রূপ কেমন ছিল তা বলা কঠিন। ইতিহাসবিদগণ তথ্যের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে তার একটা আদল গড়ে তোলেন। একটা কথা বলা দরকার, কল্পনা যেখানে প্রাপ্ত তথ্যকে আশ্রয় করে শূন্যতাকে রূপ দেয়, অপ্রাপ্তকে যখন সম্ভাব্য করে তোলে, যুক্তির ভিত্তি যখন স্থির থাকে তখন সে কল্পনা বাস্তবকেই তুলে ধরতে পারে। একেবারে ছবছ বাস্তব না হলেও তার অনুরূপতা রচনা করতে পারে। ইতিহাসের রূপ প্রকৃতপক্ষে কী ছিল তা ইতিহাসবিদদের জানার বিষয়। কিন্তু তা সত্যরূপে জানা যায় না। ‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পে তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐ ভূ-প্রোথিত অতিকায় জন্তুর মতো। যদিবা বহু ক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল তাহা অংশ বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই বড় বড় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত তেরিয়া হইয়া এমন মারামারি-কাটাকাটি শুরু করিয়া দেন যে, রথী-মহারথী ভিন্ন অন্য লোকের যে কুরুক্ষেত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইবার আর সাহস থাকে না। এবং যুদ্ধের অবসানে শেষ পর্যন্ত সেই কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় কয়খানাই রণাঙ্গণে ইতস্তত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।”<sup>৯</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ইতিহাসবিদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের চেষ্টায় অতীতের পুনরুদ্ধার তো হয়ই না বরং পারস্পরিক মত পার্থক্যে মূল লক্ষ্যই পণ্ড হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকেরা সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে তার একটা শরীরী সংগঠন করেন। সাধারণ মানুষ ইতিহাস পড়েন না, বহু পণ্ডিতের মত কন্টকিত ইতিহাস-অরণ্যে তাঁদের ভ্রমণ স্বচ্ছন্দ নয়। তাঁরা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস পড়ে ইতিহাসের এবং উপন্যাসের স্বাদ পান।

আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের ছবছ বই লেখেননি বটে কিন্তু তাঁর লেখা ছোটগল্প বা উপন্যাসগুলির কাঠামোতে ইতিহাস অতিশয় উজ্জ্বলভাবে জায়গা করে নিয়েছে। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—“... এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে।”<sup>১০</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর ইতিহাস লেখার কারণ জানিয়েছেন—

“ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কাহিনী লেখা বঙ্গভাষায় প্রচলিত নয়। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সুর ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রাকমুসলমান যুগের ঐতিহ্য বাঙালী যেন ভুলিয়া গিয়াছে। রাখাল দাস স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইতিহাসবিৎ ছিলেন, গল্প লেখক ছিলেন না; তাই তাঁহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। বাঙালী জাতির হৃদয়ে ‘শশাঙ্ক’, ‘ধর্মপাল’ স্থান করিয়া লইতে পারে নাই।

আমি আমার অনেকগুলি গল্পে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এইগুলিই আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক, আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীন tradition-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করে না কেন? বাঙালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না; ততদিন তাহার কোনও আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।”<sup>১১</sup>

শরদিন্দুর এ উদ্দেশ্য অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের মত। বাঙালীকে ইতিহাস সচেতন হতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে এই জাতির ইতিহাস সন্ধান। জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব তিনি একই বহন করে উত্তর সাধকদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। শরদিন্দু বাংলা তথা ভারতের মানুষকে এই আত্মচৈতন্য জাগানোর জন্যই অতীত জীবনাস্রয়ী কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীকে অতীত ঐতিহ্য, মর্যাদা, গৌরব, প্রতাপ, বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক সমৃদ্ধির কথা জানাতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর স্বদেশানুরাগ, স্বজাত্যপ্ৰীতি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিচয়। তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে গভীর অনুরাগবশত তাদের হীনতাকে কখনো কখনো আঘাত করেছেন। তাঁকে বলা যেতে পারে আত্মজ্ঞানহীনতাকে অত্মচৈতন্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় সদা উদ্যমী লেখক।

অতীত ইতিহাসের মর্মভেদ করবার জন্য শরদিন্দু অনেকগুলি গল্পে জাতিস্মরতাকে আশ্রয় করেছেন। কীভাবে অতীতে প্রবেশ করা যায় লেখকের কাছে এটি একটি বড় সমস্যা। একালের মানুষ কীভাবে অতীতকে বুঝবেন? কী করে সে যুগে প্রবেশ করবেন? লেখকের কাছে তার একটি উপায় স্বপ্ন, একটি জাতিস্মরতা। রবীন্দ্রনাথ ‘স্বপ্ন’ কবিতায় স্বপ্নে সেকালের নায়িকার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। শরদিন্দু এই দুই কৌশল ব্যবহার করেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘বিষকন্যা’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘রুমাহরণ’ ও ‘সেতু’ এগুলি জাতিস্মরতা নির্ভর। ‘ইন্দ্রতুলক’ স্বপ্ননির্ভর। ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে অতীত সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ ও তাকে প্রত্যক্ষ করার উদ্যম ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পে। ধর্মোন্মত্ততার

সংক্রমক চিত্র রচনা এবং তার ফলে আত্মনাশ এ গল্পে দেখানো হয়েছে।

‘রুমাহরণ’ নামক ছোটগল্পটির মধ্যে লেখক মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনের দিকটির ইতিহাস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন জাতিস্মরতায় ডুব দিয়ে। আদিম নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ ছিল মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নারীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীভেদ, নারীহরণ এই গল্পের বিষয়। এ গল্পে সুদূর অতীতের কথা বলা হয়েছে। মানুষ যখন পশু শিকার করে পশুর মাংস কাঁচা কিংবা পুড়িয়ে খেত ঠিক সে সময় পর্বের পটভূমিকায় লেখা এই গল্পটি। ‘অমিতাভ’ বা ‘মুৎপ্রদীপ’ মগধ অঞ্চলের কাহিনি। এক সময় মগধ অঞ্চলের সঙ্গে বাঙালির যোগ ছিল। পাল রাজারা মগধের সম্রাট ছিল। কিন্তু যদি একান্তভাবেই বাঙালির ইতিহাস স্মরণযোগ্য হয় তবে তা ‘চুয়াচন্দন’ গল্পেই পাওয়া যায়। অন্য গল্পে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা—চুয়াচন্দন বাঙলার পটভূমিতে বাঙালির কথা। ‘চন্দন-মূর্তি’ও বাঙালির গল্প; কিন্তু তা একালের পটভূমিতে লেখা। পুরুষ ও নারী উভয়েই তখন প্রকৃতিদত্ত সহজাত শক্তি ও প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেকালের নারীর বর্ণনা—

“আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী—তাম্রবর্ণা, কৃশাঙ্গী, ক্ষীণকটি, কঠিনস্তনী। নখ ও দস্তুর সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী শিশুকে বুকুে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে প্রস্তুত ফলাকাগ্র বর্ষা পঞ্চাশ হস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিষ্ফেপ করিতে পারিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহারা যখন গুহাদ্বারে বসিয়া পক্ষ লোহিত ফলের কর্ণাভরণ দুলাইয়া মৃদু গুঞ্জনে গান করিত, তখন তাহাদের তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিত।”<sup>২২</sup>

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান, যৌনজীবন, গৃহজীবন, হিংস্রতা, নৃশংসতা, খুন, জখম, লড়াই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নারীহরণ প্রভৃতি সাবলীল ও বিশ্বাস যোগ্যভাবে চিত্রিত হয়েছে ‘রুমাহরণ’ নামক গল্পটির আখ্যানবস্তুতে। নারী হরণের বিষয়ে লেখক এই গল্পটিতে উল্লেখ করেছেন—“এই সব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম, হিংস্র স্বাপদের মতো পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত।”<sup>২৩</sup>

এইভাবে সেকালের জীবনকে তিনি রূপায়িত করেছেন। আবার সেকালের নারীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের ছবিও বাস্তব সম্মতভাবে গড়েছেন—

“আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আমরা জোয়ান ছিলাম প্রায় দুই শত, কিন্তু গ্রহণযোগ্য যুবতী ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। তাই নারী লইয়া যুবকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ... আমাদের দেশে মেয়ে নেই! আমাদের

ছেলেদের সঙ্গিনী নেই! এ জাত মরবে—এ জাত মরবে! হে পাহাড়ের দেবতা, বর্ষার  
শ্রোতের যেমন পোকা ভেসে আসে, তেমনই অসংখ্য মেয়ে পাঠাও। এ জাত মরবে!  
মেয়ে নেই—মেয়ে নেই!...”<sup>১৪</sup>

কথক গাঙ্কা তিভিকি না পেয়ে গোষ্ঠী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর সেই পাহাড়ের  
উপত্যকায় নূতন মানব গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছিল। অন্য গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে তাদের  
বিবাহযোগ্য নারীদের কেড়ে নিয়েছিল। এই টুকুই অতীত। আর তার বহিরাবরণ একালের কথা।  
ভ্রমণ রসিক রেলের চাকুরে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে একটি গানের সুরের সূত্র ধরে অতীতের  
নায়িকাকে আবিষ্কার করে। কিন্তু এ গল্পে বাঙালির ইতিহাস নেই; এমনকি এ কাহিনি ভারতে  
ঘটেছিল কিনা তাও জানা যায় না। কথক নিজে কোনো হৃদিশ দিতে পারেননি। যে উপত্যকার কথা  
গাঙ্কা বলেছে তা ভারতে কিনা তাও সে জানে না। ‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ মগধ অঞ্চলের কাহিনি।  
এর সঙ্গে বাঙালির দূর সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে। একমাত্র চুয়াচন্দন গল্পেই বাঙালির পাঁচশো  
বছর আগেকার অতীতের কথা আছে। হিন্দুর অতীতের কথা আছে ‘কালের মন্দির’, ‘তুঙ্গভদ্রার  
তীরে’ উপন্যাসে। বাঙালির অতীত আছে ‘গৌড়মল্লার’ ও ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসে। ‘চুয়াচন্দন’  
গল্পে পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের ছবি ইতিহাস সম্মত এবং বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবতের’  
অনুসারী। দেশে তান্ত্রিকতার প্রাবল্য কী ভয়ানক হয়ে উঠেছিল তার ইতস্তত ছবি অন্যান্য জায়গায়  
আছে। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পে অনেক জীবন্ত ভাবে আছে। নিমাই পণ্ডিতের চিত্রটি ব্যতিক্রমী কিন্তু  
অস্বাভাবিক নয়। সব দিক তাঁর সবল চরিত্র এবং সক্রিয় মানসতার পরিচয় ছিল। বাঙালির  
বহুবিদ্যাচর্চা, শক্তিমানের মুখোমুখি দাঁড়াবার অক্ষমতা—একালের বাঙালির মতোই মনস্তাপ বিলাস,  
সেকালের বাঙালি চরিত্র আঁকতে লেখক এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করেছেন। তারপর নিমাই  
পণ্ডিত ও চন্দনদাসের বুদ্ধি ও সাহসে চুয়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাঙালির শক্তি ও সাহসের  
এ দৃষ্টান্ত আদর্শ স্বরূপ। বাঙালির বল বীর্য ও পরাক্রমের কথা ‘গৌড়মল্লার’ ও ‘তুমি সন্ধ্যার  
মেঘ’ উপন্যাসে বেশ সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। সে কথা উপন্যাস আলোচনায় বলা হয়েছে।  
মধ্যযুগের ইতিহাসে হিন্দুর বাহুবলের অভাবের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু পরাক্রান্ত আলাউদ্দিন  
খিলজিকে কীভাবে বুদ্ধিবলে ও দুঃসাহসে শিক্ষা দেওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত আছে ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে।  
মোটকথা শরদিন্দুর গল্পে-উপন্যাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভাস্কো-ডা-গামার আগমন পর্যন্ত  
সময়ের ইতিহাস কাহিনিতে রূপলাভ করেছে।

ইতিহাস প্রসঙ্গ ও ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়  
জানিয়েছিলেন—

“কোনান ডয়েল এবং জ্যাক লগুন-এর লেখা পড়ে জাতিস্মর বা অতীত কাল সম্বন্ধে লেখার অনুপ্রেরণা পাই। পড়ে মনে হয়েছিল, দেখি আমিও লিখতে পারি কিনা। All my life I have an awareness of time and places—এই কথাটা আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।”<sup>৬</sup>

গল্প-উপন্যাস লিখতে গেলেই প্রয়োজন হয় সময় বা কাল এবং স্থান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার। বলা যায়, সময় চেতনা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য বিষয়। ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাক সম্বন্ধে বলা হয় তিনি উপন্যাসের স্থান সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ খবর নিয়ে তার খুঁটিনাটি জেনে এমনভাবে লিখতেন যাতে স্থানটিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যেত। সময়ও স্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ। অতীত কাহিনি নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লিখতে গেলে সময় চেতনা বাদ দিলে চলে না। জীবনানন্দকে বলা হয় সময়চেতনার কবি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্থান ও কালকে তাঁর গল্প-উপন্যাসের দিকে লক্ষ রেখে গড়ে নিয়েছেন। ইতিহাস নিয়ে লিখতে গেলে লেখককে অতীতকালের, স্থান ও কালের বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করতে হয়। কারণ অতীত ইতিহাস স্থান ও কালের প্রয়োগেই জীবন্ত হয়। ইতিহাসের স্থান-কালকে প্রথম প্রারবস্ত করে ব্যবহার করেছিলেন। স্যর ওয়াল্টার স্কট। তাঁর আগে যাঁরা ইতিহাস নিয়ে কাহিনি রচনা করেছেন তাদের লেখায় ইতিহাস বাইরের আবরণ মাত্র। বিশেষ যুগের বিশ্বস্ত চিত্র তাতে ধরা পড়েনি। প্রায় সহজাত ক্ষমতা দিয়ে স্কটই ইতিহাসের চরিত্রকে ধরতে পেরেছিলেন। ইংল্যান্ডে অর্থনীতিবিদ জেমস স্টুয়ার্টের লেখা ঔপন্যাসিকদের অনেকটাই ‘Spatio-temporal character of people and circumstances’<sup>৭</sup> সম্বন্ধে সচেতন করে। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকদেরই ধারায় লেখা। তবু তাঁর লেখার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাকে সেকালের সমালোচকেরা অভিনব বলে মনে ছিলেন। বালজাক স্তাঁদালের উপর তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে স্কটের উপন্যাসের ‘broad delineation of manners and circumstances attendant upon events’ -এর প্রশংসা করলেন। বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্র। অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসের বাস্তবতা যেমন তিনি অধিগত করেছিলেন তেমনি-তাঁর ছিল ইতিহাস সম্বন্ধে প্রখর অনুসন্ধিৎসা। লুকাচ লিখেছেন এনলাইটেনমেন্টের যুগের ইতিহাস লেখন ছিল আদর্শগত দিক থেকে ফরাসী বিপ্লবের প্রস্তুতি। ‘The often superb historical construction ... serve to demonstrate the necessity for transforming the unreasonable society.’<sup>৮</sup> বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইচ্ছা ছিল সেরকম। তাঁকে একদিকে যেমন বাংলা উপন্যাসের রূপ নির্মাণ করতে হয়েছে তেমনি ইতিহাসের ভিতরে

টুকে ভারতের পুনর্নির্মাণের কথা বলতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই দায়বদ্ধ লেখক যিনি ঠিক মার্কসীয় অর্থে নয় বরং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজকে পরিবর্তন করবার কথা ভেবেছিলেন। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে তাঁর লক্ষ্য ছিল নূতন আদলটি গড়ে তোলা। কিন্তু ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে তিনি সৌন্দর্য সাধক শিল্পি। ‘বিষবৃক্ষ’ থেকে সমাজ গঠনের ভাবনা তাঁর লেখায় প্রাধান্য পাচ্ছে। আর শেষ দিকের উপন্যাস ত্রয়ীতে তত্ত্বচেতনা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ‘রাজসিংহ’ চতুর্থ সংস্করণে আছে ইতিহাসের নব নির্মাণ—আর তারই আধারে ভারতের সমাজে শক্তির সঞ্চার করা। লেখকের কথায়—

“ছেলেবেলায় ইতিহাসের ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোহ ছিল। ঐতিহাসিক গল্পলেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়—বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।”<sup>১৮</sup>

সুতরাং তাঁর ঐতিহাসিক ছোটগল্প-উপন্যাসসমূহ পাঠে উপরোক্ত কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, তথ্য ও তত্ত্ব। ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটি পাঠেও আমরা তাই-ই বুঝি। কারণ এই গল্পটিতেও দূর অতীত কালের স্পর্শ আছে। গল্পটিতে প্রাগৈতিহাসিক ছোঁয়া থাকলেও গল্পটি আর্য-অনার্য বিরোধ ও বিরোধান্তে প্রেম ও মিলন। আসলে লেখকের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষে মানুষে বিরোধ, দাঙ্গা হানাহানি, উঁচু-নীচু ভেদ ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া নয়, অতীতটাকে জীবন্ত করে তুলে এনেও তার মধ্যে শ্রীতির বীজ বপণ করা। ইতিহাস নাম মাত্র বটে। দক্ষিণ ভারতের আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও অনার্য-আর্যের ঘাত-প্রতিঘাত। শুধু তাই নয়, দূর অতীতে মানুষকে নৈসর্গিক উপাদান সাক্ষী রেখে কাজ করতো তারও প্রমাণ মিলেছে গল্পটি পাঠে। আসলে তখন সময়পঞ্জী নির্ধারণে কোনো লিখিত গ্রন্থ ছিল না। না ছিল কোনো জ্যোতিষশাস্ত্র। শুধু অনুমান শুধু নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা। ভূ-মণ্ডল তথা পৃথিবী কিংবা নভোমণ্ডল ছিল অতীত কালের মানুষের অভিজ্ঞতার প্রাথমিক উৎস। তাই তারা চন্দ্র গ্রহণের বিষয়কে সময় নির্ধারণের মত কাজে ব্যবহার করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

অতীত স্পর্শ থাকলেও গল্পটির মূল আবদেন একটি নারীর চাওয়া পাওয়া ও তার ব্যক্তিত্ব। খাঁটি প্রেমের ও মিলনের গল্প বললেও অত্যাঙ্কি হবে না। ইতিহাস অতীতের মতোই চাপা পড়ে গেছে। তৈরি হয়েছে নূতন ইতিহাস—যা দুই গোষ্ঠীর মানুষের মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, কথা বলার স্বাধীনতা, প্রেম-প্রত্যাখ্যান কিংবা প্রেমিক পুরুষ নির্ধারণ সে যুগে কতটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল বলা কঠিন কিন্তু শরদিন্দু আলোচ্য গল্পে এলা নানী নারীটিকে অতীতের গহুর থেকে ছিনিয়ে এনে অত্যন্ত আধুনিক করে এঁকেছেন। তবে নির্লজ্জ আধুনিকতা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় যা বোঝায়—আধুনিকতা সময়ের উপর নির্ভর করে না, করে মর্জির উপর।<sup>১৯</sup>

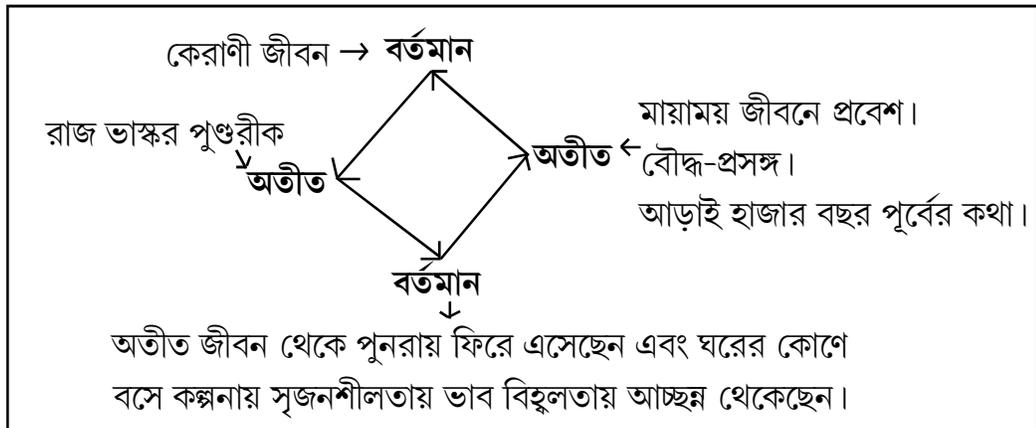
তবে আলোচ্য গল্পটিতে ইতিহাস বলতে শুধু যে বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হ'ল—‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ সম্পর্কে পৌরাণিক তথ্য তত্ত্ব এবং সেই স্থানের সময়ের আখ্যান। শুধু তাই নয়, প্রাক্ অর্থে পূর্ব আর জ্যোতিষ অর্থে গণনাশাস্ত্র অর্থাৎ যখন কোন গণনামূলক শাস্ত্র রচিত হয় নি ঠিক তখনকার সময় চিহ্নকে শরদিন্দু বাঁধতে চেয়েছেন। অন্যদিকে প্রাগ্জ্যোতিষ স্থাননাম বিষয়ে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের ‘কোচবিহারের ইতিহাস’<sup>২০</sup> নামক মূল্যবান গ্রন্থে বিস্তারিত জানা যায়—“রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণে, রঘুবংশ এবং বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে, ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎসংহিতায় ‘উপজ্যোতিষ’ এবং মহাভারতে ‘উত্তরজ্যোতিষ’ দেশেরও নাম আছে।”<sup>২১</sup>

এছাড়াও ঐ গ্রন্থে আরও একাধিক তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌতূহলী মানুষ তা জানেন। এভাবেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের সুদূর বৃহৎ প্রতিবেশ ও প্রেক্ষাপটকে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসের গোড়ার মাত্রাটি ধরতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সুপ্রচুর প্রাচীন ইতিহাস-উপাদান ও গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন এবং ইতিহাসকে নব নব রূপে নির্মাণ করেছেন। তাইতো তিনি ইতিহাসের স্পর্শে সুদূর অতীতের আবছায়া মায়াময় জগতে বসবাসকারী মানুষের জীবনের প্রেম-প্রতিবাদ ও প্রত্যাশার ছবি আঁকতে পেরেছেন। লক্ষণীয় সমাজে একজন মানুষ কোনো না কোনো দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী পারদর্শী। যেমন বলা যায়—সুকবি সুগায়ক নন। তেমনি শরদিন্দু সম্পর্কেও উক্ত কথাটিই প্রযোজ্য। শরদিন্দুর কথায়—‘ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশি তৃপ্তি পেয়েছি।... ছোটগল্পটাই আমার হাতে বেশি আসে।’<sup>২২</sup> যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্প এবং গোয়েন্দা গল্পগুলি তাঁর সুসাহিত্যিক হয়ে ওঠার মূল অবলম্বন। তাঁকে বাংলা তথা ভারতের সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত করে তুলেছে উক্ত উপন্যাস ও গল্পগুলি। এমনকি তিনি ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ১৯৬৭ সালে নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। এছাড়াও মতিলাল পুরস্কার, ‘সদাশিবের তিন কাণ্ডের’ (১৯৬০) জন্য ভারত সরকারের দেওয়া পুরস্কার এবং ১৯৬৭ সালেই আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শরৎ স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। অতএব আমরা লক্ষ করছি যে, তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনি এবং গোয়েন্দামূলক কাহিনিগুলি তাঁকে উঁচু স্তরের সাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়েছে। ইতোপূর্বে

আমরা তাঁর ইতিহাসমূলক আখ্যানগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা ও বিচার করেছি। এই অধ্যায়েও কিছু কিছু ইতিহাসমূলক ছোটগল্পের ঐতিহাসিকতা ও ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কীভাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসমূলক লেখাগুলিতে ইতিহাস ব্যবহার করেছেন। অতীতকেই বা কীভাবে দেখেছেন। ছকের সাহায্যে একটি ইতিহাস মিশ্রিত ছোটগল্প ও উপন্যাস নিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে:

ইতিহাস-প্রসঙ্গ ব্যবহার	আখ্যান নির্মাণ	ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ
‘অমিতাভ’ (ছোটগল্প) খৃ: পূ: পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা বিম্বিসারের বৌদ্ধ ভক্তি, বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ, বৌদ্ধের বাণী প্রচার। অপরাপরপক্ষে অজাত শত্রুর বৌদ্ধ বিদ্বেষ। বৌদ্ধ পাষাণীদের দমন-পীড়ন। লেখকের কথায় — “অমিতাভ” গল্পের মূলে একটু খানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই।” <sup>২০</sup>	গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম, মত ও বাণী নিয়ে আখ্যান সৃজন। অন্যদিকে সেকালের স্থানিক পটভূমিকায় স্থিত মানুষগুলির দাস্তিকতা, দানবতা, মূল্যবোধহীনতা, ষড়যন্ত্র, খুন, রাহাজানি ইত্যাদিতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া। পরিশেষে বৌদ্ধের বাণী ও ধর্মের তাৎপর্যে মানব চরিত্রের রূপান্তর। অর্থাৎ অশুভকে নাশ করে শুভশক্তির, সত্যের ও মানবতার জয়।	অমিতাভ তথা বুদ্ধ ইতিহাসের মহিমময় চরিত্র। খৃ: পূ: পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে মানুষের ধারণা কি ছিল তার পুনঃস্মরণ ও পুনর্নির্মাণের চেষ্টা। বর্তমানের মানুষ বুদ্ধের সময়ে স্থিত ছিল না। এমনকি তাঁর প্রভাব ও অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু আমরা বর্তমানে বসে তাঁর অতীত গৌরব ও মর্যাদা মাতাত্ম্য পুনরায় জানতে পারি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটিতে বিশেষ একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন। জাতিস্মর কৌশলকে আশ্রয় করে অতীতে প্রবেশ করেছেন আবার পরক্ষণে বর্তমানে ফিরে এসেছেন কখনো বা বর্তমানে থেকেও সুদূর অতীতের মায়াময় ধূসর কুহেলিকাময় জীবনে প্রবেশ করে অতীতের নরককাল ও মৃত উপাদানে জীবনীমন্ত্র আরোপ করে সতেজ, সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বলা যায়—



শরদিন্দুর কথায় এই গল্পটিতে জাতিস্মর সম্পর্কে আমরা পরিচয় পাই। অতীত যুগে প্রবেশে তিনি শুধু জাতিস্মর কৌশল নয় আরও অন্য কৌশল বা পথও অবলম্বন করেছেন। যেমন—স্বপ্ন, কোনো সদৃশ বস্তু, কোনো সদৃশ ঘটনা, ছায়াভাস, অবচেতন অনুভূতি, গন্ধ ইত্যাদি। ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে আমরা তাঁর জাতিস্মরতার পরিচয় পাই—

“আমি জাতিস্মর। ছিয়াত্তর টাকার মাহিনার রেলের কেরাণী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার— বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।”<sup>২৪</sup>

এভাবেই তিনি জাতিস্মরমূলক গল্পগুলিতে ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করেছেন যথাযথভাবে। আর তাতেই সত্যিকারের রসসাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শরদিন্দুর পুরাতন পাঠকের কথা যদি ছেড়েও দিই তবুও নোতুন নোতুন পাঠকরা একবার পাঠেই তাঁর লেখাগুলির রসত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবেন। বিশেষ করে ইতিহাসাশ্রিত আখ্যানগুলি পাঠে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিস্মর কৌশল গল্পগুলি ব্যতিরেকেও তাঁর অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলিতেও আমরা অতীত জীবন ও অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় পাই। সেখানেও তিনি সমান দক্ষ। সত্যিকারের উঁচু স্তরের জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্যের রস স্রষ্টা। বলা যায়—কল্পনায় বাস্তবে, প্রেমে-অপ্রেমে, দান বিকতায় মানবিকতায়, তরলে কঠিনে মাখামাখি সাহিত্যিক উপাদান যা পাঠককে চরম প্রশান্তির জগতে পৌঁছে দেয়।

‘আদিম’ গল্পটির আখ্যানেও খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত জাতকগুলির সমসাময়িক ঘটনা। বলা যায়, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার ঘটনা। লেখক এই গল্পটিতে সুদূর প্রাচীন মিশরের সামাজিক সংস্কার তথা রীতি-নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে। অপরাপরপক্ষে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে যা পরপল্লী। বলা যায়, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিচারে ‘ভাই-ভগিনী’র বৈবাহিক সম্পর্ক কঠিনরূপে নিষিদ্ধ কিন্তু মিশরীয় রীতি অনুসারে তা-ই আবার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রযোজ্য। মিশরীয়, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে মানবিক সম্পর্কের সেটাই একমাত্র পথ। কারণ এই সভ্যতায় যুবক-যুবতি সহোদরার বিয়েটা সামাজিক সংস্কার; বংশরক্ষায় বংশপরম্পরায় প্রচলিত ঐতিহ্য। শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন—

“ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে ‘আদিম’ একটু দুর্বল। তার কারণ এ গল্পের কাহিনীতে ইতিহাসের সেই ঠাসবুনোনি গাঁথতে পারে নি। ইতিহাস প্রাচীন মিশরের। যে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক কিছু নেই। প্রাচীন মিশরের রাজ-সংসারে ভাই বোনের

বিয়ে হ'ত প্রধানত রাজবংশের বিশুদ্ধি রাখবার জন্যে। সাধারণ সমাজে ভাই বোনের  
বিয়ে কতটা চলত তা জানি না, তবে কিছু হয়ত চলত। তবে আমাদের কাছে এ ব্যাপার  
অত্যন্ত ঘৃণ্য ঠেকে। শরদিন্দুবাবু গল্পটিতে দেখাতে চেয়েছেন, যে ভালোবাসা জন্মাবধি  
তা রক্তের মধ্যে রয়ে যায়।”<sup>২৫</sup>

শেষ পর্যন্ত গল্পটিতে সহোদরা ভগিনীর প্রতি কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেও শরদিন্দু প্রাচীন ঐ  
মিশরীয় সভ্যতার সংস্কারকে বজায় রেখেছেন। সুদূর মিশরের সভ্যতার সামাজিক সংস্কার তুলে  
এনে ভারতীয় সভ্যতার সংস্কৃতিতে ঘটা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন তিনি। তাই পাঁচ হাজার বছর  
পূর্বেকার মিশরীয় রীতিকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে পুনর্বিবেচনা ও পুনর্নির্মাণ করতে  
চেয়েছেন। তবে ঐতিহাসিকতা থাকলেও পরিশেষে গল্পটি তিন নর নারীর জীবনের টানা পোড়নেই  
শেষ হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, ইতিহাসের প্রসঙ্গ ছুঁয়ে প্রাচীন প্রথাকে ভারতবর্ষের মানুষকে  
জানাতেই তিনি সুদূর প্রাচীন মিশরে প্রবেশ করেছেন। কখনো প্রাচীন মিশরের ইতিহাসকে ভাঙতে  
চেয়েছেন। আবার ভাঙতে ভাঙতে গড়তেও চেয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি একটা সম্ভাব্যসূত্র  
খুঁজতে চেয়েছেন। মিশরে ভারতে প্রাচীন যুগে হয়তো মানুষ এভাবেই বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে  
যেতেন— সেই তথ্যকেই তিনি সত্যরূপে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করেছেন। মিশরীয়  
সংস্কৃতিকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভারত সংস্কৃতির আদলে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এতে গল্পটির  
সাহিত্যিক রস ক্ষুন্ন হয়নি বটে কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রাচ্য সংস্কৃতিতে সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে নি।  
এই গল্পটিতে ইতিহাসকে খণ্ডিত রূপে ব্যবহার করা হলেও কিন্তু ইতিহাস রসের ব্যত্যয় ঘটেনি  
বরং চমৎকার গল্পরস সৃষ্টি হয়েছে। পাঠক হিশেবে আমরাও যেন নোতুন ধরণের গল্পের ভুবনে  
সঞ্চরণ করেছি। পেয়েছি অনাবিল আনন্দের হাতছানি।

“অমিতাভ গল্পটির মূলে একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই।”<sup>২৬</sup>  
পূর্বেই এই গল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ পেয়েছি। তবুও বলা যায় যে, হিন্দু-  
বৌদ্ধযুগের পারস্পরিক সংঘাত ও সমন্বয় চিত্র এতে ধরা পড়েছে। হিন্দু- বৌদ্ধ পরস্পর বৈরীতা,  
ঈর্ষা, অসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় মতাদর্শগত মমাস্তর ও মতাস্তরের বিপ্রতীপতার চরমরূপ প্রকাশ  
পেয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় সেই অতীত যুগের চলচিত্রকে বিংশ শতকের পটভূমিকায়  
স্থাপন করে হিন্দু- বৌদ্ধের পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্র তুলে ধরেছেন। ইতিহাস নামমাত্র কিন্তু পটভূমি  
বৃহৎ। কাজেই বলা যায় গল্পটি উচ্চ আসন লাভ করেছে বাংলা গল্পবিশ্বে।

শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্প সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমালোচক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মন্তব্য  
প্রণিধানযোগ্য—“আমি গল্প প্রায় পড়ি না। বড় গল্প একেবারেই না। অবসর পাই না; আর

পড়িতে ভালও লাগে না। কিন্তু কৌতূহলবশে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কয়েকখানি গল্পের বই পড়িয়াছি।”

জাতিস্মরণ নামক পুস্তকে তিনটি গল্প আছে। তিনি “ ‘অমিতাভ’ ও ‘মৃৎপ্রদীপ’ নামকগল্প বৌদ্ধকালের ছিন্নপত্র সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, রচনা-চাতুর্য ও ভাষার মাধুর্য ও ঔদার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। দেশ ও কাল নির্দেশ করিয়া গল্প লিখিতে হইলে নানা বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। নচেৎ, অনৌচিত্য ও অসঙ্গতি দোষ আসিয়া পড়ে। তিনি যথাসাধ্য পুরাতন কাল রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তদ্বারা কাহিনীর অঙ্গহানি হয় না।”<sup>২৭</sup> ইতিহাস বলতে খালি রাজা, রাজ্যপাঠ, রাজবাড়ি, সৈন্য সামন্ত মন্ত্রি, পারিষদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি, রাজস্বনীতি, দমন-পীড়ন শাসক বর্গের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের<sup>২৮</sup> মনেই এই প্রশ্নের সঞ্চারণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আরও জিজ্ঞাস্য যে, ভারতবাসী কোথায়? শাসকবর্গ ও সাম্রাজ্যের অধিপতির। কি বাহির্ভারত থেকে আগত? ভারতের কি ইতিহাস নেই? বাংলার কি ইতিহাস নেই? কেবল যারা কাটাকাটি খুনোখুনি করেছিল তাদেরই কি অস্তিত্ব রয়েছে? —এসব নানা প্রশ্ন তাঁর মনে জেগে ছিল। ভারতের ইতিহাস তথা বাংলার ইতিহাস তিনি যেমন অনুসন্ধান করেছেন ঠিক একইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করেছেন। ইতিহাসানুসন্ধান বড় মাপের কাজ। এ কাজে কতিপয় দায়িত্বপূর্ণ লোক অগ্রসর হয়েছেন। অস্তিত্বের সন্ধান ও দেশানুরাগের বশেই তাঁরা অতীত ঐতিহ্যকে মাটি খুঁড়ে পুথি পড়ে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাস বিনা যুক্তিতে মেনে নেননি। বিশেষ করে আঞ্চলিক ইতিহাসগুলি বিদেশীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে চাপা পড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ইতিহাসবিদদের আবহেলাও এর অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের মস্তব্য স্মরণযোগ্য—

“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদিবা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে। পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ... ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে। ... সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না।”<sup>২৯</sup>

—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস সম্পর্কে ধারণাও অনেকটা তাই। কারণ

তিনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না বটে কিন্তু ইতিহাসের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি জানতেন ইতিহাসানুসন্ধান ও চর্চার মধ্যেই প্রকৃত দেশপ্রেম, জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্যকে জানা যায়। এমনকি নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, রাজস্ব-অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে শরদিন্দু বঙ্কিমের মতো, “যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।”<sup>১০</sup> তা মনে করেন না। তিনি লিখেছেন—“আমাদের ইতিহাস আছে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আছে, কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাসের পরিবর্তে আমরা কিছু পৌরাণিক রূপকথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের ইতিহাস থাকিয়াও নাই।”<sup>১১</sup> শরদিন্দু এই চিন্তা থেকেই হয়তো ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হয়েছেন। ভারত তথা বাংলার মানুষকে ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদানও অন্যতম কারণ। তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে চৈতন্য আমল পর্যন্ত ইতিহাসের ফ্রেমে গল্প উপন্যাস গেঁথে বাঙালি তথা ভারতবাসীকে ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন। হয়তো সাহিত্য থেকে ইতিহাস পাঠক পুরোপুরি ইতিহাস পাবেন না ঠিকই তবে একটা স্পষ্ট ধারণা পাবেন। ইতিহাসের অনুসন্ধানে পাঠককে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে তুলবে। ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তদুপরি ইতিহাস পাঠে আমাদের লাভ কি? তারও একটা ধারণা তাঁর কথায় জানতে পারি—

“কিন্তু ইতিহাস বলিতে পূর্বপুরুষদের গৌরব কাহিনীও বুঝায়। আমার যদি জানা থাকে যে আমার পূর্বপুরুষ বীর ছিলেন, অসি হস্তে সিপাহী যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমি ভীষণ চিত্ত কার্য করিতে লজ্জা পাইব। জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। ভারতবর্ষে বর্তমানে রাজপুত মারাঠা ও শিখরা যোদ্ধ জাতি বলিয়া পরিচিত। তাহাদের সকলেরই বীরত্বের গৌরবময় ইতিহাস আছে, tradition আছে।”<sup>১২</sup>

অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ইতিহাস আমাদের অতীত গৌরব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করে তোলে এবং বংশ গরিমা সম্পর্কে একটা মানসিক ধারণা গঠন করে। যাইহোক, তিনি আমাদের আরো বলেছেন “বাঙালীরও ইতিহাস আছে কিন্তু তাহা প্রাক্ মুসলমান যুগের ইতিহাস। সেই ইতিহাস বাঙালীকে শুনাইতে পারিলে বাঙালীর আত্মচৈতন্য জন্মিতে পারে।” (২১-০২-১৯৫১)<sup>১৩</sup> এই তাগিদ থেকেই তিনি ইতিহাস অনুশীলনের মাধ্যমে বাঙালীর আত্মচৈতন্যকে জাগাতে চেয়েছেন।

‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘রেবা-রোধসি’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘চুয়া চন্দন’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘তক্ত-মোবারক’ ও ‘চন্দন-মূর্তি’ প্রভৃতি ইতিহাসমূলক গল্পগুলির আখ্যানে ভারত তথা বাংলার প্রাগৈতিহাসিক যুগ, প্রাক্-মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধযুগ ও

মুসলমান শাসনের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। ইতিহাসমূলক ছোটগল্পগুলির আলোচনা মূলত আমরা ‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। গল্পগুলির আখ্যানে ইতিহাস প্রসঙ্গ ও ইতিহাসের ব্যবহার-পুনর্গঠন সম্পর্কেও বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির মতোই উপন্যাসগুলিতেও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে ‘কালের মন্দিরা’, ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’ ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসগুলিতে ভারতবর্ষে আক্রমণকারী বিভিন্ন বৈদেশিক শাসক হুণ, শক, মোগল-পাঠানের পাশাপাশি বাংলার পাল রাজতন্ত্র তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল যথা, বিহার, মগধ, পাটালিপুত্র, বিজয় নগর, বাংলাদেশ, উজ্জয়িনী, বিদর্ভ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ের রাজতন্ত্র তথা শাসকবর্গের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং দমন-পীড়ন নীতি সর্বোপরি ধর্মনীতি বিস্তৃতভাবে উঠে এসেছে। এমনকি ধর্ম সংঘাত ও ধর্মান্তর, নারী হরণ, গুপ্তচর বৃত্তির মতো বিষয়গুলিও উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হয়েছে। ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। কীভাবে এই উপন্যাসটিতে গুপ্তযুগ ও হুণদের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি বিষয়টি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসকে পুনঃরূপ দান করা হয়েছে। রেখাচিত্রের সাহায্যে আমরা তা দেখাতে পারি—

ইতিহাস-প্রসঙ্গ ব্যবহার	আখ্যান নির্মাণ	ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ
স্কন্দগুপ্তের চরিত্র। স্কন্দের দমনপীড়ন নীতি। স্কন্দের রাজশাসন পদ্ধতি পুষ্যমিত্রীয় ও হুণগণকে পরাজিত প্রসঙ্গ ৪৬৫ হুণদের পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন।	ভারতীয়দের সঙ্গে হুণদের সংঘাত ও সমন্বয় নিয়ে আখ্যান নির্মাণ। অতীত কাহিনিকে বর্তমানে স্থাপন করা। ভারতীয়দের প্রকৃতি ও হুণদের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নির্দেশ।	গুপ্তযুগের ইতিহাসকে আখ্যানের ফ্রেমে গেঁথে সে যুগের সামগ্রিক চালচিত্রকে পুনরায় নির্মাণ করা। যেমন — স্কন্দগুপ্তের চরিত্র।

‘কালের মন্দিরা’ (১৯৫০) উপন্যাসটি উপন্যাস সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাস শিসেবে পরিচিত কিন্তু নির্দিধায় আমরা তা মান্যতা নাও-ও দিতে পারি। কারণ এক একজন সমালোচকের কাছে তা এক এক অর্থে দ্যোতিত হতেই পারে। সময়ের প্রেক্ষিতেও এই

কথাটি প্রযোজ্য। শরদিন্দু নিজেও উপন্যাসটি ভূমিকায় লিখেছেন—‘আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল ঋন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক।’ সুতরাং এখানে একজন সমালোচকের স্বাধীন অভিমত দেওয়ার অবকাশ থেকে যায়। আখ্যানবৃত্ত কল্পিত, ঋন্দগুপ্ত ব্যতিরেকে সকল চরিত্র কল্পনা প্রসূত। সুতরাং ঔপন্যাসিকের কথাতেও কিন্তু অনৈতিহাসিক ইঙ্গিত মেলে। যাইহোক, উপন্যাসটির সামগ্রিক পর্যালোচনা করে আমরা প্রকৃত ইতিহাস পুনঃ রূপানুসন্ধানের চেষ্টা করব।

একটুখানি ঐতিহাসিক উপাদান, একজন ঐতিহাসিক চরিত্র ও তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনায় শরদিন্দু নিপুণভাবে কাহিনিকে টেনে নিয়ে যান অতীতের জাদুঘরে। যা একান্তভাবেই অতীত জীবনাশ্রয়ী ইতিহাস হয়ে ওঠে। তবে ইতিহাস রচনা ইতিহাসবিদের কাজ লেখকের নয়। শরদিন্দু কিন্তু লেখক সত্তারই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাইতো অবিকলভাবে অতীত ইতিহাসকে বর্ণনা করেননি বরং ইতিহাসকে ছুঁয়ে এক অভিনব কল্পলোক তথা সৌন্দর্য লোকের অসাধারণ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসখানি পাঠে আমরা তারই পরিচয় পাই। উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—

“মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের মৃত্যুরপর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঋন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঋন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্যমিত্রীয় ও হুণগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যুবরাজ ভট্টারক ঋন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মী স্থির করিবার জন্য রাত্রি ত্রয় ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া হুণগণ উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হন নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হুণগণ একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।... ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পর হুণগণ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বারবার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে।”<sup>৪৪</sup>

উপন্যাসটির আখ্যান বস্তু দীর্ঘ দশ বছর পড়ে থাকার পর পুনরায় লেখা শুরু করে আরম্ভের ঠিক বারো বছর পর লেখা শেষ করেন। প্রসঙ্গত ১৯৩৮ সালে কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখে সুদূর বোম্বাই চলে যান। দীর্ঘদিনের ব্যবধান। লেখকের মনে নূতন ভাবনার নতুন নতুন কাহিনি সূত্রের উন্মোচন ও পরিবর্তন হওয়াটাই স্বাভাবিক। লেখক উপন্যাসের ভূমিকায় জানিয়েছেন—“বারো বৎসরের ব্যবধানে মানুষের মন এক প্রকার থাকে না; চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গি রসবোধ সবই বদলাইয়া যাইতে পারে, সৃষ্টি শক্তিরও তারতম্য ঘটা সম্ভব।”<sup>৪৫</sup> কিন্তু দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট এই উপন্যাসে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকলেও নিবিড় পাঠে আমাদের মনে কোথাও অসংলগ্ন ভাব ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা শক্তির ছায়া পড়ে নি-কি কাহিনি গ্রন্থনায়, কি চরিত্র সৃষ্টিতে, কি ঔপন্যাসিকের মনের অনন্যপরতায়। লেখকের কথাই এখানে সমীচীন বলে মনে হয়—“গল্পের যে স্থানটিতে বারো বছরের ফাঁক

পড়িয়াছে পাঠক-পাঠিকা হয়তো সহজেই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। যদি না পারেন, বুঝিব আমার অন্তর্লোকে মহাকালের মন্দিরা এখনও একই ছন্দে বাজিতেছে, তাহার তাল কাটে নাই।”<sup>৩৬</sup> বাস্তবিকই একথার যথার্থতাই প্রমাণিত। তবে যে পরিচ্ছেদে কাহিনি পুনরায় আরম্ভ হয়েছে তার সূত্রোদ্ধার করতে পেরেছি কিন্তু বিচ্ছিন্ন চিন্তার বা এলোমেলো চিন্তার সূত্র পাইনি। কাহিনির গতি স্রোত কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কাহিনি এখানে তর তর করে এগিয়ে গেছে সমাপ্তির সরিৎসাগরে। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি এর ভার দেওয়া হল, যদি বইখানি পাঠে আপনাদের চোখে অসংলগ্ন ভাব ও অসঙ্গত কাহিনি ধরা পড়ে তা লিখবেন তাহলে আমার উত্তরকালের গবেষক ও গবেষিকাদের গবেষণার কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠবে। ‘কালের মন্দিরা’ বইটির ‘বন্দিনী’ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দীর্ঘ দশ বছর পড়ে থাকার পর পুনরায় কাহিনি সূত্রের আরম্ভের পরিচয় নিবিড়পাঠের মধ্যে দিয়ে উদ্ধার করেছি। তা উল্লেখের দাবি রাখে—“মুদিত চক্ষুে চিত্রক নিজ জীবন-কথা চিন্তা করিতেছিল; চিন্তার সূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যাইতে ছিল, আবার যুক্ত হইয়া আপন পথে চলিতেছিল।”<sup>৩৭</sup> সত্যিই তিনি চিন্তার ছিন্নসূত্রকে পুনরায় সংগত সেতুবন্ধন করেছেন অবলীলায়।

আখ্যান বৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনায় শরদিন্দুর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা যাক। কি কায়দার বা কৌশলে তিনি অতীত ইতিহাসের ক্ষুদ্র কথাপ্রসঙ্গ তথা চরিত্র প্রসঙ্গ উপন্যাসের অন্তর্ভবন করে এনেছেন তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসটি মূলত পরিশিষ্ট অংশসহ মোট উনিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। উপসংহার অংশটিকেও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেও পরিশিষ্ট অংশে পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সুকৌশলে তিনি উপন্যাসের মর্মবস্তু ও মর্মবার্তা উদ্ঘাটন ও সঞ্চারণ করেছিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদ ‘মোঙের বিলাপ’ কাহিনির সূত্রপাত ও সঞ্চারণ। এই অংশটি সমগ্র কাহিনির পূর্বানুমান। বৃদ্ধ মোঙের গল্পের এক একটি সূত্র উপন্যাসটিকে বিস্তার দান করেছে। পরিসরকে নিয়ে গেছে পরিশিষ্টের দোড়গোড়ায়। দ্বন্দ্ব সংঘাত, ষড়যন্ত্র, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব মথিত প্রেম-প্রণয়, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত অভীক্ষা, স্বার্থসিদ্ধি ইত্যাদি মানবীয় দোষ ও গুণের সমাহারে রচিত এই উপন্যাসটি। বিশেষত দুই গোষ্ঠীর লড়াই, যুযুধান দুই গোষ্ঠীর জিগীষা, জিজীবিষা এবং মৈত্রীভাব সমন্বয় সাধনই এই উপন্যাসটির লক্ষণীয় বিষয়। হুণ শাসকের বাহুবলে লোকবলে সাম্রাজ্য লাভ, নারীহরণ ও নারী লাভ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। নৈসর্গিক বর্ণনার চিত্রও অত্যন্ত মনোহরণকারী। হাস্যোদ্দীপক চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টিতেও লেখকের অনন্য ও সরস মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত স্কন্দগুপ্তের আমলের পোষক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও খাদ্যাভ্যাসের সুনিপুণ পরিচয় উপন্যাসটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে। রাজা-বাদশার পোষাক, অলঙ্কার অক্ষয়শস্ত্র অতীতকালের স্মৃতিপটে আমাদের টেনে নিয়ে যায়।

প্রাচীন স্থাননাম, রীতিনীতি ও বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহারে দূরকালের জীবন-যাপন পদ্ধতির প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

গল্প শোনানোর কৌশলে কথক ও শ্রোতার পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর আলাপ-আলাপন বৈঠকী মনোভঙ্গির রূপ নিয়েছে। বৃদ্ধমোঙ গল্প কথক এবং একমাত্র শ্রোতৃ যুবতী সুগোপা উভয়ের কথোপকথনে উপন্যাসের সূত্রপাত। অসম মনস্ক ও অসমবয়স্ক দু'জন নর-নারীর গল্প বলা ও শোনার মধ্যে দিয়ে লেখক প্রাচীন ও নবীন কালের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণত বৃদ্ধ মানুষেরা সময়ে অসময়ে অবসর পেলেই গল্প বলে নিজের অতীত জীবন তথা অতীত অভিজ্ঞতার কথা বলে থাকেন। গল্পের শ্রোতা মূলত হয় অপেক্ষাকৃত বালক-বালিকা বা যুবক-যুবতী। রহস্যময় তথা অতীতের রাজা-বাদশার, যুদ্ধ-বিগ্রহের, জয় পরাজয়ে, প্রেম প্রণয়মূলক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ষড়যন্ত্র, অসহায় মৃত্যু ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গের তাবতারণা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আদ্যন্ত আকর্ষণ করে রাখে। এক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে। বৃদ্ধ মোঙ গল্প বলার সঙ্গীনি যুবতী সুগোপাকে পেয়ে মনের ঔদার্যে গল্প বলা শুরু করে নিজের অতীত জীবনপটে ফিরে গেছেন আবার নিমেষে বাস্তব জীবনে ফিরে এসে হাহাকার করেছেন। বৃদ্ধ মোঙ জাতিতে হুণ। স্বজাতির হীনবীর্য ও হত গৌরব নিয়ে শঙ্কা ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। এমনকি স্বীয়-জাতিকে 'ভেড়া' বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। পঁচিশ বছর পূর্বে এই হুণ দল বলশালী সাহসী বীর্যশালী, যুদ্ধ-বিগ্রহে নৈপুণ্যতা দেখিয়ে কত রাজ্য জয় করেছিল, হিংস্র ব্র্যাসের ন্যায় হুঙ্কার দিয়ে বিরোধী সৈন্যে শিবিরে কম্পন জাগাতেন। স্কন্দচ্যুত মস্তক তরবারির মাথায় নিয়ে লোফালুফি করতেন। অসংখ্য নারী শিশু ও অনীকিনীর নৃশংস হত্যা তাদের উপজীব্য ছিল। মানুষ খুন ও পরস্ব হরণ ছিল তাদের নেশা। অতর্কিতে কোনো রাজ্যে আক্রমণ ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিপতিকে সিংহাসন চ্যুত ও হনন করে সিংহাসন দখল তাদের রক্তে। শোণিতে শোণিতে ভেসে গেছে কত মানুষ কত সাম্রাজ্য। লুঠ হয়ে গেছে বিলকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কত জাতি। সেই ধ্বংসাবশের ওপর নির্মিত প্রাসাদ শীর্ষে হুণ সাম্রাজ্যের বিজয় কেতন লেলিহান শিখার মতন উড়েছে। কতশত বন্দী-বন্দি পদসেবা করেছে তার ইয়াত্তা নেই। দুর্ধর্ষ এই যোদ্ধা জাতির পরাক্রম, পররাষ্ট্র আক্রমণ সমকালীন কত বড় বড় সাম্রাজ্যকে ধুলিস্যাৎ করেছে তার হিশেব দেওয়াই ভার। মোঙের কথায়—

“সেদিন দুই মুঠি ভরিয়া সোনা লুঠ করিয়াছিলাম। প্রাসাদের নিম্নে অন্ধকূপ কক্ষে সোনার দীনার স্তূপীকৃত ছিল—আটজন রক্ষী সেই গর্ভগৃহ পাহারা দিতে ছিল ... আমরা ত্রিশজন হুণ গিয়া রক্ষীদের কাটিয়া ফেলিলাম।... চারিদিক হইতে নারী কণ্ঠের চিৎকার, ক্রন্দন, আর্তনাদ উঠিতেছিল। ... ছয় সাতজন হুণ যোদ্ধা একটা ক্ষুদ্র বালকের দেহ লইয়া মুক্ত কপাণের উপর লোফালুফি করিতেছে।”<sup>৩৮</sup>

কত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হিংস্র ছিল এই হুণের দল তা কিন্তু উপরোক্ত পংক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট অনুমেয়। এই হুণ বাহিনীর উগ্রতা, জিঘাংসা, কুটিল ষড়যন্ত্র এবং সহজ মৃত্যু দণ্ডনীতি সুগোপাকে চমকে দেওয়ার পাশাপাশি পাঠকদেরও শিরায় শিরায় জ্বালা ধরায়। আর আজ মহাকালের যাত্রাপথে পরদেশাগত বিবদমান হুণ জাতি ভীরু, ধর্মপ্রিয়, অলস, বীর্য শীঘ্রহীন ভেড়ায় পরিণত হতে দেখে মোঙ বিলাপ করেছেন—‘ মেঘ! গড্ডলিকা! হুণ জাতি আর নাই, ভেড়া বণিয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহারা সিংহ ছিল, তাহারা আজ ভেড়া। কাহাকে দোষ দিব? আমাদের যিনি রাজা, যিনি একদিন স্বহস্তে এদেশের বীর্যহীন অধিপতির মাথা কাটিয়া শূল শীর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বরাহ পর্যন্ত আহার করেন না। ধর্ম! তরবারি যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈতন্য নির্মাণ করিয়া কোন এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে।\*\*\* দ্বাদশ সহস্র শোণিত লোলুপ মরু-সিংহ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া—সব ভেড়া।’

মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মগধেশ্বর স্কন্দের রাজ্যাক্ষে আসমুদ্র ভারত সুশাসিত। সুখে শান্তিতে দিন গুজরান নিত্যকালীন ব্যাপার। প্রথম কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র এই স্কন্দগুপ্ত। যৌব রাজ্যে পুষ্যমিত্রীয় ও হুণগণকে পরাজিত করে পিতৃরাজ্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি নাকি পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মীকে স্থির করেছিলেন তিন রাত ভূমি শয্যায় কাটিয়েছিলেন। হুণ জাতিকে পরাজিত করায়। তাঁর শৌর্য বীর্যের প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়। সুনিপুণ কৌশলী পন্থা আবিষ্কার, দূরদর্শিতা, রাজ্যশাসন প্রণালী প্রজাশাসন, মহা পরাক্রম রণনীতি ইত্যাদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে গুপ্ত আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রধান রাজাধিরাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু হুণগণ নাছোরবান্দা পরাক্রম জাতি। পরাক্রমজীবী এই জাতি পুনরায় উত্তরাপথ আক্রমণ থেকে বিরত হয়নি। প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করে। জানা যায় ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পর হুণরা পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে এবং বারবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণে তৎপর হয়। ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গালার ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ঔপন্যাসিক শরদিন্দু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাসে রমণীয় করে পরিবেশন করেন। বোঝা যায়, দুই জাতির ক্ষমতা দখল ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এই কথাবস্তুর শীর্ষে স্থান পেয়েছে। একদিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে সর্বস্ব দিয়ে রক্ষার লড়াই অন্যদিকে বহিরাগত শক্তি হুণদের কর্তৃত্ব ও রাজ্যাধিকারের লোভ গুপ্ত সাম্রাজ্যকে অস্থির ও উত্তপ্ত করে তোলে। এই দুই বিজাতীয় শক্তির ঘোর লড়াই, যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি অস্থিরতা, অরাজকতা, দুর্বিসহ উগ্রতা বিজাতীয় দুই তরুণ-তরুণীর প্রণয়-পরিণয়

সমস্বয়ের হাতছানি দেয়। এমনকি মহাকালের দুর্লভা নিয়মে বহিরাগত বিবদমান জাতি এদেশের সুশীতল জলবায়ু মুক্তিকা গুণে আধ্যাত্মিকতায় শান্ত ও ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কাহিনির একমুখি প্রবণতা অসাধারণ গতিতে এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথাবৃত্তে প্রবেশ করেও ফিরে গেছে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী কপোতকূট অনতিদূরে গাছপালা দিয়ে ঘেরা ক্ষুদ্র জলসত্রের বৃক্ষমূলে এই উপন্যাসের কথারম্ভ। এই প্রসঙ্গের কথা আমরা পূর্বেই মোঙের পরিচয়ে উল্লেখ করেছি। মোঙ সুগোপার গল্পালাপে তৃষণর্ত এক ভাগাশ্বেষী যুবকের প্রবেশ। চক্ষু ও নাসিকা অতিশয় তীক্ষ্ণ। সতর্ক দুঃসাহসিকতা, বাহুবল ও কূটবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করে এই বিদেশী আগন্তুক। ক্রমে সুগোপার সন্দেহ বাড়ে। কিন্তু মোঙ স্বভাবসিদ্ধ ভাবে ঐ যুবককেও তার অতীত জীবনের কথা বলতে চায়। অতঃপর মোঙ তার নাম জানতে পারে। চিত্রক নামধারী ঐ যুবক অনেকটা চিতা বাঘের মতন। ঠিক এমন সময় পুরুষ বেশধারী অশ্বারোহী ছদ্মবেশী রাজকুমারী রট্টা যশোধরা এসে উপস্থিত হন। অশ্বারোহীকে দেখে যুবক কিছুটা বিস্মিত। সুগোপার সঙ্গে ছদ্মবেশী অশ্বারোহী ভেতরে গেলে চিত্রকের মনে কত কথাই না ভিড় জন্মায়। শেষ পর্যন্ত সে রক্ষাকারী অশ্বটিকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে শম্পাকীর্ণ জমির ওপর দিয়ে নৈঃশব্দিক পদচারণায় ইতস্তত যারপরনায় ঘোড়াটি নিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় পথে বন মধ্যে মগধের দূত শশিশেখরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শশিশেখরের ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় সে চিত্রককে তার ঘোড়া বেচতে বলে। অতিশয় ধূর্ত চিত্রক দূতের বিপদ বুঝে ঘোড়ার অধিক দাম চায়। দু'জনের মধ্যে পাশাখেলায় ছল চাতুরীর অভিযোগ এনে শশিশেখর চিত্রকের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি চিত্রক শশিশেখরকে বিবস্ত্র করে নির্জন অরণ্যে ছেড়ে পালায়। পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত অকৃতদার হয়ে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এই দিকে হুণ বিতাড়িত হলেও বন্যার জলে সৃষ্ট জলাশয়ে আবদ্ধ জলের মতো কিছু রয়ে গেল। আবার সাম্রাজ্যের অন্য প্রান্তে অশান্তির কথা শুনে হুণদের কথাই তাঁর মনে পড়ে যায়। অবশেষে থেকে যাওয়া হুণ বিটঙ্ক নাম রাজ্য অধিকার করে সেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ধারা দেবীকে বিয়ে করে নূতন রাজবংশের জন্ম দেয়। ধারা দেবীর প্রশান্ত মূর্তি ও শান্ত ভাব-মাধুর্যে হুণ রাজ ধর্মাদিত্যরোট্ট কোমল ও প্রেমশীল হয়ে পড়েন। ফলত যুদ্ধ নয়, ধর্ম ও শান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। প্রচ্ছন্ন থেকে গেল তার স্বীয় হুণ জাতির বীরত্ব ও প্রচণ্ড উগ্রতা। হুণদের আক্রমণে যে বৌদ্ধ স্তূপ নিঃশেষ হয়ে ছিল তার আমলে পুনঃরায় সেই চৈত্য পুনঃস্থাপিত হয়। প্রকারান্তরে রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে কুমারী রট্টাযশোধরা তার অশ্ব চুরির কথা বলে। সারা রাজ্য জুড়ে তা রটে যায়। অশ্ব চোরকে দেখা মাত্র

আটকে রাখার নির্দেশ বলবৎ হয়। পরিশেষে, হুণের রক্তে মিশে গেছে ভারতীয় রক্ত। মৈত্রীতে, বৈবাহিক সম্পর্কে, ধর্ম সমন্বয়ে পরস্পর বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মানুষের মিলন ও সমন্বয়ের বিষয়টি উঠে এসেছে এই ‘কালের মন্দির’ নামক উপন্যাসটির আখ্যান-কথনে। ভারতবর্ষের গুপ্ত আমলের ইতিহাস, ইতিহাসের চরিত্র ও উপাদান ব্যবহার করার ফলে গুপ্ত আমলের ইতিহাস ও স্কন্দের চরিত্র নবরূপ মনে হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, লেখক ইতিহাসকে ভেঙে পুনর্নির্মাণ করেছেন। আমরা পাঠক হিসেবে নূতন ভাবে গুপ্ত আমলের সামগ্রিক চালচিত্র জানতে পারি। পারি ইতিহাসের স্কন্দগুপ্ত আর শরদিন্দু সৃষ্ট স্কন্দগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস। শুধু তাই নয়, সেকালের সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব, আনন্দ, সংস্কার, রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থারও নিখুঁত পরিচয় পাই। এক নিমেষে হুণ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে পারি। হুণদের দৈহিক গঠন, মানসিক প্রকৃতি, হিংস্রতা, উন্মত্ততা ও প্রচণ্ডতা সম্পর্কে যেমন জানতে পারি ঠিক তেমনই পরবর্তীকালে তাদের হীনবীর্য ও অপৌরুষেয় রূপ সম্পর্কেও স্পষ্ট ভাবে অবগত হই। ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করলেও ঔপন্যাসিক এখানে মূলত শুধুই ইতিহাস বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি, ইতিহাসের উপাদানের সমন্বয়ে এক অনৈতিহাসিক আখ্যান বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। ফলস্বরূপ আমরা স্কন্দগুপ্তের অন্তঃস্থলের কথা জানতে পাই। কঠোর, দৃঢ় মনোবল সম্বলিত লৌহ মানুষটিও এক্ষেত্রে মোমের মতো গলে যায়। কঠোরতা কাটিয়ে মধুরতার স্তরে পৌঁছে যায় একজন মানুষের মন। তাই স্কন্দগুপ্ত দৃঢ় কঠোর লৌহ মানুষটিও এক নিমেষে রট্টা যশোধরার প্রেমে মশগুল হন এবং আশাহীন জীবনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেন। এটা ইতিহাসে জানা যাবে না—যাবে আখ্যান নির্মাণে। তাই ইতিহাস আর কাহিনি মিলে মিশে এক নোতুন রস সৃষ্টি হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক এই কাজটিই করেছেন আলোচ্য উপন্যাসটিতে। ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেও কাহিনিকে অপূর্ব রমণীয় করে তুলেছেন—যা বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সাহিত্যের জগতে অবিদ্বন্দ্বীয়। অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও তিনি একই রকমভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস ও অতীত ঐতিহ্যকে নিয়ে আখ্যান নির্মাণ করেছেন। অতীত যুগকে নোতুনরূপে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। মায়াময় ধূসর প্রহেলিকাময় অতীতময়তাকে সময়ের স্মারকরূপে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুনর্গঠন করেছেন। দূরের দৃশ্যকে চকিতে নিকটে আঁকার দক্ষ শিল্পী তিনি। তাইতো, ‘কালের মন্দির’র মতো ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’ ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতেও একই রকমভাবে ঐতিহাসিক উপাদানের ইত্যাদি ব্যবহার ও পুনর্গঠনের ছবি ধরা পড়ে। তবে সূক্ষ্ম বিচারে কোনো কোনো উপন্যাসে ইতিহাসের একটুখানি স্পর্শে সেকালীন সমাজজীবনের ছবিকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন

লেখক। ‘গৌড়মল্লার’ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাকি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতেও ইতিহাস বর্ণনা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য নয়, বরং সেকালের সমাজজীবনকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। মনে হয় যেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও অতীত ঐতিহ্যকে তিনি পুনরায় ভারতবাসীকে স্মরণ করাতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব ও মর্যাদাকে। এমনকি পাঠকের নজরে আনতে চেয়েছেন ভারতের প্রাক্ মুসলমান যুগের গৌরবময় মহিমময় ইতিহাসকে। যাঁরা বলেন ভারতের তথা বাংলার ইতিহাস নেই তাঁদের কথার জবাবও এই উপন্যাসগুলি। ‘শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছি। তবুও সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বিষয়টির গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও একজন লেখক কীভাবে কী কৌশলে এই বিষয়টি উপন্যাসে, ছোটগল্পে ব্যবহার করেন তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিচার এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। পরিশেষে, শরদিন্দু সম্পর্কে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মত উল্লেখ করে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব—

“বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাস আমার অন্যতম প্রিয় বস্তু। তুমি যখন সেই ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গল্প উপন্যাস লেখ, অতীতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি কর, সেকালের সম্রাট, সেনাপতি সামন্ত, সেই নাম ধাম, সেকালের উপযোগী কথোপকথন— সে এক অভিনব কল্পলোক। আমি সব চোখের সম্মুখে দেখি—একেবারে সেকালে গিয়া উপস্থিত হই। দুর্গেশনন্দিনীতে, রাজসিংহেও ইতিহাসের ছায়া আছে। কিন্তু কালের মন্দিরা ও গৌড় মল্লারের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কত।”<sup>৩৯</sup>

### নির্দেশিকা :

১. মার্ক ব্লক, ইতিহাস লেখকের কাজ, ভাষান্তর—আশিস কুমার দাস, সম্পাদনা—প্রভাত দাশগুপ্ত, পৃ. ১৫
২. ই. এইচ. কার, কাকে বলে ইতিহাস? অনুবাদ—স্নেহোৎপল দত্ত, সৌমিত্র পালিত, সম্পাদনা—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ২১
৩. ই. এইচ. কার, কাকে বলে ইতিহাস? অনুবাদ—স্নেহোৎপল দত্ত, সৌমিত্র পালিত, সম্পাদনা—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ২০
৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, পৃ. ৪৪৬
৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১০

৬. তদেব, পৃ. ২৪৫
৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্প পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৫
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০
৯. তদেব, পৃ. ৫০
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৬১৬
১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, পৃ. ৩৭৯
১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৮৯
১৩. তদেব
১৪. তদেব, পৃ. ৯৩
১৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্যোমকেশ, জীবন কথা, পৃ. ৬৩৭
১৬. Georg Lukacs, The Historical Novel, Penguin Books, 1962, p. 19
১৭. *Ibid*, p. 17
১৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্যোমকেশ, জীবন কথা, পৃ. ৬৩৭
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, আধুনিক কাব্য, পৃ. ১০৩
২০. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১
২১. তদেব
২২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্যোমকেশ, পৃ. ৬৩৭
২৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৪
২৪. তদেব, পৃ. ১৫
২৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১১
২৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৪
২৭. তদেব
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ. ৪২৫
২৯. তদেব, পৃ.
৩০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, মন-কণিকা, পৃ. ৩৭৮
৩১. তদেব, পৃ. ৩৭৮
৩২. তদেব
৩৩. তদেব, পৃ. ৩৭৮

৩৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১১

৩৫. তদেব

৩৬. তদেব, পৃ. ১২

৩৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭

৩৮. তদেব, পৃ. ১৫

৩৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৬১৩

## তৃতীয় অধ্যায়

# শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ

মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই গল্প বলতে ও শুনতে শুরু করেছে। যদিও উনিশ শতকের ছোটগল্পের জন্মের কারণ হিসেবে প্রথমত যন্ত্রণার কথা জানা যায় অর্থাৎ বলা বাহুল্য যন্ত্রণা থেকেই ছোটগল্পের জন্ম। তাই ছোটগল্পকে যন্ত্রণার ফসল বলা হয়। এই যন্ত্রণা দ্বিবিধ। এক. সামাজিক সংকট দুই. ব্যক্তিক। একে আবার বলা যেতে পারে আত্মিক কারণ। এছাড়াও অন্য একটি কারণ হ'ল—সংবাদপত্র। ছোটগল্পের জন্মের পেছনে পত্রিকার আনুকূল্য স্বীকার করতেই হয়। অতীতে গল্প বলার মধ্যে দিয়ে আদি মানুষ অভিজ্ঞতার বিনিময় করেছে। গুহার মধ্যে আগুনের ধারে বসে একে অপরের সঙ্গে শিকার করার অভিজ্ঞতা বিষয় বিনিময় করেছে। পথ চলার অভিজ্ঞতা, পথের বিপদ, পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়, শিকার করার কৌশল বর্ণনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। সেই হ'ল গল্পের আরম্ভ। তারপর কালে কালে বৌদ্ধজাতক, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত গদ্য আখ্যানাবলী ও প্রাকৃত গল্প সাহিত্য ভারতীয় কথা ও আখ্যায়িকা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। সেকালে উদয়ন কথা নিয়ে গ্রাম-বৃদ্ধেরা যে গল্প বলতেন তারও বিশেষ খ্যাতি শোনা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালির নিজস্ব গল্প ভাণ্ডার। পঞ্চদশ থেকে আষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ। সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি বিষয় ছিল মঙ্গলকাব্যগুলির মূল আলোচ্য বিষয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন, রীতি-নীতি, সংস্কার, বিশ্বাস, রাষ্ট্রিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট ও ধর্মীয় সংঘাত ও সমন্বয়ের চিত্রগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে রূপ পেয়েছে এই ধরণের গ্রন্থগুলিতে। বলাবাহুল্য যে, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালির জাতীয় সম্পদ। সর্বোপরি আমরা মধ্যযুগীয় বাংলা ও বাঙালির পরিচয় এই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকে আশ্রয় করেই জানতে পাই। এই দীর্ঘ সময় অতিক্রমণের পর উনিশ শতকে আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত। সবশেষে আধুনিক যুগে কালক্রমে কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্বে গল্প উপন্যাসের কথা জানা যায়। শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু গল্প রচনা করেছিলেন। সেই সমস্ত গল্পে মূলত পুরাকীর্তি তথা ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে শশিচন্দ্র দত্তের পস্থানুসরণ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) বাংলায় প্রথম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) রচনা করেন।

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’-এর মধ্যে ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ এই দুটি আখ্যান-বৃত্ত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাতেই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে রোমান্স ধর্মিতাই লক্ষণীয়। তারপর রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনা করলেন। বলা যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস ধরা দিয়েছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৩২-১৯৩৮), যদুনাথ ভট্টাচার্য ইতিহাসকে নিয়ে বাংলা গল্প উপন্যাসের জগতে হাজির হলেন। যদুনাথ ভট্টাচার্য বাংলার ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে খুব একটা সমাদর পায়নি পাঠক সমাজের কাছে। অতঃপর এলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০)। ইতিহাসের অনুষঙ্গ, বিষয়-বস্তু, চরিত্র প্রভৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেও পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁর কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি একজন ইতিহাস গবেষক। ফলত ইতিহাসকে তিনি ধারাবাহিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সম্মত রূপদান করতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে ‘ঐতিহাসিক রস’ বঙ্কিম অনুসারী। ইতিহাসের বর্ণনায়, কল্পনায় তিনি কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সময়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে হাজির হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দুবাবু ইতিহাসের গবেষক ছিলেন না। ভারতের ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেও অন্যান্য ইতিহাস-গবেষকের মতো তিনি ইতিহাসানুসন্ধান করেননি। বলা যায়, তিনি একজন ইতিহাস বিষয়ের অনুরক্ত পাঠক। নিবিড় ইতিহাস অনুশীলনের ফলেই এই সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্পের কালসীমা। তাঁর লেখায় ইতিহাস স্বচ্ছন্দগতিতে রসসৃষ্টিতে অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে। ইতিহাস ও কল্পনা তাঁর ঐতিহাসিক আখ্যান বৃত্তে হাত ধরাধরি করে চলেছে। ফলত গল্পের তীক্ষ্ণতা আরও তীব্রতর ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় — “দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এইখানেই ঐতিহাসিক গল্প লেখক রূপে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।”

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি মূলত বিশেষ বিশেষ সময়সীমায় আবদ্ধ। তিনি মূলত সতেরোটি ‘ইতিহাস-নির্ভর’ গল্প রচনা করেছেন। গল্পগুলিতে তিনি বিশেষ এক সময়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিত্র এঁকেছেন। দূরকালে বিসর্পিত মানব সত্তাকে স্থাপন করে বর্তমানকালের সঙ্গে কোন এক অদৃশ্য সেতুর মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত ‘ইতিহাস-মূলক’ গল্প।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আলাউদ্দিন খিলজির সময় পর্বে লেখা ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ ও ‘বেরা রোধসি’। শিবাজীকে নিয়ে তিনি ‘বাঘের বাচ্চা’ নামক গল্পটি রচনা করেছেন। ‘তক্ত্ মোবারক’ গল্পটি শাহসুজার আমলে রচিত হয়েছে। বলা যায়, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘চুয়াচন্দন’ এই দু’টি গল্পের পটভূমি মূলত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কল্পিত। ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’ — গল্প তিনটি চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রচিত। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘সেতু’ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীর কাল সীমায় রচিত। ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটির কালসীমা আর্যদের আগমনের গোড়ার দিকে। ‘ইন্দ্রতুলক’ -এর সময় সীমা আর্যদের আগমনেরও পূর্বে। ‘রুমাহরণ’ গল্পটির কাল প্রাচীন তবে অনির্দেশ্য অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের পটভূমিতে রচিত। ‘আদিম’ গল্পটির বীজ মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে পাওয়া। ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটির পটভূমি মূলত বৌদ্ধযুগ। উল্লিখিত গল্পগুলির কালসীমা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে ইতিহাসের পটভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে—লেখকের রচনা কালের ওপর ভিত্তি করে নয়।

বলা যায়, সুদূর অতীতের কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে শরদিন্দুবাবু গল্পগুলির পটভূমিকা রচনা করেছেন। গল্পের মধ্যেও গল্প বর্তমান — শরদিন্দুবাবুর কিছু কিছু গল্পের ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিকে দু’টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। যথা—

১. জাতিস্মর-প্রসঙ্গমূলক গল্পধারা
২. ইতিহাসাশ্রিত গল্পধারা।

দু’টি বিভাগেই বহুদূর কালের ইতিহাসের অনুষঙ্গ, ঘটনা, চরিত্র এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আবহ জড়িয়ে রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ইতিহাসাশ্রিত জাতিস্মর-প্রসঙ্গমূলক গল্পগুলির কথাবত্তে গল্পের মধ্যে গল্প বিদ্যমান। দ্বিতীয় ধারার গল্পগুলি অতীত ইতিহাসের ঘূর্ণায়মান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ণিত। এই অধ্যায়ে জাতিস্মর ধারার গল্পগুলির সুবিস্তৃত আলোচনার পাশাপাশি ইতিহাসাশ্রিত গল্প ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’, ‘আদিম’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘বেরা রোধসি’, ‘চুয়াচন্দন’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘তক্ত্ মোবারক’ এবং ‘চন্দন-মূর্তি’ প্রভৃতি বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিহাস মূলক গল্প বা উপন্যাসে ইতিহাসকে অবিকল ভাবে উপস্থাপিত করা হয় না। অতীতের কোনো ঘটনা ইতিহাস লেখকের মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করাও নয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে তুল্যমূল্য বিচার করে খাঁটি ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন। তথ্যের বিকৃতি তাঁর কাজের মূল্য হ্রাস করে। ঔপন্যাসিক মনে করেন ইতিহাস হ’ল বর্তমান ও অতীতের মধ্যে অস্তহীন সংলাপ। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশের হাতিয়ার। কারণ, ইতিহাসে মানুষ খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্ব। ইতিহাস মানুষের পূর্বপুরুষের বীরত্ব, মহিমা, শৌর্য, দেশানুরাগ, জাতীয় ঐক্য, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বর্তমানকালের মানুষকে স্মরণ করায়।

ইতিহাস পাঠে মানুষ জাতীয় গৌরব সম্পর্কে অবহিত ও উজ্জীবিত হন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজটিই কিন্তু ইতিহাস অনুষঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে করেছেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—“বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ইতিহাস আছে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আছে, কিন্তু আমরা তাহা প্রাক-মুসলমান যুগের ইতিহাস। সেই ইতিহাস বাঙালীকে শুনাইতে পারিলে বাঙালীর আত্মচৈতন্য জন্মিতে পারে।”<sup>২২</sup> অর্থাৎ কে বলেছেন বাঙালির ইতিহাস নেই।

শরদিন্দুর মতে ইতিহাস বলতে পূর্বপুরুষদের গৌরব কাহিনিকেও বোঝায়। তাই তিনি একই সঙ্গে বর্তমান কালের মানুষকে পূর্বপুরুষের গৌরব ও আত্মচৈতন্য জাগাতে ইতিহাসকে অবলম্বন করে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসকে গল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে কীভাবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। বলাবাছল্য যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশানুরাগের কথা মনে করায়। ইতিহাস অনুসন্ধান ও ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—‘বাঙালীর ইতিহাস চাই।’ আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ কাজটিই করেছেন। বাঙালি সমাজকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে বাঙালির জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল রূপ দেন—যা বাঙালি জাতির কাছে অত্যন্ত জরুরি। এই সতেরোটি গল্প ইতিহাসের সময়সীমার নিরিখে তথা কাল-পরম্পরায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেদিক থেকে ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি প্রথমেই আলোচনার দাবি রাখে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শাদাপৃথিবী’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি। ‘শাদা পৃথিবী’ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন — “ইন্দ্রতুলক রচনাটি কেহ গান্ধীর্যের সহিত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করি না। উহা ‘হইলে হইতে পারিত’ গোছের পরিকল্পনা; কিন্তু জ্ঞাত ইতিহাসের সহিত তাহার কোনো বিরোধ নাই। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিক তর্কের মীমাংসা হয় নাই। আর্যগণ যুরোপের আদিম অধিবাসী ছিলেন ইহা যেমন সাহেবদের আঘাতে গল্প, আমাদের গল্প হয়তো ততটাই আঘাতে, তাহার বেশী নয়।”<sup>২৩</sup>

কথোপকথনের ভঙ্গিতে আরম্ভ ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি। গল্পে বর্ণিত ইতিহাসের পণ্ডিত স্বপ্নে আটহাজার বছর পূর্বকার পুরনো ইতিহাস চোখের সম্মুখে দেখতে পেয়েছেন। স্মর্তব্য, এই গল্পটিতে স্বপ্ন প্রসঙ্গ থাকলেও ‘সেতু’ গল্পটির মত নয়। আলোচ্য ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটির মধ্যে একজন ইতিহাসের পণ্ডিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার ইতিহাস দেখতে পেয়েছেন স্বপ্ন-যোগের মধ্যে দিয়ে।

প্রাক-ইতিহাসের অনেক কথাই আমাদের অজ্ঞাত। সেই অতীতের অন্ধকারকে অপসৃত করে তার ভিতরের মানব জীবনকথাকে আমাদের কাছে উপস্থিত করবার দায়িত্ব নৃতাত্ত্বিকের, প্রত্নতত্ত্ববিদের, সমাজতত্ত্বের গবেষকের। তাঁদের গবেষণায় যে তথ্য সঞ্চয় হয় সাহিত্যকারের পক্ষে তাই প্রাথমিক উপাদান। সাহিত্যকারের নিজস্ব গবেষণায় প্রাগৈতিহাসের অন্তর্লোকে আলোক সম্পাত হয় না। কিন্তু গবেষণা নয় তার সুতীর এবং অন্তর্ভেদী কল্পনাশক্তির আলোকে সেই অতীতের অন্ধকার অপনোদন করে তার অন্তর্বস্তুকে তিনি উদ্ঘাটিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের কিন্তু পদ্ধতি কল্পনাচারী। অতীতের জীবন লেখককে নানা কারণে আকর্ষণ করে। প্রথমত তাঁর রোমান্সের প্রতি আকর্ষণ। অতীতের এই আকর্ষণ কালে কালে বহু কবি সাহিত্যিকে আকৃষ্ট করেছে। স্কট তার উদাহরণ কোলরীজ তার উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র তার দৃষ্টান্ত স্থল। শরদিন্দুর অতীত চারিতার একটি বড় কারণ এই রোমান্সের আশ্চর্য জগৎ রচনা। অতীত আমাদের বর্তমান জীবনের নানা ক্লিন্নতা থেকে কদর্যতা ও তুচ্ছতা থেকে মুক্ত হয়ে কল্পলোকের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় স্বপ্নে তাকে অনুভব করেছেন, প্রবন্ধে (মেঘদূত) তার কল্পনার দ্বারা নিকষে কণকরেখার মতো আলোকিত করবার কথা বলেছেন। রোমান্সপ্রিয়তা এবং ধূলি মলিনতা মুক্ত এক নির্মল জীবন কাহিনির প্রতি আকর্ষণ কল্পনা প্রবণ কবি সাহিত্যিকদের ধর্ম। তার সঙ্গে আছে দূরচারী অতীতের জীবন কাহিনির পুনর্নির্মাণ। যাকে ইতিহাসের দু-চারটা বড় বড় তথ্যের দ্বারা মাত্র জানা যায়, যার জীবনযাত্রার কোনো স্পষ্ট পরিচয় জানা নেই সেই ইতিহাস ভূমির অল্প জানা ঘটনাবলীর কঙ্কালের উপর রক্ত মাংসের সঞ্চারণ করে সে সময়কার মানব জীবনের সম্ভাব্যরূপটি গড়ে তোলা কবি কল্পনার কাজ। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বা গল্পগুলিতে এই জীবনের সম্ভাব্য রূপটি কল্পনায় নির্মাণ করবার চেষ্টা দেখা যায়। বঙ্কিমের ইতিহাস অনুসরণের মূলে সৌন্দর্যও প্রেম চেতনা প্রথমদিকে প্রধান থাকলেও তিনি ক্রমশ দেশ ও জাতির মহত্ত্ব সন্ধান করতে অগ্রসর হয়ে গেছেন। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত জীবন রচনার মূলে কোনো স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা প্রবল নয়, বরং কল্পনামূলক অতীতের পুনর্নির্মাণই প্রধান লক্ষ্য।

তিনি একজন নৃতাত্ত্বিক গবেষকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে ‘বর্বর মানব জাতি’র উৎস ভূমির নিরন্তর অনুসন্ধান করেছিলেন। বর্বরতার যুগের মানবসভ্যতাই কী পরবর্তীকালে ‘আর্য সভ্যতায়’ পরিণত হয়েছিল, না যুরোপের ক্ষেত্রভূমি থেকে আর্যরা আমাদের দেশের অভিমুখে এসেছিল — লেখকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়েছিল — আর তারই ফলস্বরূপ আলোচ্য ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটির অবতারণা। লেখক মনে করেন আর্যরা মূলত ভারতেরই আদিম অধিবাসী। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ও

ভারতীয় পণ্ডিতদের একাংশ মনে করেন আর্যরা যুরোপের অধিবাসী — এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব গল্পটির কাহিনি-অগ্রসর হয়েছে। আর্যদের বাসস্থান, আচার-আচরণ, জীবিকা, অন্নসংস্থান, পশুপালন, কৃষিকাজ, দূরদর্শিতার পরিচয় ও সাংসারিক জীবন পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। আর্যদের দেবতা হিশেবে ‘মৎস্য’, ‘বিবস্বান’ ও পরবর্তীকালে ‘বরুণ’ দেবতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে লেখক যদি সচেতন ভাবে গবেষণা না করতেন তাহলে বর্বরতার যুগে সকল জাতিরই একটা 'Totem' বা ‘কুলদেবতা’ থাকতো — এ সব তথ্য উঠে আসতো না। লোকসংস্কৃতির তুচ্ছ অনুসঙ্গকেও লেখক তাঁর রচনার মধ্যে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে ছাড়েন নি। অতপর আর্যদের ক্রম-বিবর্তন, ঘোড়ার ব্যবহার, আর্যদের দেবতা ‘বরুণ’কে সরিয়ে ‘ইন্দ্র’কে পূজার্চনা, ইন্দ্রের দেবত্ব লাভ সর্বোপরি আর্যদের এক নোতুন সংস্কৃতির জন্ম লাভ ইত্যাদি প্রসঙ্গ গল্পটিতে উঠে এসেছে। লেখকের কথায় — “দেশটা ইন্দ্রের দেশ বলে পরিচিত হল; প্রাচীন দেশ অবশ্য বরুণের দেশই রইল। ইন্দ্রের দেশে যারা বাস করতে লাগল, তাদের নাম হল ইন্দ্র। কালক্রমে ইন্দ্র অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। এখনও সেই নাম চলে আসছে। আমরা হিন্দু অর্থাৎ ইন্দ্রপূজক।” -এরপর সগর রাজার একপুত্র ভগীরথ ষাট হাজার প্রজা নিয়ে কোনো এক কারণে ভারত-অভিযান চালিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অযোধ্যায় এসে পড়েছেন। রামচন্দ্র হলেন সগর রাজার নবম অধস্তন পুরুষ। ভারতবর্ষেরই অধিবাসী। এভাবেই গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

‘জাতিস্মর’ (১৩৩৯) প্রথম গল্প-গ্রন্থ তাঁর। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পূর্বজন্মের কাহিনি নিয়ে লেখা তিনটি গল্পের সমষ্টি। এই তিনটি গল্প হ’ল — ‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ ও ‘রুমাহরণ’। এছাড়া আরও তিনটি গল্পের নাম করা যায় — ‘চুয়াচন্দন’ গ্রন্থের (১৩৪২) ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘বিষকন্যা’ গ্রন্থের (১৩৪৭) ‘সেতু’ এবং ‘বিষকন্যা’ ও জাতিস্মর-মূলক গল্পধারার অন্তর্ভুক্ত। জাতিস্মরধারার গল্পগুলি মুখ্যত হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের পটে রচিত। এ গল্পগুলিতে অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে, তৎসম শব্দবহুল ভাষার ব্যবহারে সৌন্দর্য রচনা ও রস সৃষ্টিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণির একটি রচনা ‘রুমাহরণ’। আর এই গল্পটির পটভূমি ঐতিহাসিক যুগের। গল্পের কথক বলেছে সন-তারিখের ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয়নি। মানুষ তখন বর্বর ও বন্য; প্রকৃতির সঙ্গে, পশুর সঙ্গে অহরহ লড়াই সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করতো। পশুর কাঁচা মাংস খেতো। নারীহরণ, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাদখল ও আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি সেসময়কার মানুষের অভীষ্ট ছিল।

‘রুমাহরণ’ গল্পটি পুরুষ ও নারীর জন্মান্তরের স্মৃতি-সূত্রে রচিত। তার মূল বিষয়

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পটভূমিতে রচিত আদিম কামনা এবং নারীহরণ গল্পটির মূল বিষয়। সেকালে জোর করে কোনো গোষ্ঠীর ভিতর থেকে নারীদের অপহরণ করে এনে সঙ্গিনী হিসেবে ব্যবহার করার রীতি ছিল। ফলস্বরূপ নারীর সংখ্যা কমে যাওয়ার চিন্তায় পুরুষরা ছিল চিন্তিত। শরদিন্দু সেই আদিম যুগের গোষ্ঠীজীবনের পটভূমিতে নারীহরণের প্রাচীন আখ্যানকে কল্পনায় সজীব করে তুলেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘মৃৎপ্রদীপে’ পাই শুধু নায়ক চরিত্রের জন্মান্তর প্রসঙ্গ, কিন্তু ‘রুমাহরণ’ গল্পটিতে লেখক নায়ক-নায়িকা উভয় চরিত্রের জন্মান্তর স্মৃতি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রেলের পাশ পেয়ে কথক তথা নায়ক শৈলপ্রদেশে বেড়াতে যান। সেখানে “শীতশিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি” গভীর রাত্রিতে তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়। সে একাকী চন্দ্রালোকিত পাইন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির “এ দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে।” যেন এই দৃশ্যপটটিকে অতীত যুগ থেকে ছিঁড়ে এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতে তার ঘুম আসছিল না বলে রাস্তায় বেরিয়ে এক পাইন গাছের তলায় বসে রাত্রির শোভা নিরীক্ষণ করছিল। আর সেই সময় একটি ক্ষীণ মধুর কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে। সঞ্চরমান ছায়ামূর্তির মতো কেউ সে গান গাইছিল। গানের কথাগুলি কথক বুঝতে পারে নি, কিন্তু সুরটি যেন তার বহুকালের কোনো চেনা সুর যেন আগে কোথায় এ সুর সে শুনেছে। আর সেই মুহূর্তে কথকের পূর্ব জন্মের স্মৃতি জেগে ওঠে। “এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছি — বহুবার শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাৎ এই যে, যে-ভাষায় এই গান পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাংলা ভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গান ভুলি নাই। কোথায় অন্তরের নির্জন কন্দরে এতকাল লুকাইয়াছিল, শুনিবামাত্র প্রতিধ্বনির মতো জাগিয়া উঠিল।” যে গান শুনে কথকের জন্মান্তরের স্মৃতি জেগে উঠেছে, সে গান শোনা মাত্রই তাঁর বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠত — তা নিম্নরূপ :

“বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী

ধারালো তীর হেনে!

চামড়া তাহার আমায় দেবে এনে

পরবো গায়ে আমি।”

অর্থাৎ, গানটিতে ধরা পড়ে একটি নারীর স্বামী শিকার করতে কতটা দক্ষ, কতটা বীর, কতটা কঠিন শিলার মতো দেহ তার বর্ণনা। পাশাপাশি শিকার করা পশু-পাখির চামড়া অলঙ্কার হিসেবে পরবার কথাও জানা যায়।

আদিম মানব সমাজের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে এই গানটির কথাগুলিতে। আর

সেই সূত্রে কথক পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়ে অতীতের কাহিনি বলতে শুরু করেছে। সে এক আদিম সমাজের মানুষ। তার সমকক্ষ প্রতিনায়ক হুড়া। গাঙ্কার ধারণা ছিল এই সমাজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারী তিভ্তি তাকে বিয়ে করবে। তাদের গোষ্ঠীতে মেয়েদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। সেজন্য সব পুরুষের সহযোগী নারী পাওয়া যাচ্ছিল না। যারা বলশালী তারা অন্যকে বাহ্যুদে পরাজিত করেই সহচরী যোগাড় করে নেয়। গাঙ্কাকে তিভ্তি কিন্তু পছন্দ করেনি, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হুড়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। নারীর অধিকার লাভের যুদ্ধ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আদিম দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত গাঙ্কার পালিয়ে যাওয়ার ফলে শেষ হয়।

গাঙ্কা পালিয়ে গিয়ে এক নির্জন গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে সে নির্বিঘ্নেই ছিল। এরই মধ্যে সেই পথ দিয়ে নতুন এক মানবগোষ্ঠী পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমি অংশে এসে বাসা বাঁধে। তখনকার মানুষ যাযাবর প্রকৃতির। তাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। গাঙ্কার নিজের কথায় — “একটা অশ্রুতপূর্ব চিহ্ন-চিহ্ন শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একেবারে নিষ্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি ! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো একাজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।”

অনেক কুমারী, সুন্দরী যুবতী সে দলে ছিল। গাঙ্কা গোপনে ঐ মানুষদের গতিবিধি লক্ষ করে। একটি সুন্দরী মেয়েকে সে কেড়ে নিতে চায়; নিজের গোষ্ঠীর যুবকদের নিয়ে রাত্রে সে চড়াও হয়। যুদ্ধে বহু মানুষ মারা যায়। গাঙ্কা তার পছন্দের মেয়েটিকে হরণ করে আনে।

সেকালের আদিম সমাজে প্রচলিত বিবাহ প্রথা এই কাহিনিটির পিছনে লুকিয়ে রয়েছে। অন্য গোষ্ঠী থেকে মেয়েদের অপহরণ করে এনে তাকে সহচরী হিসেবে গ্রহণ করা হত। আদিম বিবাহ ব্যবস্থার এই ভিত্তিকুই এ কাহিনির ইতিহাস। বাকী সবটাই লেখকের কল্পিত। কিন্তু সে কল্পনা ইতিহাসের প্রকৃতিতে কোথাও অতিক্রম করে নি বা ক্ষুণ্ণ করে নি। নীরব ইতিহাস কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু ইতিহাসের এই অস্পষ্ট ধূসর অঙ্ককারকে কল্পনার পাত্র-পাত্রীর জীবনালোকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তার ইতিহাস নির্ভর কাহিনিগুলিতে রোমান্সের জয়জয়কার; সে রোমান্স ইতিহাস অতিচারী নয় ইতিহাস অভিমুখী।

গল্পটি কথকের পূর্ব জীবনের বৃত্তান্ত অর্থাৎ ধূসর অতীতের মোহময় ইতিবৃত্ত। কিন্তু বহুদূরকালের স্মৃতিসূত্র বর্তমানের সীমারেখায় ধরা দিয়েছে অপূর্ব ভঙ্গিতে। লেখকের বর্ণনায় তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে — “মনে পড়ে না? সেই উপত্যকায় তোমরা একদল যাযাবর এসে ছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে খেতে। হুদের জলে যে

লক্ষা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরি করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে।... মনে পড়ে না? একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম। তোমাদের দলের সব পুরুষ মরে গেল! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলুম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এই খানে মারলে।” গাঙ্গা রুমাকে পূর্বস্মৃতি স্মরণ করানোর চেষ্টা করেছে। রুমাকে দেখতে পেয়ে গাঙ্গা হৃদয় দিয়ে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দিয়ে রুমাকে কাছে পেতে চেয়েছে — কিন্তু রুমা — “বলিল, মনে পড়ে না — কবে কোথায় —” পর মুহূর্তেই গাঙ্গার কপালের দাগ দেখে রুমার পূর্বজনমের স্মৃতি ফিরে এসেছে — “বহু পূর্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জডুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে! রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষনেত্র চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গাঙ্গা! গাঙ্গা!”

এভাবেই গাঙ্গা ও রুমার পূর্বস্মৃতির আলোকে লেখক অতীতকে আলোকিত করে তুলেছেন। এই গল্পটি পাঠে পাঠকের মনে অনন্ত বিস্ময়ের উদ্বেক করে ও গল্পের আদ্যন্ত কৌতূহল বজায় রাখে (ঘটনার প্রবহমানতার সঙ্গে পাঠকের মনেও অতীত)। অন্বেষণের অসীম আগ্রহ জাগায়। লেখকের কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণ তথা সুদূর প্রসারী অতীতের অন্ধকার ভেদ করবার মতো মানবসভ্যতার অতীত খনন করে তার পরিচয় উদ্ধার করবার মতো কল্পনাশক্তি— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল। ‘রুমাহরণ’ গল্পটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। নারী পুরুষের আকর্ষণ বিকর্ষণের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির সফলতম রূপকার হিশেবেও তিনি কৃতিত্বের দাবী রাখেন। মানব-হৃদয়ের কামনা বাসনা প্রেম ও বৈরিতার বহু মুখী প্রবৃত্তিকেও তিনি বাস্তব সম্মত রূপ দান করেছেন।

রুমাকে গাঙ্গা পাশবিক ভাবেই ছিনিয়ে নিয়েছিল, ধ্বংস করে দিয়েছিল তার গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাসকারী মানুষগুলিকে। তাদের নারীদের হরণ করে নিয়েছিল এই গোষ্ঠীর পুরুষেরা। রুমা এখানে কোনো বিশেষ একটি নারীর রূপ নয়; আদিম সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের প্রবৃত্তিগত আকর্ষণের একটি ছবি তাকে অবলম্বন করে আঁকা হয়েছে। এই রকম নারীহরণ সেকালের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খুব স্বাভাবিক ছিল। পুরুষকে শক্তি সাহস ও শৌর্যের দ্বারা নিজের সঙ্গিনী নির্বাচন করতে হত। অনেক সময় গোষ্ঠীর ভিতরের কোনো নারী এই পুরুষের সঙ্গিনী হত। কিন্তু সঙ্গিনী স্বেচ্ছায় পুরুষ নির্বাচন করলেও গোষ্ঠীর অন্য সক্ষম যুবকেরা তাকে আক্রমণ করত। আবার বহুক্ষেত্রে অন্য গোষ্ঠীর নারীকে হরণ করে আনতে হত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলিতে প্রাচীনকালের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি ভাবঘন রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যে যুগের ইতিহাস ধূসর অতীতের প্রাস্তলগ্ন, যার কোনো তথ্য সম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না, সেখানে

অতি সামান্য কোনো উপাদানের সাহায্যে কল্পনাকে প্রসারিত করে জীবনের রূপকে ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা তাঁর ছিল। ঐতিহাসিকেরা প্রাগৈতিহাসের যে পর্বের পরিচয় জানতে প্রত্নবস্তুর উপর সাহায্য নেন— একটি দুটি উপকরণের ভিত্তিতে যার উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেন—সাহিত্যকার সেখানে সেই সামান্য উপকরণের ভিত্তিতে কল্পনার ইন্দ্রজাল প্রসারিত করে অতীতের জীবন ও সংস্কৃতিকে বিশ্বাস্য যোগ্য করে গড়ে তোলেন। ভাষা তাত্ত্বিকেরা ‘বিবাহ’ শব্দটির মধ্যে প্রাচীন কালে নারী হরণের ইতিহাস খুঁজে পান। রামেশ্বর শ’ লিখেছেন— ‘বিবাহ শব্দের মূল অর্থ বিশেষ রূপে বহন করা। এ থেকে কোনো কোনো সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন অতীতে বিবাহ যোগ্য কন্যাকে অপহরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। ‘বিবাহ’ শব্দের মূল অর্থের মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে।’ শরদিন্দু এই শব্দার্থের ইঙ্গিত টুকু মাত্র গ্রহণ করে অতীতের গোষ্ঠী জীবন, নারী নিয়ে তাদের বিরোধ অন্য গোষ্ঠীর নারী হরণ করবার সময় যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জয় লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত নারীটিকে সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে উজ্জ্বল চিত্রে উপস্থাপিত করেছেন। ‘রুমা’ চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি; রুমা পুরুষচিত্তে কামনা উদ্বেক করা এক নারী মাত্র, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ধর্মে সে আক্রমণকারী পর পুরুষের হাত থেকে রক্ষা পেতে তার মাথায় আঘাত করেছে। আবার পরাক্রান্ত পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তাকেই স্বীকার করে নিয়েছে। পূর্ব গোষ্ঠীর কথা মনে আনেনি। রুমার মতো অন্য নারীরাও গাঙ্কার গোষ্ঠীর পুরুষদের সঙ্গিনী হয়ে থেকেছে। নারীহরণই গল্পের মূলকথা। গোষ্ঠীগুলির আদিম জীবন ধর্ম প্রকাশে তা মূল্যবান। এদিক থেকে যেকোন নারীহরণই এই আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে বলেই লেখক গল্পটির নামকরণ করেছিলেন ‘রুমাহরণ’।

গল্পটি আত্ম-কথন রীতিতে লেখা। কথক ‘আমি’ সর্বনাম পদের আশ্রয়ে গল্পের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের চরিত্রগুলির মুখের ভাষায় মূলত তিনি একই সঙ্গে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর রচনার ভাষা হয়ে উঠেছে তীব্র মোহময় আকর্ষণকারী ও গতিশীল। তিনি ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভাষা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল — “ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতন — বেতো ঘোড়ার মতন নয়। শুধু গতিবেগ নয় — ছোট্টার মধ্যেও সৌন্দর্য যেন ছুটে বেরায় — মন যেন ভরে যায়।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই বসু, পৃ. ৭৭) বাস্তবিকই তাই-ই ঘটেছে আলোচ্য গল্পটির ভাবের বাহন ভাষা-সংস্থানের মধ্যে দিয়ে। ভাষার প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে সর্বদাই এই গল্পটিতে। গানে ব্যবহৃত ভাষার ব্যবহারও সাঙ্গীতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত। চরিত্র গুলির রূপবর্ণনার ভাষাও অত্যন্ত গতিশীল বলে মনে হয় — “তিত্তির রূপ দেখিবার মতো বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নব-পল্লবের

মতো বর্ণ, কালো হরিণের মতো চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ — ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও অতিশয় চপল। সে নির্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরু বেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্য করিতে করিতে তাহার অর্জন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না।” এই নৃত্যচপল চরিত্রটির মতোই গল্পটির ভাষা-রীতিও অতিশয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ভাষা থেমে থাকে না — চলে, চলে বলেই এর গতি সর্বত্র।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রকরণ-কৌশল, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সর্বোপরি বলিষ্ঠ সতেজ প্রবহমান ভাষার প্রয়োগ গল্পটিকে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠগল্পের সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়েছে। শরদিন্দুর ভাষা-প্রয়োগরীতি সম্পর্কে সুসাহিত্যিক রাজশেখর বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

—“আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকেরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প ক’জন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাঁদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই — আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধ হয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ।”<sup>৪</sup>

শরদিন্দুবাবুর গল্প বলবার ভঙ্গিটিই আপামর পাঠককে আকর্ষণ করে। একবার গল্প পাঠ শুরু করে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠক গল্পপাঠে বিরতি দেন না — যত বড়ই গল্প হোক না কেন — তার কারণ বোধ হয় তাঁর সুললিত রসসিক্ত ভাব ও ভাষা। ‘রুমাহরণ’ গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটি মূলত আর্ষদের ভারতভূমিতে পদার্পণকালের পটভূমিকায় রচিত। ভারতে আর্ষদের প্রভাববিস্তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ক্ষমতা দখল, নারীহরণ, আর্ষ-অনার্য সংঘাত ও সমন্বয় প্রভৃতি আর্ষ-অনার্য সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটি পাঠে। দুই আর্ষযোদ্ধা সৈন্য সামন্ত নিয়ে নিজের ক্ষমতা বলে কৃষ্ণকায়-দস্যু-তক্ষরদের পরাজিত করে স্বরাজ্য স্থাপন করে। তাদের নাম — প্রদ্যুম্ন ও মঘবা। লেখকের ভাষায় — “উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।” কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পর এই বন্ধুযুগল বড়ই সমস্যায় পড়ে, কে রাজা হবে? এই সমস্যার আশু সমাধান সূত্র আবিষ্কার করল বন্ধু প্রদ্যুম্ন। ‘চন্দ্রগ্রহণ’! চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মে আসে যায়। এই চন্দ্রগ্রহণের সময়কালের ওপর নির্ভর করে তারা তাদের সমস্যার সমাধান করে। প্রথম চন্দ্রগ্রহণের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ পর্যন্ত এক এক করে তারা দুই বন্ধু রাজাসনে বসবে। ঠিক সেই নিয়মেই মঘবা প্রথমে রাজা হয় আর প্রদ্যুম্ন সেনাপতি। চন্দ্রগ্রহণ ব্যাপারটিকে গল্পের মূল কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসে লেখক সময় গণনার নূতন একক রচনা করেছেন। যখন সময় সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়নি, তখন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মানুষ সময় বুঝতে শুরু করে।

মঘবা রাজা হবার পরই যুদ্ধ যাত্রায় বের হয় এবং যুদ্ধ শেষে কোদণ্ড নামক রাজ্যের অনার্য জাতির রাজ কন্যা এলাকে হরণ করে নিয়ে আসে। মঘবা তাকে বিশেষ দিনে বিবাহ করবে তা স্থির হয়। সেনাপতি প্রদ্যুম্ন এলাকে যথারীতি চোখে চোখে রাখে। সমস্যা আরও গভীর আকার ধারণ করে। মঘবা যেদিন এলাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করে সেইদিনই প্রদ্যুম্ন বলে ওঠে — “সেনাপতি মঘবা! মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁর প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তারপর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই তাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্মেঘ কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধুম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।” — এখানেই গল্পটির ‘মহামূর্ত্ত’ ধরা পড়েছে। এতদিনের মনের অভিলাষ এক মুহূর্ত্তেই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে যায় তার জীবনে। নির্মম নিয়তি যেন মঘবার জীবনের সমস্ত আশাকে ক্ষণিকের চন্দ্রগ্রহণের কালো করালছায়া গ্রাস করে নিয়েছে। মঘবা নিরুপায়। কথা তাকে রাখতেই হবে। রাজা হওয়ার শর্ত রাখতে গিয়ে মঘবাকে সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে — এটাই মঘবার জীবনে নিয়তি।

অন্যদিকে এলা মঘবাকে কোনো দিনই ভালোবাসে নি; উপরন্তু মঘবাকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করে। এলার জীবনে প্রেম এসেছিল প্রদ্যুম্নের জন্যে, কিন্তু মঘবার জন্যে নয়। প্রেমিকা এলা চরিত্রের স্বরূপও উদঘাটিত হয়েছে এখানে। তিনজন নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা ও অসহায়তার চিত্র লেখক সরস কৌতুক ও প্রাজ্ঞল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ নাটকের একটি সংলাপ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে—“সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব চিনিয়ে নিয়ে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায় ....।”

প্রাগ্-জ্যোতিষ কথাটি এখানে সময় গণনার পূর্বকালের কথা বলতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্যদের ভারত আগমনের আগে এদেশে কিংবা আর্যদের মধ্যে সময় গণনার কী রীতি ছিল তা বলা যায় না। তবে ঋগ্বেদে মাস ঋতু বর্ষ ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। লেখক এ গল্পে আর্যদের সেই প্রাকজ্যোতিষ পর্বের কাহিনি বেশ সরসভাবে উপস্থিত করেছেন। ‘মৃৎপ্রদীপ’ ও ‘বিষকন্যা’র কথাবস্ততে যেমন জটিলতার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং বেশ একটি লঘু ও সরস কথাভঙ্গী এখানে প্রথম থেকেই বর্তমান। শরদিন্দুর অতীত চারণার মধ্যে ‘সম্ভাব্য’ বাস্তবতার একটি মায়াজাল সৃজন লক্ষ করা যায়। এখানেও তা আছে রাজার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে—এই হল সাধারণ রীতি। অথচ প্রদ্যুম্ন এলার প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হয়। এলাও প্রদ্যুম্নের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। অথচ প্রদ্যুম্ন এলাকে পাবার কোনো উপায় খুঁজে পায়

না। এই সমস্যার সমাধান হয় সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে, নিতান্ত প্রাকৃতিক উপায়ে। এক চন্দ্রগ্রহণ থেকে আরেক চন্দ্রগ্রহণ পর্যন্ত এক জনের রাজত্ব কাল। মঘবার সঙ্গে বিবাহের আগেই আকাশে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। যথারীতি পূর্ব শর্ত অনুসারে প্রদ্যুম্ন এবার রাজা হয় আর মঘবাকে সেনাপতি হতে হয়। প্রদ্যুম্ন রাজা হয়ে মঘবাকে আদেশ দেয় যে, এলাকে নিয়ে আসতে। আলোচ্য প্রাগ্জ্যোতিষ গল্পটিতেও মঘবার জীবনে চন্দ্রগ্রহণ আশা ভঙ্গের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এলা নামক যুবতী মঘবার হাত থেকে প্রদ্যুম্নের অধিকারে চলে গেছে। চন্দ্রগ্রহণ যেন মঘবার সকল আশায় ছায়ার প্রলেপ ফেলে দিয়েছে। জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে মঘবার।

গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — ‘আদিম’ গল্পটির পটভূমি নির্মাণ করেছেন সুদূর প্রাচীন মিশরের সামাজিক সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে। পটভূমি ও বিষয়-বস্তুর দিক থেকে গল্প নোতুনত্বের পরিচয় মেলে।

প্রাগ্জ্যোতিষ গল্পের উপসংহার বেশ আকস্মিক এবং কৌতুকজনক। গল্প বলা এবং গল্পের ভিতরে অতীতের বিশেষ পর্বের (সম্ভাব্য) জীবনকথা ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্য। এর ঘটনাই মুখ্য। চরিত্র ঘটনা বর্ণনার উপাদান মাত্র। যে অর্থে চরিত্র কেন্দ্রিক গল্প রচনা হয় বা চরিত্রের অন্তর্লোকের উদ্ঘাটন হয় তার স্থান এখানে নেই। কাহিনির উপসংহার ও ঘটনা পরম্পরায় স্বাভাবিক পরিণতি পায়নি।

আদিম (১৩৬৮) গল্পে প্রাচীন মিশরের একটি সামাজিক প্রথাকে কেন্দ্র করে ঘটনা বিন্যাস করা হয়েছে। গল্পটিতে প্রাচীন ইতিহাস অপেক্ষা সমাজ ইতিহাসের একটি প্রাচীন রূপ দেখানো হয়েছে। সে রূপ বিবাহ ব্যবস্থা নিয়ে। প্রাচীন মিশরে ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হত। শুধু মিশরে নয়, রোমে, দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকাদের মধ্যে এবং আরো অনেক জায়গায় এরকম প্রথা ছিল। রক্ত সম্পর্কে নিকট জনের মধ্যে বিবাহ ও যৌন সম্পর্ক অনেক জাতির মধ্যে ছিল। গ্রেকো রোমান রাজত্বের পর্বেও মিশরে এরকম প্রথা দেখা যায়। রোমানদের মধ্যে এরকম সম্পর্ক সাধারণের জন্যে নিন্দনীয় হলেও রাজাদের মধ্যে তা একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

শরদিন্দু গল্পটির নাম দিয়েছেন ‘আদিম’। আদিম মানুষের মধ্যে নিকট সম্পর্কের যৌনতা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রোমান সভ্যতার কালে কিংবা মিশরে রাজ পরিবারে এবং সাধারণের মধ্যে নিকট সম্পর্কের যৌনতা, ভাইবোন বিবাহ—একে ঠিক আদিম বলা যায় কিনা সন্দেহ। Numerous papyri and Roman census declaration to many husbands and wives being brother and sister of the same father and mother. উদাহরণ হিসেবে একথাও বলা যায় টলেমি রাজ পরিবারে ক্লিয়োপেট্রা (সপ্তম) তার ছোট ভাই ত্রয়োদশ টলেমিকে বিয়ে

করেছিলেন এবং তাদের মা বাবাও ছিলেন ভাই বোন। কাজেই একথা বলা যাবে না যে কেবল আদিম মানবের মধ্যেই এরকম সম্পর্ক ছিল। এরকম সম্পর্ক পরবর্তীকালে সমাজে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে তা বলা যায় না।

আমি গল্পের কাহিনি সামান্য। আর বিশেষত্ব কিছু চোখে পড়ে না। শরদ্দিন্দুর অন্যান্য গল্পে Plot গঠনের যে কৌশল দেখা যায় তা এখানে নেই। Plot এর চমৎকারিত্ব অসম্ভব ও অভাবনীয়ের সম্ভাব্য উপস্থাপনা এসব এখানে নেই। কাহিনিতে দেখা যায় মিশর রাজ কোনো দেশ (সম্ভবত জার্মানী রোম বা গ্রীস) জয় করে বহু বন্দী নিয়ে দেশে ফিরলেন। রাজার এক ক্ষুদ্র সেনানী সোমভদ্র বন্দিনী এক নারী মেরুকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দেয়। মেরুকা হাতে স্বর্গ পায়। কিন্তু তাদের সমাজে ভাইবোনের বিয়ে সাধারণ রীতি। সোমভদ্রের বোন শফরী তারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। সোমভদ্রের বোন শফরী তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ভালোবাসা পায় না। সোমভদ্র তাকে সব খুলে বলে। প্রতিহিংসা পরায়ণ শফরী ডাকিনী বিদ্যার আশ্রয় নিয়ে সোমভদ্রের সঙ্গে মেরুকার বিয়ে বন্ধ করে। যথারীতি এর কিছুদিন পরে তাদের বিয়ে হয়। শরদ্দিন্দু এখানে কাহিনি রচনার মুন্সিয়ানা অপেক্ষা বিবাহ প্রথার দিকটাই দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন। সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন—“ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে আদিম একটু দুর্বল।” কারণ ইতিহাসের ঘটনা এ গল্পে জমাট বাঁধে নি। “আমাদের কাছে এ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণ্য ঠেকে”— একথা বলার অর্থ বোধহয় আমরা একে মনে প্রাণে মানতে পারি না বলে আমাদের রস সংস্কারে আঘাত লাগে। তবে এ কাহিনি বহু প্রাচীন মিশরের পটভূমিতে স্থাপিত। দ্বিতীয়ত, তার ঐতিহাসিক সমর্থন যে আছে সুকুমার সেনও তা স্বীকার করেন। দশরথ জাতকের কাহিনিতে পাই রাম ও সীতা ভাইবোন। আমাদের সংস্কৃতিতেও তো এরকম ঘটনার কথা পাওয়া যায় তাহলে। আসলে বিবাহ পদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আদিম নরনারীর যৌন সংস্কারের সঙ্গে একালের পদ্ধতির মিল হবে না। লেখকের কথায় আমাদের মনে হয়, আদিমতা মানুষের রক্তে মিশে রয়েছে। তাই আদিম ক্রিয়া কলাপ মানুষের পিছু ছাড়তে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আপন সাধনায় তা সুচিন্তিত করে তুলেছে।

কিন্তু গল্প জমাট না বাঁধার কারণ গল্পের মধ্যে সম্ভাব্যতা এবং আকস্মিকতার সমাবেশ হয়নি। অন্যদিকে প্রাচীন মিশরের বিবাহ রীতির কথা বলাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। এজন্য মেরুকাকে পছন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত শফরীকেই সোমভদ্র বিয়ে করেছে। গল্পটিতে ভাই-বোনের বৈবাহিক সম্পর্ককে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে শফরীর প্রেমার্তি। অন্যপক্ষে শফরীর প্রণয় প্রার্থী সহোদর সোমভদ্র লুপ্তিতা নারী মেরুকার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করায় শফরীর হৃদয়

যন্ত্রণা আরও বেড়ে উঠেছে। শফরী — সোমভদ্রকে লাভ করবার জন্য বিভিন্ন সংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই গল্পে স্থান পেয়েছে আদিম সংস্কার, মন্ত্রগুপ্তি, বশীকরণ মন্ত্র ও অযথা রক্তপাত প্রভৃতি লৌকিক সংস্কার। বহুদূর কালের সমাজ ও সভ্যতায় এই লোকজ উপাদান বা সংস্কারগুলি যে দৃঢ়মূল ছিল তাও আঁচ করে নেওয়া যায়। ডাকিনীর সঙ্গে শফরীর কথোপকথনে বেশ নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছে — যা চমকপ্রদ বটে। ‘আদিম’ গল্পটিতে একমাত্র নায়িকা চরিত্র শফরী অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। দ্বন্দ্বমথিত প্রেম, হতাশা, হারানোর যন্ত্রণা, পুনর্বীর প্রাপ্তি — অনেকটাই তাকে পরিণত করে তুলেছে। সোমভদ্রের যন্ত্রণাও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বর্ণনা করেছেন — “তাহার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে যে অপরিসীম হতাশা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সোমভদ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল; সে মেরুকার পানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবেগ-স্থূলিত স্বরে বলিল — ‘মেরুকা, তুমি আমার ভগিনী! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।’” সোমভদ্রের এই কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে মেরুকা বলেছে, “তোমাদের দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হয়! আমাদের দেশে হয় না।” স্পষ্টতই দু’টি বিপরীত মুখী সমাজের সংস্কার ও রীতি-নীতির পরিচয় পাই এই গল্পটি পাঠে। এখানেই গল্পটির নতুনত্ব। মেরুকার রূপ সোমভদ্রকে ক্ষণিক আকর্ষণ করলেও শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে। কারণ মেরুকার প্রতি সোমভদ্রের তীব্র আসক্তি যদি থাকতো তাহলে হয়তো সেনাপতি অমোঘভল্লের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেনানী সোমভদ্র মেরুকাকে নিজের করে নিতে তার মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় সোমভদ্রের পিছুটানের মধ্যে দিয়ে। আসলে গল্পকারের ইচ্ছায়ই যেন প্রকটিত হয়েছে এই চরিত্রটিকে অবলম্বন করে।

‘আদিম’ গল্পটির কাহিনীতে গল্পকার অতীতকালের যুগযন্ত্রণা, অস্থিরতা, ক্রীতদাসী প্রথা, নারীদের হরণ, নারীদের ইচ্ছে মতো ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা, বহুভোগ্যা নারীর ভাগ্য বিপর্যয়, রাজান্তঃপুরের অনির্বচনীয় অভব্যতা, অসংযমী পুরুষের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বিষয় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির ‘আদিম’ নামকরণের মধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজ্ঞাত সত্য ও সামাজিক তথ্যের প্রতি। ‘আদিম’ নামকরণ হলেও চরিত্রগুলির মধ্যে আদিমতা, আবিলতা, কামনার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় না বরং প্রকৃত পবিত্র প্রেম-সম্পর্ক ও হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তিই বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। এদিক থেকে ‘আদিম’ শব্দটিকে লেখক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং শব্দটিও তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে।

শরদিন্দুর দুর্বলতা দেখা যায় প্রধানত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি। স্বাভাবিকভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক উপাদানের প্রতিও তাঁর

প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাই। সহজাত সাহিত্য প্রতিভা এবং ইতিহাসের প্রতি আগ্রহে তাঁর অতীতশ্রী বা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কাহিনীতে সেসব বিষয় আশয়ের কথা পাই। উপন্যাসে ইতিহাসের অতীতকে উপস্থিত করা যায় কীভাবে? কীভাবে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়? সে ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা জানা যায়। উপন্যাসিকেরা এজন্য কখনো অতীতকে নিকট এনে বর্ণনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের মাধ্যমে বর্তমান থেকে অতীতে গেছেন। শরদিন্দু এই কৌশলের পাশাপাশি জাতিস্মরতাকে যোগ করলেন। জাতিস্মরতার সুকৌশলী ব্যবহারে অতীতকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তিনি সবচেয়ে সফল। শরদিন্দু ব্যক্তিগত জীবনে জন্মান্তরবাদ, জ্যোতিষচর্চা প্রভৃতি ব্যাপারে আগ্রহ ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর রচিত গল্প ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘রুম্মাহরণ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ প্রভৃতিতে পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা রূপ পেয়েছে। প্রাচীনকালের ধূসর ইতিহাসকে আলোকময় করে তুলেছেন এই প্রকরণ কৌশলের সাহায্যে। এই ধরণের লেখাগুলিতে বর্ণক বা কথক অতীতের কথা স্মরণ করতে পেরেছেন কোন আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে। এটা গল্পে বেশ চমক সৃষ্টি করে। শরদিন্দু তাঁর অনেক গল্পে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ড. নিতাই বসু তাঁর ‘সত্যশ্বেষী শরদিন্দু’ গ্রন্থে বলেছেন — “সর্বাধিক সফল শরদিন্দুর জাতিস্মর-ধারার গল্পগুলো। প্যাশন এখানে প্রেমের ওপর স্পর্ধিত ভঙ্গিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তা নিছক যৌন আবেগ নয়, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন নয়, বাসনার বক্ষোমাঝে চিরবিচিত্র হাহাকার। জন্মান্তরের স্মৃতি, জাতিস্মরের কল্পনা যেন ফ্রেম, যার মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবি বসানো হয়েছে।”

জাতিস্মর-মূলক গল্পে শরদিন্দু মূলত স্বপ্ন, জন্মান্তরবাদ, কোনো সদৃশ বস্তু, কোনো সদৃশ ঘটনা, ছায়াভাস, অবচেতন অনুভূতি, গন্ধ, (গন্ধের মধ্যে দিয়ে যেমন - ‘প্রত্নকেতকী’তে কেতকী ফুলের সুবাসে জাতিস্মরতায় প্রবেশ) ইত্যাদির মাধ্যমে সুদূর ধূসর অতীত জীবনে প্রবেশ করেছেন। জাতিস্মর সম্পর্কে তাঁর ‘অমিতাভ’ গল্পের নায়ক বলেছে— “আমি জাতিস্মর! ছিয়ান্তর টাকার মাহিনার রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শতমহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।” জাতিস্মরতা সম্বন্ধে মানুষের মনে বিশ্বাসবোধের অভাব থাকে আবার বিশ্বাসবোধও থাকে। এরকম অনেক কাহিনীর কথা আমরা শুনি। তাই লেখক প্রথমেই এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের কথা উত্থাপন করে গল্প শুরু করেছেন। তিনি ‘অমিতাভ’ গল্পে আটপৌরে, অল্প শিক্ষিত রেলের কেরানী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। একজন অল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মনে সংস্কারের

প্রতি বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। রেলের কেরানীর পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণের মধ্যে দিয়ে ‘অমিতাভ’ গল্পটির সূত্রপাত। বাংলা গল্প উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ইতিহাসের অনুসঙ্গ ব্যবহার উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হয়েছে। ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা যদি না-ও ধরি, তাহলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসে’র কথা অবশ্যই ধরতে হবে ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসে’র দুটি পর্ব। উক্ত গল্পগুলিতে জন্মান্তর বোধকে আশ্রয় করে তিনি প্রাচীন ভারতের শ্রী ও সভ্যতার একটি রূপ গড়তে চাইলেন। এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে ‘অমিতাভ’ এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। ‘অমিতাভ’ গল্পটি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’-এর (১৩৩৯) অন্তর্ভুক্ত। ‘অমিতাভ’ গল্পটি সম্পর্কে শরদিন্দুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— “অমিতাভ গল্পের মূলে একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই।”

গল্পে শিল্পশ্রীর প্রয়োজনে জন্মান্তর প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু জন্মান্তর তাঁর গল্পের বিষয় নয়। প্রাচীন ভারতের স্বল্পোজ্জ্বল ইতিহাস খণ্ডকে তিনি তাঁর এই গল্পে আলোকিত করে তুলেছেন। গল্পটি মূলত আত্মকথন রীতিতে লেখা। রেলের এক অধস্তন কেরানী গল্পের প্রধান চরিত্র। সে নিজেই কথকের ভূমিকা পালন করেছে। আত্মকথন রীতির আশ্রয়ে গল্পটি আদ্যন্ত পরিবেশিত হয়েছে। রেলের এক কেরানী রেলের পাস পেয়ে রাজগীরে বেড়াতে যায়। রাজগীরের ঘন-জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে কালের যবনিকা সরে গিয়েছিল। কথক অতীত জীবনে প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখেছিল, তা কত বছর আগেকার কথা! দু’হাজার বছর, না তিন হাজার বছর; ঠিক জানে না। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, তখন পৃথিবী আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, ঘাস আরও সবুজ ছিল। কথক তাঁর এই নবজাত দৃষ্টি প্রসঙ্গে নিজেও একটু সন্দেহের ভাব বজায় রেখে গল্প বলতে শুরু করেছে। “আমি জাতিস্মর! হসির কথা নয় কি।” আবার একই ভাবে লিখেছেন “জাতিস্মর! উপহাসের কথা - অবিশ্বাসের কথা!” এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতার মধ্য দিয়ে কথক এবার তাঁর নিশ্চয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন — “তবু আমি বারবার বোধ হয় বহুশতাব্দ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।” রাজগীরের ধ্বংস-স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর পূর্ব জন্মের স্মৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখেও তাঁর পুরোনো দিনের কথা মনে পড়েছে। ঐ শিলাশিল্পটি তাঁরই রচনা। আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হয়েছিল তখন বিহারের শ্রী বাড়ানোর জন্য সে এটি তৈরি করেছিল। আর

তখন তার নাম ছিল পুণ্ডরীক, রাজ সভার প্রধান শিল্পী রাজভাস্কর। জন্মান্তরবাদ তৈরি প্রসঙ্গ ব্যবহারে সেকালের এবং একালের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে— “তখন মানুষ খুব বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতিতুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধকরি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রুরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।” — সম্রাট কণিক্ষের নামটুকু ইতিহাস মাত্র, রাজগীর নামক স্থানটিতে ইতিহাসের ছোঁয়াও আছে। কিন্তু লেখক তাঁর কল্পনা শক্তির জোরে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রগাঢ় উপলব্ধি বশত জাতিস্মরতার কৌশলে দ্বিতীয় পর্বের জন্মান্তরবাদের কথা, সেকালের সামাজিক অবস্থার পরিচয় ও প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

জন্মান্তরের তৃতীয় পদ্ধতির আশ্রয়ে ‘অমিতাভ’ গল্পটির মূল অভিপ্রেত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পকারের ভাষায় — “ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূস্রকুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বছর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি।” দূরাতীতের এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে কথক পূর্বজন্মে দেখেছিল — এ গল্পে তারই স্মৃতিসঞ্চিত হয়েছে। এইভাবে অতীতের কথা বলার বলেই কথক তাঁর বহু পূর্বজীবনের সঞ্চিত স্মৃতির ভিতর থেকে একটি কাহিনি বলতে শুরু করে — এই কাহিনি কথকের কোন এক পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার কথা। সেকথা রাজা অজাতশত্রুর কালের। সে জন্মে কথক শ্রেণিনায়ক ছিল। চারিদিকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য গোপনে একটি দুর্গ নির্মাণ করবার পরিকল্পনা এই কাহিনির পটভূমি। রাজা অজাতশত্রুর কালে রাজকার্য কী গোপনীয়তার আশ্রয়ে করা হত তার কিছু বিস্ময়কর বর্ণনা পাই এখানে। গল্পে শ্রেণিনায়ককে মন্ত্রী দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব পায়। পথে বিভিন্ন ছদ্মবেশে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাই বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের প্রতি মন্ত্রীর অতিশয় বিদ্রোপের কারণ বৌদ্ধরা গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করে নানা দেশে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে। মন্ত্রী বিশেষ করে পাষণ্ডী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে শ্রেণিনায়ককে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছেন।

দুর্গ নির্মাণ-প্রসঙ্গ গল্পটির অন্যতম বিষয়। তার সঙ্গে পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে রাজকার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কবাহিতা। কিন্তু এগুলির কোনোটিই এই গল্পের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পূর্বজীবনের বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার গল্প বলবার জন্যই এই পটভূমি করে আশ্রয় নিয়েছে কথক। কথা বলেছে। গল্পে আদি অন্তের সামঞ্জস্যের অভাব অন্তত সেকথাই

স্মরণ করায় গল্পে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। কেবলমাত্র কথকের পূর্বজীবনের কথায় গল্পের পরিণতিকে স্বীকার করতে হয়। পাশাপাশি আদি অস্তের মধ্যে সামঞ্জস্যের যোগসূত্রও খুঁজব।

গল্পের পরিণতি প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্কে মন্ত্রির সতর্ক থাকবার কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মন্ত্রির কড়া নির্দেশ বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনে হত্যা করতেও বলেন। এই কথাটুকুই যেন পরিণতির দিকে যাওয়ার প্রথম ভিত্তি। একে বলা যেতে পারে পূর্বানুমান (Foregrounding)। যে বিষয়টি গল্পে পরে কথিত হবে -এ তারই পূর্বসূত্র। এই সূত্রটুকু না থাকলে গল্পের পরিণতি একেবারেই শিকড়হীন হয়ে পড়তো।

দুর্গ নির্মাণ করতে যাওয়ার পথে এক গুপ্তচরের দেখা পাওয়া যায়। তাকে দুর্গের নীচে জীবন্ত পুঁতে দেবার কথা হয়। কিন্তু দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করবার সময় দেখা যায় সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই বলির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেই সূত্রেই শিবিরের প্রহরী গুটিকয়েক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে এনে উপস্থিত করে। অমিতাভ বুদ্ধ তাঁদের মধ্যে একজন। বলি সংগ্রহ হয়েছে জেনে শ্রেণিনায়ক তাদের আনতে বলে। কৌপীন বাস ভিক্ষাপাত্রধারী ভিক্ষুদের মধ্যে অমিতাভ গৌতমের মুখের দিকে তাকিয়ে কথকের অন্তরাত্মা যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো সচকিত হয়ে ওঠে। তাঁর মুখকান্তি কথকের সব সতর্কতা ভুলিয়ে দেয়। দেবতার মুখমণ্ডলে যে জ্যোতির্বলয় দেখা যায় তাই সে এই বৃদ্ধের মুখের চারদিকে দেখতে পায়। বুদ্ধের মধ্যে থেকে উঠে আসে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস। অমিতাভের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে সে প্রার্থনা করে

“অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।”

অমিতাভ তাকে ত্রিশরণ গ্রহণ করে গৃহীর ধর্ম পালন করতে বলেন। কথক এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানায় “কীট ছিলাম এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম” অসুর প্রকৃতি দিগ্‌নাগের হৃদয় বিগলিত ওঠে, চক্ষু অশ্রুসজল হয়। আর পাঠক হিশেবে এই অশ্রুজলের পুলকে আমাদেরও চিত্তাকাশও অপূর্ব আনন্দানুভূতিতে উদ্ভিসিত ওঠে।

আগেই বলেছি যে, ‘অমিতাভ’ গল্পের পরিণতি গল্পের আরম্ভের ঘটনার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু এ এক জাতিস্মরের পূর্বজন্মের কথা — সেই হিশেবে একে গ্রহণ করা যায়। গল্পের একটি বিরোধমূলক বিন্যাস এই পরিণতিকে আরো আনন্দময় করে তোলে। মহামন্ত্রি বর্ষকার বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সন্দেহপ্রবণ শ্রেণি নায়ক চিন্তিত। পথে গুপ্তচর ধরা পড়ায় এই সন্দেহ আরও প্রবল হয়েছিল। আর শেষে এই বৌদ্ধদের সম্বন্ধেই শ্রেণিনায়কের সদর্শক অনুভূতিতে গল্পট হয়ে ওঠে সরস ও মনোরম।

অন্যান্য গল্পের মতো গল্পটির মধ্যে একটি ‘মহামুহূর্ত’ বা ‘চরমতম ক্ষণ’ (climax or

pointing finger) রয়েছে। আলোচ্য ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে কাহিনি এবং প্লটের প্রয়োজনে খণ্ড-খণ্ড ভাবের অবতারণা থাকলেও শেষে বিশেষভাব সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এতেই গল্পের গল্পত্ব বজায় রয়েছে। গল্পে বর্ণিত মহামুহূর্তটিকে উল্লেখযোগ্য— “এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাঙ্গা যেন তড়িৎ স্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বৃদ্ধের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনো দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থিরসৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতিম্লিষ্ট, অতিশীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল — “অমিতাভ! অমিতাভ!” গল্পটি পড়ে সমকালীন লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন— “তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে এখনো কাঁদি।”

গল্পটি শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে প্রথম রচনা। এটি ১৯৩০ এ লেখা হয়। এর পরে অন্য গল্পগুলি লেখা হয়েছে। শরদিন্দু অম্নিবাস (আনন্দ) ষষ্ঠ খণ্ডের গল্প পরিচয় অংশে শোভন বসু জানিয়েছেন গল্পগুলি “রচনাকাল অনুসারে সন্নিবিষ্ট।” (পৃ. ৪২৩) এই গল্পটিতে শরদিন্দু প্রথম জাতিস্মরতাকে অবলম্বন করে অতীতের অন্তরে প্রবেশ করবার পথ তৈরি করেছেন। তখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক গল্পগুলি প্রত্যক্ষভাবে সেই কালের পটভূমিতে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’র স্টাইলেই তাদের মূল অবলম্বন। কিন্তু শরদিন্দুর উপন্যাসগুলিতে এই রীতি গৃহীত হলেও গল্পে তিনি ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছেন। ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে সেই রীতির সূত্রপাত। এজন্য পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে তাঁকে এই সব কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। গল্পের প্রথমে এই প্রসঙ্গে নায়কের মুখে তিনি বলিয়েছেন “আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব?” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫) নিজেকে নিয়ে কৌতুকও করেছে গল্পের নায়ক। বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম নিয়ে সন্দেহভঞ্জন করবার কথা বলে আমাদের জাতিগত মনোভাবকেও তিনি খোঁটা দিতে ছাড়েননি। সুতরাং গল্পের নায়ক তার স্মরণে আসা পূর্ব পূর্ব জীবনের কথা মনে রেখেই আমাদের গল্প বলতে শুরু করেছেন। ‘অমিতাভ’ এক জীবনের ঘটনা। ‘মুৎপ্রদীপ’ আর একজীবনের কাহিনি। কাজেই ‘অমিতাভ’ গল্পে কথক যে একাধিক পূর্ব জন্মের কথা বলেছে তাতে সে বোঝাচ্ছে যে জাতিস্মর এবং তার পূর্ব পূর্ব জীবনের কথা সে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের

জন্যে বলেছে। গল্পকারের অভিপ্রায় জাতিস্মরতার মাধ্যমে না জানা অতীতের মধ্যে প্রবেশ করে সে কালের মানুষের জীবন রহস্য উদ্ঘাটন করা। যে ইতিহাস সর্বজনীন তা লেখকের গল্পের ফ্রেম বা পট, আর যে কাহিনি মানুষের গৃঢ় গহণ জীবন রহস্যের—সেই কাহিনি রচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য। ইতিহাস এখানে পট মাত্র—জীবন কাহিনি লেখকের রচনা, কিন্তু সে জীবনকথা অতীতের মানুষের জীবনকথা।

‘অমিতাভ’ গল্পের কথকের জাতিস্মরতার প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করবার পর লেখক তার এক পূর্ব জন্মের তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং গভীর উপলব্ধির কথা বলতে শুরু করেছেন। গল্পে তো মানুষের কোনো অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা বা বোধের কথা বলা হয়ে থাকে। ‘অমিতাভ’ গল্পের কথক তার জীবনের একটি অতিশয় গভীর অভিজ্ঞতা ও অপ্রমেয় উপলব্ধির কথা বলতে এসেছে। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা তার জীবনের মর্মমূলকে পর্যন্ত নাড়িয়ে গেছে—তার জীবনের লক্ষ্য এবং বেঁচে থাকবার অর্থকে পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। সে এই নবজীবন চেতনা বোঝাতে বলেছে “কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮) এই অভিজ্ঞতার শরিক পাঠকও হয়ে পড়ে। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক শরদিন্দুকে লিখেছেন “তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে কেঁদেছি। এখনও কাঁদি। তোমার দিওনাগের মত কেঁদে গলে যেতে চাই পারি না।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, চিঠিপত্র, পৃ. ৪৪৯) অর্থাৎ গল্পের শেষের যে উপলব্ধি তা সচেতন বুদ্ধিমান পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়ে গভীর রেখাপাত করেছে—এ তারই প্রমাণ। এরকম একটি অতিশয় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ‘অমিতাভ’ গল্পের বিষয়। কিন্তু লেখক সুকৌশলী এবং গল্পের গঠনভঙ্গী সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন। তিনি গল্পের প্রথমেই সেকালের গুপ্তচর বহুল রাজধানীতে কীরকম গুপ্ত উপায়ে কার্যোদ্ধার করতে হত তার একটি সুন্দর কৌতূহলোদ্দীপক এবং নাটকীয় পরিচয় দিয়েছেন। আবার রাতে বিশ্রামের সময় কীভাবে গুপ্তচর জলে বিষ দিয়ে সবাইকে মারতে চেয়েছে কীভাবে চাটুবাদের দ্বারা ভণ্ড জ্যোতিষী সেজে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছে তারও সুন্দর বর্ণনা এখানে পাই।

গল্পটিতে প্রথম থেকেই কৌতূহল বজায় রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী গল্পটির ভাষা যথাযথ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন তথা ধ্রুপদী যুগের বর্ণনায় লেখক তৎসম শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সমাসবন্ধপদের প্রয়োগে ভাষার বাধুনি এবং গাভীর্য রক্ষা করেছেন। তাঁর সংস্কৃতানুসারী কাব্যধর্মী ভাষা, প্লটের কারুকলা, ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক উপস্থাপনাও নাটকীয় পরিবেশ রচনা গল্পটিকে এতটাই মনোগ্রাহী করেছে যে এর কোনো দুর্বলতা প্রথমে পাঠকের চোখে পড়ে না। ড. নিতাই

বসুর ‘সত্যশ্বেষী শরদিন্দু’ মন্তব্য প্রণিবানযোগ্য— “শরদিন্দুর কাহিনী স্রোতের গতি ও তীব্রতা, চরিত্র প্রতিষ্ঠা, গল্পের নাটকীয়তা, এমনকি বর্ণনার ছটা ও ঘটনার ঘনঘটা তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে দেয়।”<sup>৬</sup>

‘অমিতাভ’ গল্পটি সম্পর্কে নিতাইবাবুর এই মন্তব্যটি সমর্থনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের ইঙ্গিতপূর্ণ গীতি কবিতার ভাষার সঙ্গে শরদিন্দুর ছোটগল্পের ব্যবহৃত ওজস্বী ও গতিময় ভাষার কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা ছোটগল্পে লেখকেরা মানবজীবনের যে সব জটিল সমস্যার রূপায়ণ করতে চান যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সেখান থেকে অনেকটাই সরে গল্প বলা ও গল্পরস সৃষ্টি করার কাজই তিনি করে গেছেন। তার অর্থ এই নয় যে মানবজীবনের কোনো সমস্যার রূপায়ণ তার গল্পে নেই। তিনি সাধারণ রোমান্সরসের স্রষ্টা। অতীতের ইতিহাস তাঁর এই রোমান্সের জগৎ রচনায় পটভূমি। মানব মানবীর প্রেম, প্রতিহিংসা, শৌর্য ব্যর্থতা বিষাদ—এ সবই তাঁর প্রধান উপকরণ। এর বাইরে তিনি পা বাড়াননি। প্রাচীন ভারতের যে পটভূমিতে তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের উপস্থাপনা হয়েছে সেখানে মানুষের আধুনিক জীবন সমস্যার ছায়াপাত হওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মত হ’ল — “রস সৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮) প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ণতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সমস্যা সংকুল মানব জীবনের রূপায়ণ যে আধুনিক সমাজের পটভূমিতে হচ্ছে তা নিয়ে শরদিন্দুর বিচার হবে না। স্বভাবতই তিনি তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।

যে কালের মানুষ সহজ জীবনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, প্রেম, প্রতিহিংসা, সরলতা, নিষ্ঠুরতা বা ঈর্ষার দ্বারা পরিচালিত হত সেসকল মানুষকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে দেখিয়েছেন। এই গল্পের কথক বলেছে তখন মানুষের মধ্যে ত্রুরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। আমাদের এই গল্পের কথক শ্রেণিনায়ক কুমার দত্ত কিংবা দিগ্‌নাগ, গুপ্তচর রূপগণক এই শ্রেণির মানুষ। দিগ্‌নাগকে কঠোর চরিত্রের মানুষ হিসেবে লেখক চিহ্নিত করেছেন। সে জ্যাস্ত মানুষকে মাটিতে পুঁতে দিতে পারে। তাতে তাঁর স্নায়ুবিকার হয় না।

গল্পের নাম ‘অমিতাভ’। কথক তার এক পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য এ কাহিনি বলতে এসেছেন। অমিতাভকে সে একজন্মে দেখেছিল। এ গল্পে সেই জীবনের কথাই বলা হয়েছে। ‘অমিতাভ’কে নিয়ে সমস্ত গল্পে প্রায় কোনো কথা নেই। শ্রেণিনায়ক কুমার দত্ত কোন পরিস্থিতিতে ক্ষণকালের জন্য অমিতাভকে দেখেছিল, কীভাবে তার জীবন সেই পুণ্য দর্শনে আমূল বদলে

গিয়েছিল দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, নিষ্করণ অসুর প্রকৃতি দিগ্‌নাগও কীরকম গলদশ্ৰু বিকৃত কণ্ঠ হয়ে অমিতাভের শরণ নিয়েছিল—গল্পের শেষে সেই কথা বলা হয়েছে। সমস্ত ঘটনাবলী, এই অমিতাভকে দেখতে পাওয়ার মুহূর্তটির জন্য সাজানো। এমন কি গল্পের প্রথমে মহামন্ত্রি বর্ষকারের উপদেশ (গৌতম পরাবলুক্ক, ধৃত, কপটী) বৌদ্ধদের নির্দয়ভাবে হত্যা করার প্রসঙ্গও অত্যন্ত সচেতনভাবে এসেছে। মাঝের ঘটনাগুলি এই পরিণতির দিকে চলেছে। পথে ভণ্ড জ্যোতিষী-গুপ্তচরের কাহিনিটিও মনোরঞ্জক, উদ্ভেজনা সৃষ্টিকারী এবং প্রয়োজনীয়। সে আত্মহত্যা করার জন্যই নূতন ‘বলি’র প্রয়োজন হয়েছে। বুদ্ধ সহ তাঁর শিষ্যেরা এই অবকাশেই কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। কাজেই গোটা কাহিনির সজ্জাই এই পরিণতির জন্য নিরূপিত। সেদিক থেকে ‘অমিতাভ’ নাম যথার্থ হয়েছে। ‘অমিতাভ’ শব্দের অর্থ ‘যাঁর আভা বা জ্যোতি অমিত’। গল্পের মধ্যে এই আভার উল্লেখ আছে। “এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল।... দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছিল, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮) কথক নিজেই এঁকে দেখে বুঝতে পেরেছেন, তার মুখ দিয়ে একটিই শব্দ উচ্চারিত হয়েছে “অমিতাভ। অমিতাভ।” আবার গল্পের শেষে দেখি কথক এর শরণ নিয়েছেন এবং ত্রিশরণ গ্রহণ করেছেন। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কথক বলেছে—“কীট ছিলাম এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮) সেদিক থেকে গল্পে কোনো আদি অন্ত্যের সামঞ্জস্যহীনতা নেই। গল্পের নাম অমিতাভও যথার্থ।

জাতিস্মর-ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হ’ল ‘বিষকন্যা’। গল্পটি তাঁর বিষকন্যা গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ‘অমিতাভ’ গল্পে লেখক যেভাবে জন্মান্তরের কথা বর্ণনা করেছেন সেভাবে কিন্তু ‘বিষকন্যা’ গল্পে সেই প্রকরণ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য গল্পে যেমন অতীত চারণার জন্য তিনি কোনো একটা উপাদান ব্যবহার করে পূর্ব স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছেন কিন্তু এখানে তেমন করেন নি। গল্পের শেষে তিনি পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—“বহুদূর অতীতের এই বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি — এই জাতিস্মর —কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করি নাই; করিবার প্রয়োজনও নাই। হয়তো বিদূষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, হয়তো রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়াছিলাম, কিংবা হয়তো শৃগালের দংষ্ট্রাক্ষত গণ্ডে বহন করিয়াছিলাম।”

গল্পটি কথকের কোনো পূর্বজন্মের ঘটনা হলেও কাহিনিটি ইতিহাসের পটে স্থাপিত হয়েছে।

শরদিন্দুবাবু জন্মান্তর প্রসঙ্গ ব্যবহার করে অতীত ইতিহাসের সুপ্ত জীবনের উপর ক্ষণিকের আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সেকালের মানুষের জীবন কথার উপস্থাপনা। তাঁর পদ্ধতি পূর্বজন্মের স্মৃতি কণ্ঠয়ণ; আর যে ইতিহাসের উপর কালের যবণিকা পড়ে গেছে তাকে রোমান্সের রঙে রাঙিয়ে তোলা। বহু শতাব্দী পূর্বেকার যে সমস্ত মানুষের জীবন-সূত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে জটিলতা তৈরি করেছিল — ইতিহাস যার কথা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল সেই জীবনের কথা ফিরিয়ে আনা। লেখক যদিও রোমান্স নির্ভর তবু অতীতের জীবন কীরকম ছিল তার সম্ভাব্য বিবরণ তিনি ইতিহাসের অনুসরণ করেই দিতে পেরেছেন।

‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘বিষকন্যা’ গল্পে তিনি অতীত ইতিহাসের রূপ উদ্ঘাটন করেন নি, বরং সেই ইতিহাসের ভিতরে যে মানুষগুলি একদিন জীবন্ত ছিল, যাদের জীবনে সুখ-দুঃখ-প্রেম-বিরহ, হিংসা প্রতিহিংসা প্রবল ছিল, সেই মানুষগুলিকে প্রাণ দান করেছেন। সেই কাল আজ দূরাতীত, মানুষগুলির সেই রূপও মায়াময় কিন্তু কবির কল্পনায় তারা বেঁচে আছে, তারা জীবন্ত তত্ত্বগত দিক থেকে যাকে বলা হয় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ শরদিন্দুর কবি মন। অতীত চিরকালই মানুষের কাছে অস্পষ্ট, রহস্যপূর্ণ — তা যদি আবার ইতিহাসের কালো জ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে তাহলে তার রহস্য আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। রোমান্টিক মন এই অতীতের রোমান্স রসে ডুব দিতে চায়। কিন্তু সেই অতীতের মধ্যে প্রবেশ করবার উপায় কী? যে অতীত-দূর, অনিশ্চিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন; ইতিহাস যে জীবনের রাজবৃত্তের কাহিনিটুকুর সম্মানে ক্লাস্ত সেখানে কবির কল্পনাকে প্রেরণ করা ছাড়া আর রক্তমাংসের জীবন নির্মাণ করবার কোনো উপায় নেই। শরদিন্দু ইতিহাসের পটভূমিতে সেই কল্পনার মায়ালোক সৃষ্টি করে যেন ইতিহাসের জীবনকেই স্পর্শ করেছেন। আর এই ইতিহাসে কল্পনাকে পাঠাবার কৌশল হিশেবে ব্যবহার করেছেন জাতিস্মর প্রসঙ্গ।

বিষকন্যা গল্পের কালপট কথকের অনুসারে “ন্যূনাধিক চব্বিশ শতাব্দী পূর্বের কথা।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৫) গল্পে মগধের মাৎস্যন্যায় পর্বের সুযোগ নিয়ে ইতিহাসে বিস্মৃত, পুরাণে অনুপস্থিত শিশুনাগবংশীয় রাজা অশ্রুতকীর্তি ‘চণ্ড’ ও তার সময়কে দেখানো হয়েছে।

‘বিষকন্যা’ গল্পের প্রধান চরিত্র হিশেবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্কা উপস্থিতি। তার আমৃত্যু পর্যন্ত কাহিনি এই গল্পের বিষয়। গল্পের নামও করা হয়েছে তাকে মনে রেখে। কাহিনির কাল সুদূর অতীতে বিসর্পিত। লক্ষণীয়, চণ্ডকে নিয়ে গল্পের শুরু হয়েছে। লেখকের ইতিহাস-কল্পনা মগধের রাজবৃত্তকেই অবলম্বন করে পরিক্রমা করেছে। রাজ অশ্রুতপুত্রের কথা, রাজ

পারিষদবর্গের ইতিহাসের নাম মাত্র অবলম্বন করে তার ভিতরে স্থাপন করেছেন সে কালের উপযোগী কিছু চরিত্র। চরিত্রগুলি পটভূমির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিষকন্যা ‘উল্কা’, শিবমিশ্র, রাজা চণ্ড, মোরিকা প্রমুখ তার এই কল্পনালোকের চরিত্র।

এ গল্পে চণ্ডের ভূমিকা আংশিক, সে গল্পের সূচনাংশের সঙ্গে যুক্ত এবং পুরাণ-ইতিহাসে তার নাম পাওয়া যায় না। লেখক তাকে শিশুনাগবংশের কোনো মধ্যকালীন রাজা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার নির্ধূর অত্যাচারী চরিত্রের কার্যকলাপ এগুলোর পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্ম দিয়েছে। গল্পে বর্ণিত চণ্ডের রাজ অন্তঃপুরে মোরিকা নামী একজন দাসী চণ্ডের ঔরসজাত একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। জন্মের পর কন্যার ভাগ্য গণনা করে পণ্ডিত দেখলেন এই কন্যা হবে অতিশয় কুলক্ষণা এবং প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী — সাক্ষাৎ “বিষকন্যা।”

এই সূত্রে চণ্ডের দু’টি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে —

প্রথমত, চণ্ড নিজের কথার উপর অন্যের কথা সহিতে পারেন না অর্থাৎ স্বৈরাচারী, স্বরাট। দ্বিতীয়ত, চণ্ড অত্যন্ত নির্ধূর ও হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। মন্ত্রী শিবমিশ্র চণ্ডের মতের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তাই তাঁকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। নির্ধূর চণ্ডের প্রকৃতি জানেন বলেই পণ্ডিত সত্য কথা বলতে ভয় পেয়েছেন। স্পষ্ট কথা বলেই পণ্ডিত সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পিত স্বরে বললেন — “উপস্থিত পিতা-মাতা সকলেরই অনিষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মঙ্গল সপ্তমে ও শনি অষ্টমে থাকিয়া পিতৃস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে।”

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কন্যাটিকে বিষকন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চণ্ড আদেশ দিয়েছেন কন্যাটিকে কন্যার মা নিজেই শ্মশানে পুঁতে দিয়ে আসবে। পণ্ডিত এরূপ নির্ধূর শাস্তিতে শঙ্কিত হয়েছেন কিন্তু মোরিকাকে রাজাদেশ পালন করতেই হয়েছে। চণ্ডের নির্ধূরতায় রাজান্তঃপুরের সকলেই সর্বদা ভয়ার্ত ও কম্পিত।

‘বিষকন্যা’ গল্পটির কাহিনিকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত যথা :

১) প্রথম পর্যায় : চণ্ডের ক্রুরতা ও হৃদয়হীনতার ছবি ফুটে ওঠে। শিবমিশ্রের কঠোর শাস্তি প্রদান ও নিজের ঔরসজাত কন্যা ও কন্যার মাতার নির্ধূর শাস্তি ঘোষণা।

২) দ্বিতীয় পর্যায় : মহাশ্মশানে শিবমিশ্রের সঙ্গে মোরিকার দেখা হওয়ায় ছাড়া পাওয়া। শিবমিশ্রের কন্যাগ্রহণ, রাজ্য ছেড়ে যাওয়া ও মোরিকার মৃত্যু। (লক্ষণীয়, এসব প্রসঙ্গ আদ্যন্ত কাহিনির সংযোগ সেতু রচনা করা)

৩) তৃতীয় পর্যায় : উল্কা ও সেনজিতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, পাঠকের ঔৎসুক্য ও চরমতমক্ষণ ও ক্রম পরিণতি।

‘বিষকন্যা’ গল্পের ক্রিয়ার সূচনায় চণ্ডের ভূমিকা এই পর্যন্ত। এরপর কাহিনিতে চণ্ডের কোনো ভূমিকা নেই। কাহিনির স্থানও মগধ থেকে বৈশালীতে সরে গেছে। কাহিনির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের যোগসূত্র শিবমিশ্র এবং বিষকন্যা। শ্মশানেই শিবমিশ্র তাকে উল্কা নাম দিয়েছে। তারপর মগধ রাজ্য ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী লিচ্ছবিদেশে পলায়ন করেছে। শ্মশানেই মৃত্যু হয়েছে মোরিকার। মোরিকার মৃত্যু এখানে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এরপর দীর্ঘকাল নিঃশব্দে প্রস্তুতি চলেছে। সেখানে শিবমিশ্র প্রতিশোধপরায়ণ পিতা, অস্ত্র বিষকন্যা উল্কা। শিবমিশ্র চরিত্রের নির্মাণে কোথাও যেন চাণক্যের ছায়া লক্ষ করা যায়। শিবমিশ্র চণ্ডের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই উল্কাকে তৈরি করেছে। কিন্তু কাহিনির প্রথম অংশের সঙ্গে শেষ অংশের প্রকৃত ক্রিয়াগত ঐক্য বা Unity of action নেই। প্রথম অংশকে মূল কাহিনির উপক্রমণিকা বলা যেতে পারে মাত্র।

গল্পের শেষাংশটিই মূল উপজীব্য বিষয়। শিবমিশ্র উল্কার জীবন কথা প্রকাশ করে তাকে বৈশালী থেকে মগধে দৌত্যকার্যে পাঠায়। এত অল্প বয়সী যুবতী কোনো নারীকে দৌত্যকর্মে নিয়োগ সেকালের লিচ্ছবি রাজ্যের পক্ষেও সম্ভব কিনা শরদিন্দু সে প্রশ্নে মন দেন নি। তিনি বরং বৈশালীর গণতন্ত্রের কথা মনে করে যে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথাটিকে এর কৈফিয়ৎ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শরদিন্দু কিন্তু উল্কার চরিত্রকে উজ্জ্বল রূপে, সক্রিয়রূপে দেখাতেই এই কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ইতিহাস রোমাঞ্চ রচয়িতার ধর্মই এই যে তিনি সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মানতে চান না। ফলে শিবমিশ্রের সমস্ত পরিকল্পনা উল্কা শুনেছে। পুরুষ চিত্ত জয় করে তাকে হত্যা করা তার পক্ষেও অসম্ভব বলে মনে হয়নি। রোমাঞ্চ রসের রচনাগুলির মধ্যে চরিত্র রচনা অপেক্ষা কাহিনি রচনার কৌশলই গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শী উল্কার পক্ষে একাজ যে কত দুরূহ তা লেখক বা মন্ত্রী শিবমিশ্র কেউই ভাবেন নি। উল্কাও নয়। রাজা সেনজিতের হৃদয় জয় করা এবং তার কণ্ঠলগ্না হওয়া উল্কার পক্ষে সহজ ব্যাপার। তারা কেউই একাজের গুরুত্ব ভেবে দেখেননি — অসফল হওয়ার সম্ভাব্য দিক প্রশ্নের মধ্যেই আনেন নি। উল্কা অসংকোচে প্রশ্ন করেছে ‘কবে যেতে হবে’? আর শিবমিশ্র উত্তরে বলেছেন আগামীকাল তোমার যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্কার মতামতের প্রয়োজন হয়নি। ফলে কাহিনির মধ্যে জটিলতা আসেনি। সব ঘটনাই সরল সহজ এবং ঋজু গতিতে বয়ে চলেছে। ষোড়শী উল্কার কথায়— সে ‘বিষকন্যা’ — এই টুকু মাত্র নয়। সে একাকী চলতে সমর্থ। সেকালের রাজপথে দস্যু তস্কর এবং নানা শ্রেণীর সৎ-অসৎ মানুষের অভাব ছিল না। কিন্তু উল্কা সঙ্গী সহচরদের অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী বনপথে যাত্রা

করেছে। যেন বনপথ কেবল কুসুমাস্তীর্ণ। উল্কা বলেছে “আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।” সাজসজ্জাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই উপযুক্ত। সে যে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ তার প্রমাণ হিসেবে অশ্বারোহী এক বনরক্ষীর সঙ্গে তার কথায় এবং আচরণে লেখক প্রমাণ দিয়েছেন। এবং আমাদের মনে যেটুকু সন্দেহের দাগ দেখা দিয়েছিল তাও মুছে ফেলে সাহসিকা উল্কাকে রোমান্সের নায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উল্কা সাহসিকা। আর সাহসিকা বলেই তার পক্ষেই এই অভিযান সম্ভব হয়েছে। সাধারণ আটপৌরে নারীর সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না।

উল্কার বক্ষে ধর্ম, পাশে তরবারি, কটিতে খুরিকা, পৃষ্ঠে সংসর্পিত কৃষ্ণবেণী; কর্ণে মাণিক্যের অবতংস অঙ্গারের মত জ্বলছে। এ বর্ণনা বীরঙ্গনার নয় রোমান্সের নায়িকার। সে একাধারে অল্পশব্দে সজ্জিত কিন্তু শব্দ অপেক্ষা কটাক্ষেই মোহিত করতে বেশি আগ্রহী। উল্কা কীভাবে অতি সহজে সবার দৃষ্টির অলক্ষে চণ্ডকে বধ করে—তার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। রাজা চণ্ড হাত-পা হীন কুৎসিত মানুষ এমনকি লোক চক্ষেও নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু রাজ প্রাসাদের সম্মুখে চণ্ডকে নিঃশব্দে হত্যা করাও যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদক। উল্কার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎও যথেষ্ট চিত্তোন্মোদকারী। রাজসভা বর্ণনায় শরদিন্দু সব সময়ই কৌতুকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা সেনজিৎ মধ্যাহ্নে অলসভাবে বয়স্যদের সঙ্গে বিদূষকের স্থূল রসিকতা শুনে সময় কাটাচ্ছিলেন। এ রীতি সংস্কৃত কাব্য নাটকের রীতি। উল্কার সঙ্গে প্রথম দেখাতে রাজার মনেও কৌতূহল দেখা দেয় এবং বিদূষকের সঙ্গে তার আচরণও যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বলেই সন্দেহ জাগে।

রাজা সেনজিৎ ও উল্কার পূর্ব রাগের সূত্রপাত মূলত—রাজহস্তী পুঙ্করের ক্ষেপে যাওয়া ও রাজা সেনজিতের দ্বারা প্রচণ্ড মদমত্ত উদ্যতশুণ্ড উন্মত্ত হাতিটিকে শাস্ত ও সংযত করার কাহিনিকে ঘিরে। গল্পকারের বর্ণনায় — “কয়েক মুহূর্তমধ্যে ধ্বংসের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবনমূগে পরিণত হইল।” এই মুহূর্তটি — ‘উল্কার মনে গভীর রেখাপাত করিল।’ তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রেম এগিয়েছে শুকপাখি বিশ্বোষ্ঠকে আশ্রয় করে। বিশ্বোষ্ঠ রাজার দেওয়া নাম। সেই পাখিটি পক্ষীশালা থেকে আমলকী গাছে উড়ে এসে বসেছে। তাকে পুনরায় বাকে আনবার জন্য রাজা বেরিয়েছেন। উল্কা রাজাকে অস্তঃপুরে আসতে দেখে নিজেও এসেছে এবং শুক পাখিটিকে পাকরাও করেছে। পক্ষীটির নখের কয়েকটা আঁচড় রাজার গায়ে লাগে। তাতে উল্কা আকস্মিক ভাবে রাজার কাছে গিয়ে মুখ দিয়ে সে বিষ তুলে ফেলে দেয়। এখানে স্মরণে আসে আধুনিক নায়ক-নায়িকা সমব্যথী হওয়ার ঘটনা— “দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর তাহার কোমল অধরপল্লব স্থাপন করিল।” এ একটা সুযোগে উল্কা রাজার খুব কাছে চলে আসে। কিন্তু রাজা এতে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। মনে হয় উল্কার প্রতি তাঁর গোপন প্রণয়ের কথা

তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি নিজেকে সংযত করে ফিরে যান। লেখক উভয়ের প্রণয়াকর্ষণ দেখাবার জন্য দু'টি কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন— এক. রাজহস্তী পুঙ্কর এবং দুই. রাজপক্ষী বিষ্মোষ্টের কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক তাঁদের প্রণয়ের পূর্বাভাস দিয়েছেন এভাবে — “দুই পক্ষী কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিল। তারপর বিষ্মোষ্ঠ অবজ্ঞা সূচক একটা শব্দ করিয়া উষ্কার কর্ণবিলম্বী রক্তবর্ণ কুরুবক-মুকুলে চপুঃ বসাইয়া টান দিল।” এখানে উষ্কার পক্ষীধরার কাহিনির আড়ালে আছে রাজা সেনজিতকেই নিজের আয়ত্তে আনার ঘটনা। পক্ষীমিলনের পাশাপাশি লেখক নারী-পুরুষের প্রেম-প্রণয় ও মিলনই কাম্য লেখকের।

মহারাজ সেন জিতের ছিল অদম্য সংযম ও কঠোরতা। নিজ কর্তব্যে অটল মানুষ। তাই মহারাজ সেনজিৎ আত্মবিস্মৃতি জয় করে কঠোর সংযমের শাসনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। সেনজিতের আত্মসংযম হওয়ার পেছনে একটিমাত্র পূর্ব নির্দিষ্ট রূপক পাওয়া যায়। সে পুঙ্করকে বশ করবার কাহিনি। পুঙ্কর এখানে রাজচিন্তের প্রতীক রূপ। সেই চিত্ত উষ্কারে দেখে ভিতরে ভিতরে মদ বিহুল এবং অসংযত হয়ে পড়েছে। তারই ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপনা দেখি প্রমত্ত পুঙ্করের ঘটনাটিতে। রাজা নিজের সেই সংযমহীন মনকে এভাবেই বশে এনেছেন। কঠোর সংযমের দিনে রাজার মনে যে উৎকর্ষা তার কিছু পরিচয় এতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে জানা যায় উষ্কা কোনো কুটিল উদ্দেশ্যে মগধে এসেছে। তার রূপমোহে আত্মলীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রাজা সেনজিৎ দোটানায় পড়েন। তাঁর সরল সুখ ও মুখের প্রসন্ন হাসি এক নিমেষে উঠে যায়। তার উৎকর্ষা বেড়ে যায়, পাঠকদের সঙ্গ তার পছন্দ হয় না। তিনি বসন্ত উৎসবের রাতে অজ্ঞাত সস্তাপের আগুন বুকে নিয়ে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে বৈশালী নন্দিনীর উগ্রআহ্বান তার বুকে এসে ধাক্কা লাগে। উষ্কা কণ্ঠে গান শোনা যায় তাতেও পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেনজিতের প্রতি তার প্রেমানুরাগ। অভিমানহতা নারীর আত্মধিকৃত এই সঙ্গীত সেনজিৎ ও উষ্কার যুগপৎ অনুরাগ ও হৃদয় যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেনজিৎ পৌরুষদীপ্ত বজ্র কঠিন কিন্তু উষ্কার প্রণয়ে তা কীভাবে তরল হ'ল এবং নারীর প্রেমের স্পর্শে কঠিন অর্গল ভেঙে নারীর প্রেমে ধরা দিল—এই বিষয়টিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

আধুনিক ছোটগল্পের বাস্তবধর্মিতার দিক থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিষকন্যা’ (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) গল্পটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে না। এখানে গল্পকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছে গল্পে বর্ণিত রমণীয় ঘটনা। কাহিনির পরিসর এখানে সুদীর্ঘকালের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করেছে।

কথাসাহিত্য সত্তারে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গল্পটির নাম উল্লেখ করা অসমীচীন হবে

না। অনাবিল প্রেমের গল্পও বলা যায়। কারণ লেখক এখানে জাতিস্মর, ইতিহাস, প্রতিহিংসা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও উস্কা-সেনজিতের প্রণয় ও তার পরিণতির 'ট্র্যাজিক' মহিমাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। সংক্ষিপ্ত সময় পটে একটি ঘটনার একমুখী বর্ণনার পরিবর্তে এখানে কাহিনি স্পষ্টত দুটি কালপটে দুইশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর জীবনাশ্রয়ী হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। শরদিন্দুর গল্পে একমুখী কাহিনি বিন্যাসের উদাহরণ অনেক আছে। 'চুয়াচন্দন' তার একটি উদাহরণ। কিন্তু 'বিষকন্যা' গল্পে লেখক অতীত ইতিহাসের একটি পর্বকে জীবন্ত করে তুলেছেন। রাজপরিবার কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্র, অত্যাচারী রাজাদের জীবনযাপন প্রণালী সেকালের রাজ অন্তঃপুরের পরিস্থিতি, রাজন্যবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির উত্থান এবং সর্বোপরি অত্যাচারীর হাতে পীড়িতের প্রতিশোধ স্পৃহা এগল্পে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সবই ঘটেছে কাহিনির মনোরম উপস্থাপনা কৌশলে এবং দূর ইতিহাসের পটভূমিতে। লেখক যেন সেই অতীত ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকার অন্তরাল ঈসৎ উন্মোচিত করে সেকালের জীবনের নানা বিড়ম্বনাকে একালের মানুষের চোখে কিঞ্চিৎ মায়াময় করে উপস্থিত করেছেন। কাহিনির মূল লক্ষ্য প্রতিশোধ স্পৃহা; চণ্ডের ঔরসে যে বিষকন্যার জন্ম সেই চণ্ডবংশকে সমূলে উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেই প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রতিশোধের নির্ধূরতা অপেক্ষা প্রেমের লাভণ্যময়তা এ গল্পে অধিক মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। বিষকন্যা উস্কার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তা চরিতার্থতার উপায় সেনজিতের সঙ্গে প্রণয় পাশে আবদ্ধ হওয়ার ভান করা। সেকালে বিষকন্যারা একালের গুণ্ডচর বিদ্যায় পারদর্শী 'মাতাহারি'দের প্রাচীন রূপ। সম্ভাব্য এভাবেই তারা লক্ষ্য সাধন করত। লেখক সেই কাহিনির একটি সম্ভাব্য পরিণতি এ গল্পে তুলে ধরেছেন। চণ্ড অত্যাচারী রাজা। প্রজাশক্তির হাতে তার যে শাস্তি হয়েছে তাও সেই সাধারণ মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহার একটি অভিব্যক্তি মাত্র।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা, রূপ এবং শ্রেণি নির্ণয় বিষয়ে আলোচ্য গল্পটির যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভবপর কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

গল্পটির কাহিনিতে দেখা যায়—

কমপক্ষে চতুর্বিংশ শতাব্দী পূর্বের মগধের রাজবংশের কথা, রাজান্তঃপুরের নর-নারীর প্রেম-প্রণয়-ভালোবাসা-ঈর্ষ্যা, প্রতিহিংসা, সিংহাসন দখলের লড়াই প্রভৃতি ঘটনা ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক। শুধু ইতিহাস নয়, কল্পনার আশ্রয়ে কাহিনি নির্মাণ বিষয়টিও উঠে এসেছে।

'বিষকন্যা' গল্পটি উস্কার ট্র্যাজিডি সংক্রান্ত। প্রচণ্ড উগ্রস্বভাব, প্রচণ্ড, প্রমত্ত রাজা চণ্ডের কন্যা জন্ম মোরিকা নামক এক দাসীর। ভাগ্য গণনায় ভাগ্য ফল হ'ল— এই কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের সাক্ষাৎ অনিষ্টকারিণী, বিষকন্যার রূপ তার রক্তের বীজানুতে।

পাণ্ডিত মুখে ভাগ্যফল নির্ধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা চণ্ড দৈব বিপদের আশঙ্কায় মাতা ও বিষকন্যাকে বিসর্জন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। তদুপরি চণ্ড এতটাই নিষ্ঠুর যে, জন্মদাত্রী মায়ের হাতেই বিষকন্যাকে পুঁতে ফেলবার আদেশ দেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, বেহার (বর্তমান কুচবিহার) (১৪৪০-১৪৯৮) মন্ত্রীপুত্র মনোহর ও রাণী বনমালার গোপন প্রণয় সম্পর্কে রাজা কামতেশ্বর ঘোষণার কথা—

“ডেরু সহিত চোর নইল অন্দর।

রক্ষন করহ চোর কহে কান্তেশ্বর।।

বনমালাক কহে পাক কর য়েইক্ষণ।

চমৎকার হইয়া রাণী ভাবে মনে মন।।

নারীর পীড়িত দ্যেখ জীবন নিঃস্বফল।

ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী মঙ্গল।।

(রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, গোসানীমঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৪, সম্পাদনা -  
শ্রীহরিশচন্দ্র পাল, পৃ. ৯১)

অর্থাৎ অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত রাণীকে দিয়েই তার প্রেমিককে রেঁধে খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এরকম পাশবিক ঘটনা শুধু আমাদের ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশেও এই রকম ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—গ্রীক দেশের নাট্যকার ইসকাইলাসের ‘আগামেমনন’ নাটকটিতে দেখা যায় থুয়েস্তস্কে নিজের পুত্রের মাংস খাওয়ানোর ঘটনা। এমনকি ল্যাটিন ও গ্রীকদেশের বহু পৌরাণিক কাহিনীতে এসব ঘটনার কথা জানা যায়। আসলে রাজ আমলে এসব ঘটনা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাই তাদের কাছে এরূপ ঘটনা তুচ্ছ মনে হয়। যখন তখন বিনা দ্বিধায় এ ধরনের নির্দেশ বা ঘোষণা অন্তত তাই মনে করায়। সুতরাং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকুকে কাজে লাগিয়ে পুরাণে অনুল্লিখিত রাজা চণ্ডের চরিত্র ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের তত্ত্বে এঁকেছেন।

রাজা চণ্ডের হাতে লাঞ্চিত শিবমিশ্র সেই বিষকন্যাকে উদ্ধার করে লিচ্ছবি দেশে শ্মশান থেকে পালিয়ে যান। সেখানে মহাসচিব পদ গ্রহণ করে শিবমিশ্র রাজা চণ্ডের দুর্ব্যবহার ও প্রতাপ-দমনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিষকন্যাকে (শিবমিশ্রের প্রদেয় নাম উল্কা) চতুষ্টিকলাসহ ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। উপযুক্ত সময়ে উল্কাকে শিবমিশ্র নিজের এবং তার মা মোরিকার লাঞ্চিত ও প্রচণ্ড উৎপীড়নের কথা জানিয়ে উল্কার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালান। কালচক্রে রাজা চণ্ডের অত্যাচারে জর্জরিত প্রজারা বিদ্রোহ করে রাজা চণ্ডকে জগুঘা পর্যন্ত হাত-

পা কেটে সিংহাসনচ্যুত করে তোরণ পার্শ্বস্থ প্রাচীরের গায়ে এবং শিশুনাগবংশীয় উত্তর পুরুষ সেনজিৎকে চণ্ডের পরিবর্তে মগধের সিংহাসনে বসান। শিবমিশ্রের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য উষ্কা মগধের উদ্দেশ্যে রহনা দেয়। প্রথমে মৃগয়া কাননের রক্ষীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে এবং পরে হস্ত পদহীন বন্দী চণ্ডকে নির্দিধায় হত্যা করে উষ্কার মতোই মগধের রাজাস্তঃপুরে প্রবেশ করে। অন্যদিকে শিবমিশ্রের যে অভিসন্ধি ছিল ‘কন্টকে নৈব কন্টকম্’ তা বাস্তবরূপ পেল না। কারণ উষ্কার চরিত্রের অভূতপূর্ব পরিবর্তন তথা মানসিক বিবর্তন। প্রতিশোধের অস্ত্রে দীক্ষিত উষ্কা সেনাজিতের প্রণয় মস্ত্রে দীক্ষা নিল। ভুলে যান শিবমিশ্রের কথা, ভুলে গেল প্রতিহিংসার কথা; প্রেম তার বড় পরিপন্থী সেখানে প্রতিহিংসার পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয়। আস্তে আস্তে রাজা সেনজিতও উষ্কার প্রণয়ে হাবুড়ুবু খেল। কিন্তু উষ্কার অন্তরে যে যন্ত্রণা কঠিন শিলার মতো চেপে বসে আছে সে কথা সে ভুলতে পারছে না। সে বিষকন্যা। তার স্পর্শে প্রেমিকের অমঙ্গল অনিবার্য তাই সে শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের মঙ্গলার্থে নিজের জীবনকেই বলি দিয়েছে। এখানেই চরিত্রটি সার্থক ট্রাজিক মহিমায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ‘মৃৎপ্রদীপ’ গল্পের সোমদত্তার সঙ্গে উষ্কার তুলনা চলে।

বলা যায়, বিপ্রতীপতার নিরিখে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বকেই গল্পকার চরিত্র দুটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

জন্মান্তর প্রসঙ্গ ইতিহাসের স্থাননাম, প্রতিবেশ, চরিত্র প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লেখে গল্পটি ইতিহাসাশ্রিত গল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সর্বোপরি, “বিষকন্যা” গল্পটিকে প্রেমের গল্প বললেও অত্যাঙ্কি হবে না।

ঘটনাশ্রয়ী এই গল্পটিতে ছোটগল্পের শর্তগুলি যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি ‘মহামুহূর্ত’ বা ‘চরমতমক্ষণ’ (climax) সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য ‘বিষকন্যা’ গল্পটিতে লেখক ‘মহামুহূর্ত’ সৃষ্টিতে ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনাধর্মীতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

“দীপের তৈল ফুরাইয়া আসিতেছে; আকাশে চন্দ্রও ক্ষয়িষুঃ। বিষকন্যা উষ্কার বিষদধ্ব কাহিনী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

নিশীথ প্রহরে মহারাজ আসিলেন। উষ্কা পুষ্প-বিকীর্ণ বাসক গৃহের মধ্যস্থলে একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হস্তে একগুচ্ছ কমল-কোরক।

সেনজিৎ তাহাকে দুই বাছ দিয়া জড়াইয়া লইলেন। কমল-কোরকের গুচ্ছ উভয় বক্ষের মাঝখানে রহিল।

‘উষ্কা’ — প্রাণময়ি —’ বিপুল আবেগে উষ্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া

ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন — আনন্দ-বেদনা।

উল্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল — ‘প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনভাবে আমায় মরিতে দাও।’

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণ মিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি বারিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ-নিষ্পেক্ষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সেনজিৎ উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিলেন —

‘উল্কা! সর্বনাশী! একি করিলি? ... উল্কার মুখের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া

আসিল, চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল; — সে অতিক্ষীণ নির্বাপিত স্বরে বলিল — ‘প্রাণাধিক, আমি বিষকন্যা — ’

গল্পটি আধুনিক ছোটগল্পের ছাঁচে ফেললে আধুনিক পাঠক হয়তো হাল আমলের আধুনিক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন না তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে, ছোটগল্পের আবেদনের দিক থেকে ‘বিষকন্যা’ গল্পটি পাঠকের কাছে আধুনিক ছোটগল্পরূপেই ধরা দেবে। ঘটনার ঘনঘটা, অতিরঞ্জিত ভাব-প্রকাশ, কাহিনির সুবিস্তৃত পট গল্পটির একমুখিনতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ করলেও গল্পটির ভাবের যে ঐক্য অর্থাৎ সারকিট আইডিয়া ভাষার জাদুতে তা রক্ষা পেয়েছে। কথাকার গল্পটি বর্ণনায় বিবৃতিমূলকতার পাশাপাশি ইঙ্গিতের (Suggestiveness) সাহায্য নিয়েছেন। তাই ভাষা হয়ে উঠেছে ভাব-প্রকাশের যথোপযুক্ত মাধ্যম — যা গল্পখানিকে সার্থক পরিণতির দিকে তরতর করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এছাড়াও প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক যে তৎসমবহুল, সংস্কৃত মূলক ভাষা-ব্যবহার করেছেন তা ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষাকেই মনে করায়।

কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের অনেকটা অতিবাহিত করেছিলেন সময়ই উত্তর-প্রদেশের জৌনপুরে এবং বিহারের মুঙ্গেরের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বলা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ইতিহাস, আধ্যাত্মিক জীবন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর কৌতূহল। এই ইতিহাস ঘেঁষা বিষয়গুলি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় স্থান করে নিয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রতিবেশ তৈরি করেছিলেন। ‘বিষকন্যা’ গল্পটিতেও মগধের শিশুনাগবংশের ইতিহাস এবং সমসাময়িক কাল, পাত্র-পাত্রী প্রভৃতি বিষয় জায়গা করে নিয়েছে।

এই গল্পটি রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি গল্পকার কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন। চণ্ড-মোরিকা মিলনের ফসল হ’ল বিষকন্যা। চণ্ড-মোরিকা-বিষকন্যা উল্কা লেখকের কল্পনা প্রসূত। বিষকন্যাকে কেন্দ্র করেই গল্পের অভিমুখ তৈরি হয়েছে। বিষকন্যা প্রকৃত অর্থে বিষকন্যা কিনা তা

গল্প পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাসচিব শিবমিশ্রের প্রচেষ্টায় উল্কা পিতৃহস্তারক হয়ে উঠেছিল। জিঘাংসাবৃত্তি তার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন শিবমিশ্র। উল্কা প্রকৃত বিষকন্যা কিনা তার প্রমাণ গল্পে নেই। কন্যার ভাগ্য গণনা করে তাকে বিষকন্যা বলা হলেও আমরা তার সেরকম ভূমিকা লক্ষ্য করি না। মগধের রাজাস্তম্ভপুত্র প্রবেশ করে উল্কা যেন বিষকন্যা থেকে নবজন্ম লাভ করেছে। কারণ, যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উল্কা এসেছে— তা আর নেওয়া হয়নি। উল্কার মনে রাজা সেনজিতের প্রতি প্রেমানুরাগ জন্মেছিল। আর সে অনুরাগ ছলনা ছিল না। তাই সেনজিতকে সে হত্যা করতে পারে নি—নিজেই প্রেমের টানে ধরা দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলো। বলা যায়, উল্কা বিষকন্যা নয়, কারণ, আমরা বলতে পারি কোনো শিশুই বিষকন্যা হয়ে জন্মায় না। আর উল্কার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাই-ই প্রমাণিত হয়েছে।

‘বিষকন্যা’ মূলত গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সেতু’ (১৭ই চৈত্র ১৩৪৩) গল্পটির পটভূমি প্রাচীন ভারতবর্ষের বৃক শকজাতির বর্বরতা ও উদামতার কালপর্ব। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে কল্পিত এই গল্পটির সময়সীমা। কুশানযুগের শকবাহিনীর একজন সৈনিক তথা পত্তিনায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল ও উজ্জয়িনীর প্রখ্যাত শস্ত্রশিল্পী বৃদ্ধ তপুর্ মধ্য রঞ্জা নামী এক উদ্ভিন্নযৌবনা, পরমাসুন্দরী ও কুহকিনী নারীকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে অসিযুদ্ধের অবতারণা। গল্পটির আখ্যান বস্তুর দিকে নজর দিলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ‘সেতু’ গল্পটিতে একইসঙ্গে তিনটি বিষয় বর্ণিত আসা হয়েছে—

এক. অতীতের বর্ণনাময় জীবন, কামনা ও শক্তির দ্বন্দ্ব

দুই. অতীত ও বর্তমান জীবনের মধ্যে জন্মান্তরের সেতু রচনা

তিন. নারীর প্রতি আকর্ষণ, নারীহরণ ও নারীর জন্য লড়াই

দুই জীবনের সেতু রচনার জন্যই গল্পের নাম ‘সেতু’। এখানে গল্পের জোর এই সংযোগসূত্রের উপরে; এর ভিতরে আছে এক কামনাতাড়িত প্রেম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনি। শরদিন্দুর গল্পে প্রেম সবসময় বর্ণোজ্জ্বল এবং বাসনা বিভোল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনো সন্তোগ বাসনা-দীপ্ত কখনো সর্পিলা শীতল এবং ত্রুর। ‘রুমাহরণ’ গল্পে দুই নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সরাসরি নারীর অধিকার লাভের লক্ষ্য নিয়ে দুই প্রতিযোগী সমর। ‘সেতু’ গল্পে প্রেম অসম্পূর্ণ, কেবল বাসনা বিহুল পুরুষ নারীর রূপমাধুরীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ। নারীর কামনার উত্তাপ সম্পূর্ণ রূপে ধরা দেয়নি। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত ত্রুর এবং অনুজু। তপুর্ স্ত্রী রঞ্জার মোহিনী রূপের প্রতি অহিদত্তের যে বাসনাতাড়িত আকর্ষণ তারই ফলস্বরূপ তপুর্ অস্ত্র অহিদত্তকে হত্যা করে। এই কামনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে রয়েছে জন্মান্তরের কথা প্রসঙ্গ। এই অহিদত্তই দু’হাজার বছর পরে পুনরায়

জন্মগ্রহণ করেছে আজ থেকে ৩৫ বছর পূর্বে। হাল আমলে সে বিজ্ঞানের গবেষক — পুনর্জন্মে তার বিশ্বাস হয় না—আবার মানতে বাধ্যও হতে হয়। দুই জন্মের সেতুবন্ধন বর্ণনাই গল্পটির মূল উপজীব্য। লেখকের ‘সেতু’ গল্পটি ছাড়াও ‘রুমাহরণে’র মতো গল্পেও তিব্বিকে করায়ত্ত করবার জন্য দুই বলশালী পুরুষ গাফা ও ছড়ার লড়াই দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত এই নারীকে পাওয়ার লড়াই বিদ্যমান। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা বলশালী পুরুষেরাই নারীর ধারক ও বাহক। সুকৌশলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিস্মরতার সূত্র ধরে অতীতযুগকে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগসূত্রে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। জাতিস্মর-জাতীয় গল্পগুলিতে কথাকার নানা পথে জাতিস্মরতায় প্রবেশ করেছেন। আলোচ্য ‘সেতু’ গল্পটিতে তিনি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে জন্মান্তরে প্রবেশ করে পয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার জীবন-বৃত্তান্তের কথা জানতে পেরেছেন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের মায়াঘোরে। প্রাচীনকালের সঙ্গে নবীকালের সংযোগসূত্র তৈরি করতে তিনি স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দুই কালের সুদূর ব্যবধানকে ‘স্বপ্ন-সেতু’ দিয়ে গেঁথেছেন। কথাকারের ভাষায়— “হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল ... পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, ‘লিখে রাখ, ওরা চৈত্র ১ টা ১৭ মিনিটে জন্ম...’ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু, লালসাময়ী রঞ্জা — একি স্বপ্ন? না আমারই মগ্ন চেতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত! পূর্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? মৃত্যু জানি, কিন্তু সেইখানেই তো সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে শুরু ধরিয়া নূতন কোনো জীবন আরম্ভ হয় নাকি?” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯০)

কথকের স্বপ্ন দেখাটা কতটা বাস্তব সম্মত, কতটা অবাস্তব কতটা তার সম্বন্ধে সে নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত কারণ, স্বপ্নটা হ’ল মৃত্যু থেকে পুনরায় জন্ম লাভ করা। এই গল্পে সে একজন বিজ্ঞানী তবু যে স্পষ্টভাবে স্বপ্নটা দেখা দেয় তাতে অস্বীকার করার কিছু থাকে না। কারণ বিজ্ঞানীর বস্তুমুখ্য দৃষ্টিভঙ্গি এই জন্মান্তর প্রসঙ্গ বিশ্বাস করে না। মানুষের এই জন্ম-মৃত্যু; মৃত্যু -জন্ম প্রক্রিয়াকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক — “বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ — ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিশ্বরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন এই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।”

যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি অলীক কল্পনার ধার ধারে না। এই গল্পে বক্তা স্বয়ং বৈজ্ঞানিক। আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলে কিনা, এই বিষয় নিয়ে গত তিন বৎসর ধরে তিনি গবেষণা চালাচ্ছেন।

কঠিন পরিশ্রমে সে সেই গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। মুক্ত মনে ঘুমোতে ঘুমোতে জন্মান্তরের স্মৃতি ভেবে উঠেছে। আত্মকথন পরিস্থিতির ভঙ্গিতে লেখক গল্পটি বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু গল্পটির সূচনাংশে ও শেষাংশে মধ্যম পুরুষবাচক কথনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পটিতে কথক অহিদত্ত রঞ্জুল, অসিধাবক তণ্ডু এবং তণ্ডুর যুবতী পত্নী লালসাময়ী রঞ্জা। শব্দশিল্পী তণ্ডু বৃদ্ধ অথচ অসিচালনায় এখনো সে অতীব দক্ষ। কথাকারের ভাষায় — “অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাঁহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নিবীৰ্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।”

বৃদ্ধদের সুন্দরী তরুণী রমণীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছে পরপুরুষেরা। অপরপক্ষে ঐ মোহিনী নারীরাও পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। আলোচ্য ‘সেতু’ গল্পটিতেও সেই সত্য লক্ষণীয়। অহিদত্ত রঞ্জুল বৃদ্ধ তণ্ডুর লালসাময়ী স্ত্রী রঞ্জার প্রেমাকর্ষণে ধরা দিয়েছে। আর সেই ঘটনাকে ঘিরে বৃদ্ধের সঙ্গে পত্তিনায়ক যুবক অহিদত্তের অসি-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাস্তবিকই যুগ যুগান্তরের সূত্র ধরে খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে তা আজও বহমান। শরদিন্দুবাবু কৌলিন্য প্রথার ইঙ্গিত দিয়ে প্রবৃত্তিতাড়িত অসংযত পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই রূপ দিয়েছেন জাতিস্মরণ প্রকরণ কৌশলের আশ্রয়ে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত গল্পের মতো ‘সেতু’ গল্পটিতেও অতীতের প্রেক্ষাপটকে বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে বাস্তব-অবাস্তবের মায়ালোক রচনা করেছেন। নারীকে নিয়ে পুরুষের মদমত্ততা, আকর্ষণ, রপাসক্তি, চিত্তচাঞ্চল্যকর অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য ‘সেতু’ গল্পটিতে। প্রণয় বিলাসিনী রমণীর আকাঙ্ক্ষা ও ভোগাসক্তির অতৃপ্ত বাসনালোকের রূপ নির্মাণ গল্পটি অন্য একটি দিক। শুধুমাত্র ‘সেতু’তেই নয় তাঁর বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পে নারীদের এরকম ভূমিকায় দেখা যায়। বলাবাহুল্য, প্রকরণগত কৌশল-স্বাতন্ত্র্যের জন্যই ‘সেতু’ গল্পটি উৎকৃষ্ট গল্প। কথক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে জাতিস্মরণতায় প্রবেশ করে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। পূর্বজীবনে তার নাম ছিল অহিদত্ত রঞ্জুল। তিনি একজন শকজাতির পত্তিনায়ক, সেনাপতি। তণ্ডুর যুবতী স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কারণে তণ্ডুর হাতে মারা যাওয়ার পর তার দেহমুক্ত আত্মার বিচরণকে কেন্দ্র করে প্রেতলোক ও মর্তলোকের যে কাঙ্ক্ষনিক সংযোগ-সেতু কল্পনা করেছেন তা এককথায় অবিস্মরণীয়। লোকোত্তর ভুবনে যাত্রার পর পুনরায় মর্তলোকে আগমনের বিষয়টির প্রাঞ্জল বর্ণনাও পাঠককের ঔৎসুক্য বাড়ায়।

নারী-পুরুষের আমোদ-প্রোমদের বর্ণনায় ‘বসন্ত-উৎসবে’র আয়োজন নারী-পুরুষের চিত্তে

প্রেম বিহীনতা ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগায়। প্রকৃতির পটভূমিকায় তা সত্যিই অনবদ্য। প্রকৃতি যেন উদ্দীপন বিভাব, নারী-পুরুষ আলম্বন বিভাব, নারী-পুরুষের প্রেমের আনন্দের উত্তেজনা বিভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বসন্তোৎসবকে সফল করে তোলে। নারী-পুরুষের মনে ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। প্রকৃতি আর বসন্তোৎসব যেন একে অপরের পরিপূরক। লেখকের অন্যান্য গল্পগুলিতেও এই বসন্তোৎসবের নজির রয়েছে। বসন্তোৎসবের বর্ণনার পুরুষ-প্রকৃতির মিলন লীলার প্রেক্ষিতে ভাষাও হয়ে উঠেছে গুরু-গভীর, ধ্রুপদী, সংস্কৃতগন্ধী। ভাষাও যেন এই মহোৎসবের আনন্দের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অহিদত্তের মনেও বসন্তোৎসবের মোহনীয় আকর্ষণ লক্ষণীয়। লালসাময়ী রত্নাকে সে বসন্তোৎসবের আনন্দময় পরিবেশে দেখে আকর্ষণ অনুভব করেছে। লেখকের ভাষায়— “একবার মাত্র তাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কঙ্কম-অরণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই — লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরণ্য নেত্র তুলুতুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কঙ্কম-প্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুণুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনো মৃগনয়না বিভ্রমছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে — তুমি আমার চক্ষু কুক্কুম দিয়াছ! প্রণয়ী তরণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরণ্যভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কর্ণের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।”

মদনোৎসব মূলত নারী পুরুষের স্পর্শানুভূতিতে প্রেমের স্পর্শ উৎসব। নারী পুরুষের মনে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত মদনোৎসবে প্রকৃতি-পুরুষ মনের আনন্দে স্বাধীনভাবে কন্দর্পের মর্মর দেউলে নিজেসঙ্গে সাঁপে দিয়ে প্রেম ও যৌবনের লীলা উপভোগ করে। অহিদত্ত রঞ্জুলও এই আনন্দ উপভোগ করার জন্য বসন্তোৎসবে যোগদান করেছে। তার চোখে লালসাময়ী রত্না ধরা দিয়েছে এভাবে — “তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তম্বী; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণের কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে স্নান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লূতাজালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে

আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকৃষ্ণিত নিচোল; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।”

গল্পের কলাকুশলীদের রূপ-সজ্জা ও দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনায় লেখক অসাধারণ রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যেন রূপের কারিগর; শব্দের ছলাকলায় ও তার নিপুণ প্রয়োগে দক্ষকুশলী। তাঁর এই কৃতিত্ব অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে এই ‘সেতু’ গল্পটি শকজাতির মদমত্ততার অন্তরালে নারী-পুরুষের বন্ধাহারা আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন। কাহিনিটি শুধু ইতিহাসের মোড়কে আবদ্ধ বটে; কিন্তু এর অভ্যন্তরে রয়েছে নারী পুরুষের দুর্জয়, দুর্বীর প্রেম। শেষ পর্যন্ত ‘সেতু’ গল্পটি একটি অতৃপ্ত প্রেমের গল্প হিসেবেই থেকে গেল।

‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পটির কাহিনিতে পূর্বজন্মের কথা স্মৃতির সূত্র ধরে বর্ণিত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ মুৎপ্রদীপকে অবলম্বন করে বহুদূর অতীতের এক রাজাস্তম্ভপুত্রের, রাজপরিবারের জীবন-চিত্রের উত্থান-পতনের নিপুণ আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। সুকুমার সেনের মতানুসারে এই গল্পটির কালসীমা সম্ভবত চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে। সেকালের মানুষের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের, আশা-নিরাশার, প্রেম-অপ্রেম, প্রবৃত্তির উন্মত্ততা ও ষড়যন্ত্রের বাস্তব সম্মতরূপ গল্পটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পে উল্লিখিত যে পুরাতন মাটির প্রদীপটিকে নিয়ে গল্প ফাঁদতে শুরু করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন লেখক এভাবে —

“যে মুৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলি পুত্রের যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মুৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটির প্রদীপের মতোই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মতো পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনা ধরা জীর্ণ বিশেষত্ব বর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই উপস্থাপিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।”

কাহিনির উপস্থাপনায় লেখক কৌশল অবলম্বন করেছেন। পুরোনো দিনের কথা বলবার জন্য এই ভাবে কথা মুখ রচনা করে নিয়েছেন। পুরোনো দিনের গল্প বলবার এক একটা ভঙ্গি। কীভাবে অতীতের কথা কে বিশ্বাসযোগ্যরূপে বলা যায় — এ তারই একটা পদ্ধতি। একালের মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে পুরোনো দিনের জীবনকথার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। কারণ আধুনিক মানুষের এই জাতিস্মরণীয় বিশ্বাস নেই ধরে নিয়েই এই কৌশল অবলম্বন করলেন। এতে অতীত চারণাও তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। তাই লেখক নিজেকে কথকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে তার পুরোনো

জন্মের স্মৃতিকথার কথা বলেছেন। আর এরকম উপস্থাপনার মধ্যে এক দিকে যেমন অতীতের রোমান্সের অন্তঃপুরে প্রবেশের চাবিকাঠি আছে, তেমনি আছে তার নাটকীয়তা। কথকের পুরোনো প্রদীপ খুঁজে পাওয়া এবং সেই সূত্রে পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ে যাওয়া এই আকস্মিকের যোগসূত্রে গল্প বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তার উপর শেষ বাক্যে যখন একটি রাজ্যপুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা বলে গল্পের foregrounding করা হয় তখন তা আকর্ষণীয়তার মাত্রা ছাপিয়ে কৌতূহলের কোঠায় গিয়ে পৌঁছে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, লেখক বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ কৌশলের মাধ্যমে সুদূর অতীতে জীবনের ভিতরে প্রবেশ করেছেন। ‘মৃৎপ্রদীপ’ তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

গল্পটিতে কথক পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ খুঁজে পান। ঐ মৃৎপ্রদীপটির গায়ে লেগে থাকা অতীত যুগের কাহিনি, পুরাবৃত্তের কোনো মসীলিপু অধ্যায়ের পুনরাবিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি চিন্তা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে অতীতের ধূসর স্বপ্নাবিষ্ট মায়ার জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছেন স্মৃতিপটের পথ বেয়ে বেয়ে। লেখক জানিয়েছেন — “প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষ মধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র নগর মস্তবলে পরিবর্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে যে স্মৃতিপুস্তকগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা — কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা এই বার্তিকার আলোকে দীপ্তিমান জীবন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সম্মুখ হইতে বর্তমান মুছিয়া একাকার হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতিভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল।” — প্রদীপ এখানে অতীত স্মৃতি জাগিয়ে তোলবার মাধ্যম। প্রদীপের আলোয় পুরাবৃত্তের মসীলিপু অধ্যায়কে উন্মোচিত করেছেন লেখক। পাটলিপুত্র নগর মস্তবলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এক অখ্যাত মগধেশ্বরের রাজধানীতে আর স্মৃতিপুস্তকগুলি ফিরে পেয়েছে প্রাণ। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ক্ষুদ্র এই মৃৎপ্রদীপটিই গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

তিনি তাঁর ঐতিহাসিক গল্পগুলি সম্পর্কে ডায়েরিতে কিছু কথা লিখে রেখে গেছেন তা প্রণিধানযোগ্য — “আমি আমার অনেকগুলি গল্পে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এইগুলি আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক, আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীন -এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করেন না কেন? বাঙালী যতদিন না নিজের বংশ গরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার

চরিত্র গঠিত হইবে না; ততদিন তাহার কোনো আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।”<sup>৭</sup>

তাঁর এই অভিপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। ‘বাঙালীর ইতিহাস চাই’ — এই ইতিহাস অনুসন্ধান এবং ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজ বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে কাজই করেছেন। বাঙালির জীবনকে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করে তুলতেই এসব গল্প তিনি রচনা করেছেন। এই ধরনের কাজ উনিশ শতকের অনেক লেখকই করেছেন, তবে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত তার বিস্তার খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। শরদিন্দু ইতিহাসের যে পট উন্মোচন করে দেখিয়েছেন তার কালপর্বও কম নয়। ‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পের কালভূমি আজ থেকে ষোল শতাব্দী আগেকার। অন্যান্য গল্পগুলি এই সঙ্গে দেখলে দীর্ঘ একটা কালপট আলোকিত করে তোলবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাল সীমা শরদিন্দুর এই গল্পগুলির পটভূমি। ‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পটিতে লেখক চতুর্থ শতকের আলো-আঁধারি ভিতর থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নামমাত্র অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজপরিবারের একটি রূপ রচনা করেছেন। যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, প্রেম-প্রবৃত্তি এই গল্পটির মূল উপাদান। এর কাহিনি অতি সামান্য। রাজা চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে শ্যালকের সাহায্যে যে রাজ্যলাভ করেছিলেন তাতে কুমারদেবীই হয়ে উঠেছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী। ইতিহাসের পাতায় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহ সম্পর্কে যে কথা পাওয়া যায় লেখক সেই কাহিনিকে অনুসরণ করে চলেছেন। কুমারদেবী যে লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন ঐতিহাসিকেরা অনেকেই তা স্বীকার করেছেন। সমুদ্রগুপ্ত ‘লিচ্ছবি-দৌহিত্র’ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ, বৌদ্ধযুগ, হিন্দুযুগ ইত্যাদি প্রাচীন কালের এই পর্বগুলি যেমন আমাদের কৌতূহল জাগায় তেমনি সুদূর অতীত জীবন সম্পর্কেও নিবিড় ঔৎসুক্যবোধ জাগ্রত করে। আর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সব গল্পের বিস্তার।

গল্পটিতে ইতিহাস নামমাত্র, লেখকের কল্পনার আতিশয্য বেশি। লেখক ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে অনেকটাই সরে এসে সেকালের রাজপরিবারের জীবন কেমন হওয়া সম্ভব ছিল, বা কেমন হতো তা নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন — “মুৎপ্রদীপের আখ্যান বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক কেবল কুমারদেবী, চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রবর্মা, সমুদ্রগুপ্ত এই নামগুলো ঐতিহাসিক। চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয় যাত্রাও সত্য ঘটনা।”<sup>৮</sup>

অপেক্ষাকৃত হীনবল বংশের উত্তরসূরী ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং লিচ্ছবিবংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ছিলেন একথাও ইতিহাসে থেকে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের কারো কারো মতে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব-পুরুষেরা খুব বড়দের রাজা ছিলেন না। লিচ্ছবিবংশে বিবাহ করবার পর তাদের উত্থান ঘটে। চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী লিচ্ছবিবংশীয় কুমারদেবীকে গল্পে শাসনকর্ত্রীরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। ইতিহাসে বলা হয় “She ruled by her own right at the sovereign of the lichchavis.”<sup>১০</sup> চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁর ছবিও পাওয়া গেছে। মুদ্রার অপরপীঠে লক্ষ্মী মূর্তি সিংহের উপর আসীন আর তাতে ‘লিচ্ছবয়’ কথাটি উৎকীর্ণ আছে। এতে কুমারদেবীকে লিচ্ছবিবংশীয় বলে মনে করবার কারণ আছে। রোমিলা থাপার সম্ভবত লিখেছেন, গুপ্তবংশ চন্দ্রগুপ্তের আগে কোনো ধনী ভূম্যধিকারী পরিবার ছিল, লিচ্ছবি কন্যাকে বিবাহ করবার ফলে তাদের সম্মান বাড়ে। এছাড়া লিচ্ছবি বংশীয় কন্যারা ক্ষমতাকেই বেশি পছন্দ করেন এবং শাসনকর্ত্রীক হতে চান। (ভারতবর্ষের ইতিহাস, বঙ্গানুবাদ, কৃষ্ণ গুপ্ত, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১০০)

শরদিন্দু ইতিহাসের এই তথ্যগুলি সবই রক্ষা করেছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য শাসনে কতটা ক্ষমতা ভোগ করতেন ইতিহাস থেকে তার তথ্য পাওয়া যায় না। কাজেই লেখক এখানে কাহিনি নির্মাণে কল্পনার সুযোগ নিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে স্ত্রীর অধীন রূপে উপস্থাপিত করেছেন। গল্পকারের কথায়— “পটমহাদেবী লিচ্ছবি দুহিতা কুমারদেবীর দুর্ধর্ষ। প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির সহিত মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রাণী স্বেচ্ছামত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ... চন্দ্রগুপ্ত বীর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমাণে আঘাত লাগিল।” ইতিহাসের পাতায় যে কথা লেখা নেই সেখানে শরদিন্দু নিজের কল্পনা শক্তির সহায়ে কাহিনির রূপ দিয়েছেন। রানী কর্তৃত্ব ভোগ করতেন। সুতরাং রাজা দুর্বল ছিলেন — এই অনুমান করে লেখক চন্দ্রগুপ্তের আত্মাভিমাণের কথা তুলেছেন।

কাহিনি গড়ে তোলবার জন্য শরদিন্দু চন্দ্রগুপ্তের আত্মাভিমাণ এবং লিচ্ছবি রাজকন্যার কর্তৃত্বের কথা বলে রেখেছেন। এতে তৃতীয় একটি সম্ভাব্য কাহিনির শাখা গড়ার ক্ষেত্রে তার সুবিধে হয়েছে। শরদিন্দু এই গল্পে ইতিহাস লিখতে চাননি। ইতিহাস তাঁর পটভূমি মাত্র। চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী লিচ্ছবি কন্যার স্বাতন্ত্র্য গর্ব চন্দ্রগুপ্তের আত্মাভিমাণ ক্ষুণ্ণ করেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু অকুলীন ভূম্যধিকারীর বংশ লিচ্ছবি রাজশক্তির সংযোগে এক প্রধান রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত ১৪/১৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। আর কল্পনা নির্ভর এই আখ্যানটি গড়ে উঠবার মূলে গল্পে যে প্রদীপ কুড়িয়ে পাবার কথা আছে সেই ঘটনাটি সত্য। শরদিন্দু নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি নিজেই একটি পুরোনো মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটিই এই কাহিনি কল্পনার আদিসূত্র।

কল্পনামূলক কাহিনি রচনায় লেখকের স্বাধীনতা আছে। কেবল লক্ষ করবার বিষয় কল্পনাও ইতিহাসানুমোদিত কিনা।

আত্মাভিমানবশত চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর স্বতন্ত্র প্রয়াসে এবং লিচ্ছবি শক্তির প্রভুত্বগর্বে ক্ষুণ্ণ হয়ে রাজ্য শাসন কর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। মহাদেবীই রাজ্য শাসন করতেন। প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে ধরে নিয়ে লেখক গল্প তৈরি করেছেন। এরকম সম্ভাবনার সত্যতা চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব গর্বকেই ক্ষুণ্ণ করে। সমুদ্রগুপ্তের পরিচয়ে ‘লিচ্ছবি-দৌহিত্র’ শব্দটির ব্যবহার সম্ভবত গুপ্তরাজবংশের অর্বাচীনতা এবং লিচ্ছবিবংশের গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্যের স্মারক। তবে দুই নারীর দ্বন্দ্ব বিরোধ এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই -এ চন্দ্রগুপ্ত কেবল নিষ্ক্রিয় চরিত্ররূপে বিরাজমান একথা ইতিহাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে বলে মনে হয় না। এরকম সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আরও একটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে — কুমারদেবীর স্বাতন্ত্র্য খর্ব বিনষ্ট করে চন্দ্রবর্মার কন্যা সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা করলে সেই অনুসারে সোমদত্তার পুত্রেরই রাজ্য লাভ করবার কথা। অথচ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর সমুদ্রগুপ্ত রাজা হয়ে নিজেকে ‘লিচ্ছবি-দৌহিত্র’ বলেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বিষয়ে আরও যুক্তি দেওয়া সম্ভব কিন্তু একথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন কাহিনি ইতিহাস নির্ভর নয়, স্বকপোলকল্পিত রোমাঞ্চ মাত্র। লেখক এই রোমাঞ্চ রচনা করতে গিয়ে প্রেম ও প্রবৃত্তিকেই মূল বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কৌশলের আশ্রয় নিয়ে চন্দ্রবর্মা নিজের কন্যাকে রাজনৈতিক টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে তার কন্যা। এখানে চন্দ্রবর্মার চরিত্রে রাজনীতিকের পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে। পিতার পরিচয় বড় হয়ে উঠেনি। তাই এই প্রসঙ্গ টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রটিকে কেবল হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, কামুক এবং মদ্যপ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের এটুকু জ্ঞান অবশ্যই ছিল যে সেকালে গুপ্তচর বৃত্তিতে সুন্দরী রমণীদের ব্যবহার করা হত। শরদিন্দুর ‘অমিতাভ’ গল্পেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত কেবল কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য নারী দেহটিকে ব্যবহার করতে চাইলে তাকে রাজ অন্তঃপুরের বাইরে যে কোনো বিলাস-গৃহে স্থান দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। সম্ভবত এর পিছনে লেখকের দু’টি চিন্তা কাজ করেছে। এক. তিনি চন্দ্রগুপ্তকে কামবৃত্তি-তাড়িত এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন করে আঁকতে চান এবং দুই. এর পিছনে মহাদেবীকে নিচে নামানোর কোনো গূঢ় অভিসন্ধি তাঁর মনে থাকা সম্ভব। তবে নারীর ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যগর্ব ক্ষুণ্ণ করতে বীররাজা চন্দ্রগুপ্তকে এরকম পরিকল্পনা করতে হচ্ছে— এই ভাবনাটাও নির্ভুল নয়। গল্পটি এরকম দু-একটি পূর্ব সিদ্ধান্তের উপর জোর দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা বজায়

রাখা রাজা চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা অপেক্ষা লেখকের লক্ষ্য বিট চক্রায়ুধ ঈশানবর্মার পূর্ব স্মৃতি সূত্রে সেকালের ভোগ কলঙ্কিত নাগরিক জীবনের রূপকে অঙ্কন করা। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের বিলাসিতা মদমত্ততা যৌনতা ও অল্পপুরনারীদের ব্যর্থতা ও হতাশার চিত্রকে রূপ দেওয়া। চক্রায়ুধ ঈশানবর্মাই এগল্লের কথক আর তার স্মৃতি জাগরণে কাজ করেছে সেই প্রদীপটিই, একদিন সোমদত্তা পাটলি পুত্রের রাজগৃহে যে প্রদীপটি দিয়ে অগ্নি সংযোগ করেছিল। ঈশানবর্মা তখন ছিল রাজা চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বদ এবং ক্ষুদ্র এক ভূস্বামী। কথায় বলে—অভিমানহত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত মদ্যপান, মৃগয়া এবং নারী এই তিনটি বিলাসকেই জীবনে বেছে নেন যৌবনংবা বনংবা। চন্দ্রবর্মার কন্যা সোমদত্তা সেই মৃগয়ার মুখ্য শিকার যাকে নিয়ে কাহিনির প্রসারতা। চন্দ্রবর্মা সোমদত্তাকে রাজপুরীতে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করে পাটলিপুত্র নগর জয় করবার স্বপ্ন দেখেছেন। পরিকল্পনা ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের অবহেলিত জীবনের প্রতি গুপ্তচর সোমদত্তারই সহানুভূতিতে কাহিনির পরিণতি অন্যরকম হ'য়ে পড়ে। পিতা চন্দ্রবর্মাকে রাজ্য আক্রমণ করবার কথা সোমদত্তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করে সে ক্ষমতা গর্বিত মহারানী কুমারদেবীর অবহেলা থেকে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল কিন্তু এই ভাবনার মূলে জল ঢালে বিট ঈশানবর্মা। এই নারীর রূপ তার মনকে তাতিয়ে তুলেছে। সে রাজধানীতে কর্তব্যরত অবস্থায় গুপ্তচর সোমদত্তাকে হাতে হাতে ধরে ফেলে এবং তাকে নিজের লোলহান কামনার বহ্নিতে দগ্ধ করে। কিন্তু সোমদত্তার অভিপ্রায় পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক ছিল না শুধুমাত্র সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের কল্যাণের জন্য পিতাকে রাজ্য আক্রমণে সাহায্য করে তার কাছ থেকে রাজ্য চেয়ে নেবার কথা ভেবেছিল। অন্যদিকে লিচ্ছবি সৈন্যের সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করবার পরিকল্পনা এবং অবরুদ্ধ রাজপুরীতে গোপন পথে খাদ্য সরবরাহ করবার কথা জেনে নিজেই পিতাকে দ্রুত রাজ্য আক্রমণ করার কথা বলেন। রাজপুরীতে আগুন লাগিয়ে সে কুমারদেবী, রাজকুমার সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্তকে গোপনে নিষ্ক্রমণের পথ দেখিয়ে দেয়। বিট চক্রায়ুধের স্পর্শে হীনস্মন্যতায় অপমানে অপবিত্র দেহ নিয়ে সে আর চন্দ্রগুপ্তের কাছে ফিরে যেতে চায় না। কাহিনির এই অংশটি রোমান্সের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। মাঝখানে সোমদত্তা পিতা চন্দ্রবর্মার প্রশ্নের উত্তরে বলেছে — “দেব এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকিলে সকল কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে মরিয়াও আমার এ নরক যন্ত্রণা শেষ হইত না। পিতা, আমার কিছুই নাই — সব গিয়াছে। নারীর যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রেয়, এক নরকের পশু তাহা হরণ করিয়াছে।” ঈশানবর্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক এ কাহিনির মধ্যে জটিলতা বাড়িয়েছে। ঈশানবর্মার কামনার স্পর্শে তার দেহ কলুষিত হবার ঘটনাটিকে কাহিনির মধ্যপর্যায় বলা যেতে পারে। সেখান

থেকে কাহিনি দ্রুত পরিণতির পর্যায়ে পৌঁছায়। সোমদত্তা নিজেই এই কাহিনির নিয়ন্তা। সেখানে সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়ার কারক সে নিজেই। চক্রায়ুধের কাছে অসহায় ভাবে বাধ্য হয়ে আত্মদান করার পর মুহূর্তেই তার পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির হয়ে যায়। নারীর ক্রিয়ার মূলে চিত্তবৃত্তির যে তীব্রতা, তার নির্দ্বন্দ্ব ইচ্ছার যে প্রবলতা এ গল্পের সমাপ্তিতে তারই রূপচিত্র পরিলক্ষিত হয়। সোমদত্তার ক্রিয়ার দ্রুতিতে লেখকের বর্ণনার দ্রুতির মধ্যে দিয়ে গল্পের শেষ অংশটিকে একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর, প্রেম ও প্রতিহিংসার বুননে শ্বাসরোধকারী পরিণতির টানে গতিময় করে তুলেছে। রাজপ্রাসাদে তখন আগুন জ্বলছে, সে আগুন সোমদত্তার ক্ষেভের ও আত্মদাহের, সে আগুনে ঈশানবর্মার কলুষিতচিত্ত পুড়ে গিয়ে সোমদত্তার প্রেমকে শুদ্ধ করে তুলেছে। রাজমহিষী কুমারদেবীর সঙ্গে তার তখনকার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। চন্দ্রগুপ্তকে জাগাতে ও চন্দ্রগুপ্তের সুপ্তিভঙ্গে এই দাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বামীর বংশধরকে রক্ষা করবার তাগিদ তখন জীবনের শেষ লক্ষ্য। পিতা চন্দ্রবর্মা রাজধানী অধিকার করলে সোমদত্তা তাকে সবকথা জানিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক চক্রায়ুধের কথা চন্দ্রবর্মা আগেই জেনেছিলেন। রাজপুরীতে পা দিয়েই তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন— “তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল।” ঈশানবর্মার কথা জানিয়ে সোমদত্তা বলেছে, এই নরকের পশু আমার সর্বস্ব হরণ করেছে। আর রাজ্য পিতার হাতে তুলে দেবার পুরস্কার স্বরূপ সে ঈশানবর্মার কঠোর শাস্তি চেয়েছে— “এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দন্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকণ্ঠকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ত্রিমি পূর্ণ শূকর মাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়; মরিবার পূর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ-গলিয়া খসিয়া পড়ে। আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।” আর নিজের জন্য পিতার হাতে মৃত্যুই কাম্য মনে হয়েছে তার। সোমদত্তার জবানীতে উঠে এসেছে —

“এদেহ আপনি দিয়াছিলেন, আপনিই ইহার নাশ করুন।

পাষণ স্তম্ভের মতো চন্দ্রবর্মা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিল, আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত

দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।”

অতঃপর চন্দ্রবর্মা নিঃশঙ্কচে সর্গব ঘোষণায় সুতীক্ষ্ণ ভল্লাঘাতে সোমদত্তার দূষিত দেহকে বিনাশ করেছেন। এই দৃশ্যটিও খুবই চমৎকার— “চন্দ্রবর্মা দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া কর্কশ ভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন, সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হইয়াছিল, আমি তাহা ধ্বংস করিলাম। — বলিয়া দুই পদ পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল উর্ধ্বে তুলিলেন। সোমদত্তা

উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।”

শরদিন্দুর গল্প বলার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। সেটা তাঁর নিজের। মূলত জাতিস্মর ধারার গল্পগুলিতে তিনি এই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন বলা যায়। story teller অর্থাৎ আখ্যান কথক কাহিনি তলের ভেতরে অবস্থান করে কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যার ফলস্বরূপ আত্মকথন রীতির আশ্রয় নেয় তাঁর গল্পের কাহিনি। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, সোমদত্তার পরিণতির এই চিত্রটিও কথক নিজেই বলেছেন। কথক নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনায় সোমদত্তার চরিত্রবল পরিস্ফুট করবার করবার জন্য একই পটভূমিতে দু’টি চিত্র রূপ পেয়েছে। সোমদত্তা নির্ভীক, বালিষ্ঠ আর ঈশানবর্মা ভীত, কাপুরুষ। একজনের আত্মাশুদ্ধ পবিত্র, কিন্তু দেহ নষ্ট অশুচি অন্যের দেহ ও আত্মা দুই-ই কলঙ্কিত পাপে জর্জরিত। এই দু’য়ের বিপ্রতিপত্তা বোঝানোর জন্য দু’টি রূপের বর্ণনা জরুরী ছিল। শেষ বাক্যটিতেও সোমদত্তার নিষ্কলুষ ও পবিত্র রূপের পরিচয় বর্ণিত। সোমদত্তার মৃতদেহের কথায় পদ্মের ‘উপমান’ -এর কথা এসেছে। রক্তচন্দন-চর্চিত শৈবালবেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মতো সোমদত্তার বিগতপ্রাণ দেহ মাটিতে পড়ে আছে। শৈবালবেষ্টিত রক্ত-চন্দন চর্চিত শ্বেত কমলিনী সোমদত্তা। সোমদত্তার দেহরক্ষার মধ্যে নারীর আদর্শই প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, তার ইচ্ছা মৃত্যুর বাসনাই তাকে করে তুলেছে মহনীয় ও পবিত্র।

‘মৃৎপ্রদীপ’ গল্পে প্রধান চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে সোমদত্তা। গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি সোমদত্তার চরিত্রকে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত করবার জন্যই এসেছে। গল্পটিতে রাজা চন্দ্রগুপ্ত মুখ্য নয় — সোমদত্তা ঈশানবর্মার গল্পটাই লক্ষ্য। তাই ঈশানবর্মার তুলনায় সোমদত্তার প্রতি লেখক উদার। নারী চরিত্র অঙ্কনে শরদিন্দুর সহানুভূতি ছিল অপার। তাঁর অন্যান্য গল্পেও এই বিষয়টি চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ‘রুমাহরণ’ গল্পে রুমা এবং ‘তক্ত্ মোবারক’ গল্পে পরীবানুর কথা। সোমদত্তার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে কতগুলি দিকের আভাস পাওয়া যায়। যেমন—

ক. চক্রাযুধ ঈশানবর্মার সে কঠিন শাস্তি চেয়েছিল কিন্তু সেই শাস্তির মধ্যেও সোমদত্তার চরিত্রের বৈপরীত্যের দিকটি বর্তমান।

খ. কথকের মনে প্রশ্ন— সোমদত্তা কেন আত্মহত্যা করল না? সোমদত্তা নিজেকে রক্ষা করে কি স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও স্বামীর হততেজ পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন?

গ. ঈশানবর্মা কর্তৃক সে আশায় জল ঢেলে দেওয়ার কারণে নিজেকে কি নিষ্কলুষ প্রমাণিত করতে চেয়েছে? ঈশানবর্মার কামনা বাসনার শিকার হয়েই কি সে এই পরিণতি মেনে নিয়েছে?

উত্তরে বলতে হয় হ্যাঁ কারণ সোমদত্তা কুমারদেবীর স্বৈরিণী মনোভাব ও ঈশানবর্মার

লোলুপতা কিছুতেই মানতে পারেনি। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সে এসব কাজ করেছে। সোমদত্তা এই কাহিনির কারক। তার এই পরিণতি, তার এই বলিদান তাকে বাংলা গল্পসাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রের সামনে বলিয়েছে।

গল্পটি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। যে ভঙ্গিটি হ'ল স্মৃতিরোমছন্দ। নারীর ক্ষমতা, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়-আশয় গল্পটির উপজীব্য। সোমদত্তা দ্বন্দ্বময় চরিত্র। তবে এই দ্বন্দ্ব তার আচরণে ততটা ফুটে ওঠেনি। ঈশানবর্মার হাতে ধরা পড়ে সে তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বস্তুত গল্পটিতে একটি সাধারণ ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় যাবার মতো সংযোগ সূত্রও অনুপস্থিত। শুধুমাত্র সোমদত্তার কান্নাকে তার একটা যোজক ভেবে নিতে পারি। এই 'কান্না'র যোজক সেতু বেয়ে সোমদত্তা তার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম থেকে পরপুরুষের কাছে নিরুপায় আত্ম-সমর্পণের জীবন বেছে নিয়েছে। আসলে রোমান্স কাহিনি রচনা করতে শরদিন্দু ভোলেন নি বলেই এরকম একমুখিন সরল নির্দ্বন্দ্ব চরিত্র এঁকেছেন।

'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি কিছুটা ব্যঞ্জনাধর্মী। লেখকের বর্ণনায় সোমদত্তার রূপ লাভণ্য আর মৃৎপ্রদীপের স্বর্ণালি আলো উভয় উভয়ের পরিপূরক। মৃৎপ্রদীপকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে। মৃৎপ্রদীপ যেন একটি নারী সত্তা। একটি তুচ্ছ জরাজীর্ণ মৃৎপ্রদীপ যেমন একটি রাজ্য ধ্বংস করতে পারে তেমনি একটি নারীর ভূমিকাও যে কোনো মুহূর্তেই রুদ্রাণী ভয়ঙ্করী হতে পারে। উল্লেখ্য— "এই নোনা ধরা জীর্ণ বিশেষত্ববর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই উর্ধ্বাংশিত ক্ষুদ্র শিখার বহিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।" অর্থাৎ মৃৎপ্রদীপটি নারী প্রকৃতির রূপক উপাদান। এই দু'টি বিসদৃশ বস্তুর জীর্ণ তাই — উভয়ের মধ্যে সাযুজ্যের কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ উভয়ের মুখের 'কালির দাগ টুকু'। প্রদীপের মুখের কালির দাগ তার দাহ জনিত সোমদত্তার চরিত্রে কালিরদাগ তার অন্যস্পষ্ট হবার কলঙ্ক।

সোমদত্তার রূপের সমানুপাতিক এই মৃৎপ্রদীপটি। এই প্রদীপটির আগুনের শিখায় যেমন মগধ রাজ্য ভস্মীভূত হয়েছিল ঠিক তেমনি চক্রাযুধ ঈশানবর্মাও সোমদত্তার রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়েছিল। এখানে ধ্বংসের মুখ্য কারণ হ'ল সোমদত্তা — সোমদত্তাই এই ধ্বংসের নায়িকা। তার কথাতেও সে চিত্রই স্পষ্ট — "আমি শ্মশানের আলো।" এই কথাটি ধ্বংসের দ্যোতনা দান করে।

উল্লেখ্য, সমালোচকদের কাছ থেকে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে জাতিস্মরণ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প বলেছেন। এখানে গুপ্তযুগের রাজ্যশাসন,

যুদ্ধ-বিগ্রহ, গুপ্তচরবৃত্তি, কাম-কেলি বিলাস সবই স্থান পেয়েছে। তদুপরি গল্পে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত একমুখিন, ঋজু ও গতিময়। মূলত আত্মকথন পরিস্থিতিতে লেখা এই গল্পটি দীর্ঘ পরিসরযুক্ত হলেও ভাষারীতির টানে গল্পটির কাহিনি পাঠককে আকর্ষণ করে আর তাতেই গল্পটির শিল্পীত রূপ পায়। শৈল্পিকগুণ বেড়ে ওঠে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পটি ভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সাক্ষ্য দেয়। এই গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য— “অষ্টম সর্গ’ গল্পে যে-যুগের অবতারণা করিয়াছি সে যুগের কোনও স্পষ্ট ইতিহাস নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বী অনুমান মাত্র আছে। যে মানুষগুলিকে এই গল্পে অবতারিত করা হইয়াছে তাঁহারা কোন্ শতকের লোক ছিলেন এবং একই কালে জীবিত ছিলেন কিনা, এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের মীমাংসা করা গল্পের বিষয়ীভূত নয়। ইতিহাসের অস্পষ্টতার সুযোগ লইয়া আমি তাঁহাদের সমসাময়িকরূপে কল্পনা করিয়াছি। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ যে স্বয়ং কালিদাসের রচনা তাহা এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য না হইলেও মুখ্য বক্তব্য বটে।”<sup>১০</sup> মুখ্য বক্তব্য কী লেখক তা বলে দিয়েছেন; মুখ্য প্রতিপাদ্য কী তা উহ্য রেখেছেন। প্রতিপাদ্য আর বক্তব্যের মধ্যে লেখক পার্থক্য করেছেন। প্রতিপাদনের অর্থ প্রমাণ করা। আর বক্তব্য যা প্রমাণ করা হচ্ছে বা হবে।

এ গল্পে ইতিহাস লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। সরস উপভোগ্য গল্প রচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক। কিন্তু তাঁর কথায় তিনি একটি সমস্যাকে এ গল্পের কেন্দ্রে রেখেছেন।

কালিদাস গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, পৃ. ১৫৫ মল্লিনাথ কুমার সম্ভবের অষ্টম সর্গ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তার পরে করেননি। এতে দেখা যায় প্রাচীন টীকাকারেরা কুমার সম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গকে সমালোচনা করেও কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেছেন। তবে তাতেও সংশয় যায়নি। এই সশংকটুকুকে নরনারীর মনস্তত্ত্ব এবং পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে শরদিন্দু জীবন সমালোচকের দৃষ্টিতে নির্ণয় করেছেন অষ্টম সর্গ কালিদাসের রচনা কিনা। তিনি সে বিষয়ে তার ভাবনাকে কাহিনির মধ্যে যথোপযুক্ত ঘটনা সংযোজনের দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন।

‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের অষ্টম সর্গ কবি লিখেছিলেন কিনা সে প্রশ্ন বহু পুরনো। ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের কোনো কোনো গ্রন্থে ১৭ সর্গ পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু সপ্তম/অষ্টম সর্গের পরবর্তী অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। অষ্টম সর্গে দেব-দম্পতীর বিবাহোত্তর শৃঙ্গার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু “দেবতার সম্ভোগ শৃঙ্গার বর্ণনায় কাব্যের প্রকৃতি বিপর্যয় দোষ ঘটে।” (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, ডি.এম. লাইব্রেরী, দ্বিতীয়

সংস্করণ ১৩৮৪, পৃ. ৬২) কাজেই দেবশৃঙ্গার বর্ণনা কবির নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সপ্তম সর্গকেই ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের উপসংহার বলেছেন ‘সপ্তম সর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ উৎসবেই কুমার সম্ভবের উপসংহার।’ (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক, সংস্করণ ১৯৬১; ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৬২ (১৪) তবে প্রাচীন সমালোচকদের কেউ কেউ ৮ম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেন। আনন্দবর্ধন ৮ম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করে নিয়ে তার সমালোচনা করেছেন (জাহ্নবীকুমার, পৃ. ৬২)। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর সম্পাদিত কালিদাস গ্রন্থাবলীতে ৮ম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন আলংকারিগণ একে “অত্যন্তমনুচিতম” বলে কটাক্ষ করেছেন। গল্পটিতে অলংকার শাস্ত্র নির্দেশিত মতের সঙ্গে কবি মনের অনুভূতিশীলতার দ্বন্দ্ব রচনা করে লেখক একটি পরীক্ষা করেছেন। কবি অলংকারশাস্ত্র নির্দেশিত নিয়ম মেনে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনের চিন্তা লাঘব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে গল্পটির উপস্থাপনা। একদিন প্রায় সন্ধ্যাকালে একটি পুরুষ নিম্নতর সোপানের এক প্রান্তে চিন্তামগ্নভাবে নীরবে বসে আছেন। “গত দুই দিন হইতে একটি দুরাহ সসম্যা কিছুতেই তিনি ভঞ্জন করিতে পারিতেছেন না।” অলংকার শাস্ত্র ঘেঁটেও উত্তর পাননি। শুষ্ক শাস্ত্রপত্রে যার উত্তর নেই মানুষের জীবন থেকেই সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি সন্ধান করছেন।

গল্পটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির ভিতর থেকে কবি তাঁর ঈঙ্গিত উত্তরটি পেয়েছেন। প্রথম ঘটনা শিপ্রা নদীতে কয়েকটি যুবতীর কৌতুকালাপের বর্ণনা যে আলাপের ছিন্নাংশ কবি শুনেছেন। একটি যুবতীর বর বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে— তাকে নিয়ে রসিকতা। লোলার বর ফেরেনি তার জন্য উদ্বিগ্ন। কবি এই রসিকাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করেছেন : “তোমরা বলিতে পার কাব্যে নায়ক নায়িকার বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর কবির আর কিছু বক্তব্য থাকে কিনা?” এই প্রশ্নটিই এ কাহিনির মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান ও উত্তর প্রাপ্তি এ গল্পের বিষয়।

প্রথম ঘটনার ছিন্ন সংলাপাংশ থেকে কবি উত্তরের আভাস পেয়েছেন। যুবতীরা বিদেশাগত পতি সন্মিলনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। সেই মিলন প্রসঙ্গের ঈঙ্গিত আছে যুবতীদের পরামর্শে : “মধু মোম কুঙ্কুম আর ইঙ্গুদী- তৈল মিশাইয়া ঠোঁটে লাগাস—আর কোন ভয় থাকিবে না।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৫) বলাবাহুল্য এ মিলন ব্যাপারেরই কথা। এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কবি যুবতীদের কাছে পাননি। কবি যুবতীদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিবাহ আর মিলন এক নয়। “আমি মিলনের কথা বলি নাই, বিবাহের কথা বলিয়াছি।” বিস্মিত

মঞ্জরিকা প্রশ্ন করেছে—“উভয়ই এক নহে কি?” কবি বলেছেন—“উহাই তো প্রশ্ন।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬) কাজেই বিবাহ ও মিলন যেখানে এক নয় সেখানে কবির কাজ কী এ প্রশ্ন থেকেই গেছে। চতুরা অরুণিকা উত্তর দিয়েছে—“এ প্রশ্ন কখনো ভট্টিনীর নিকট করিয়াছিলেন কি?” কবি যেন একটা উত্তরের আভাস পেয়েছেন—তাই ঈষৎ চমকিত হয়েছেন। আর যুবতীদের আশীর্বাদ করে যে উক্তিটি করেছেন সেটিই ইঙ্গিতপূর্ণ—“মাতৃদেবং ক্ষণমপি চতে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬)

দ্বিতীয় কাহিনি লোলার। কবির মন তখনো চিন্তামুক্ত হয়নি। এই সময় শোকপরায়ণা এক বেনী ধরা যুবতী লোলাকে কবি দেখলেন। তার স্বামী রৈবতক যবদ্বীপ থেকে এখনো ফেরেনি। বিবাহিতা যুবতী স্বামীর আগমন অপেক্ষায় কাতর। কবি তাকে জানালেন রৈবতক কুশলে আছে, দু’একদিনের মধ্যেই ঘরে ফিরবে। লোলা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল “আপনি আজ অভাগিনীর প্রাণ দিলেন।” (তদেব, পৃ. ১০৭) কবি তাকে বললেন “আমার উমাকে আমি যে দুঃখ দিয়াছি তাহা স্মরণ করিলেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়; কিন্তু চরমে সে ঈঙ্গিত বর লাভ করিয়াছে। মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এবং লোলাকে আশীর্বাদ করে বললেন “তোমার জীবনেও মদন পুনরুজ্জীবিত হইবেন।” (তদেব, পৃ. ১০৮)

এই ঘটনা দুটির ভিতর দিয়ে লেখক ঈঙ্গিত উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বিবাহ ও মিলন যে এক নয়—মিলন যে বিবাহের উপরে তা দেখাচ্ছেন। এর পরের ঘটনা রাজ্যের বারমুখ্যা বারবধু প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানকে। প্রিয়দর্শিকা মহাবিদুযী চতুঃষষ্টি কলায় পারঙ্গতা এবং অলোকসামান্যা। মহামাণ্ডলিক অবস্তীপতি এই সমাপানকে যোগ দেবেন। আর্যাবর্তের অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য তাঁকে স্মরণ করেন। প্রিয়দর্শিকার গৃহের সমাপানকের চিত্রটি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত। প্রিয়দর্শিকার একটি উক্তিতে কবির সংসার চিত্রের একটা ঝলক ধরা পড়েছে। “হায় কবি, এই সপ্তসাগরা পৃথিবী তোমার গুণে পাগল, কিন্তু তোমার গৃহিনী তোমাকে চিনিলেন না।” (তদেব, পৃ. ১১৪) প্রিয়দর্শিকার কাছেই কবি তার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। “দেব দম্পতির বিবাহোত্তর জীবন চিত্রিত করা কি কাব্য কলা সঙ্গত হইবে?” (তদেব, পৃ. ১১৫) প্রিয়দর্শিকা অলংকারশাস্ত্র এবং নীতি শাস্ত্র সংগত নিষেধাত্মক উত্তর দিয়েও বলেছেন : “কাব্যশাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। সত্যের অনুজ্ঞায় সকলেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই।” (তদেব, পৃ. ১১৫) কবি আবার বলেছেন তিনি নিজের অন্তরের কথা বুঝতে পারছেন না, তাই তাঁর সংশয় দূর হচ্ছে না। প্রিয়দর্শিকা উত্তর দিয়েছেন “আজ আপনি গৃহে প্রত্যাভর্তন করুন—রাত্রি গভীর হইয়াছে। কাল প্রাতে যদি আপনার মনে কোনও সংশয় থাকে, আমার অভিমত জানাইব।” (তদেব, পৃ. ১১৫)

গল্পে এই তিনটি ধাপ পেরিয়ে কবি বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাড়িতে স্ত্রীর মুখোমুখি হয়েই তাঁর কটু তিরস্কারের মুখে পড়েছেন। কবির মুখের উপর শয়ণকঙ্কের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। আর কবি অন্ধকারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন “এই তাঁহার গৃহ। এই তাঁহার ভার্যা। গৃহিনী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা।” (তদেব, পৃ. ১১৬) কবি যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কাব্য রচনা করেন সেই প্রকোষ্ঠে গিয়ে দীপ জ্বলে মৃগচর্ম বিছিয়ে বসেছেন। কুমারসম্ভবের পুথির উপর চোখ পড়েছে আর বিদ্যুৎচমকের আকস্মিক প্রভা তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে খেলে গেছে। প্রিয়দর্শিকা ঠিক বুঝেছিলেন। কবির আর কোনো সংশয় নেই। কবি মসীপাত্র লেখনী ও তালপত্র নিয়ে লিখতে বসেছেন অষ্টমসর্গ। কবির শরের লেখনী তালপাতার উপর দিয়ে শব্দ করে এগিয়ে চলেছে—‘পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্ —’

অষ্টমসর্গ গল্পটি কুমারসম্ভবকাব্যের উপসংহার বিষয়ক প্রশ্নের কবি জনোচিত সমাধান মাত্র নয়; এটি আধুনিক মানুষের কিংবা চিরকালীন মানুষের জীবন সমস্যারও একটি উন্মোচন। নরনারীর বিবাহ মাত্রই যে চিন্তের মিলন সাধন নয়—তা বলা যায় না। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গের বর্ণনা উপযুক্ত হবে কিনা কবি কালিদাসের মুখে সে প্রশ্ন তুলে গল্পকার একটি চিরকালীন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার একটি সমাধানে পৌঁছেছেন। এ গল্পে সে যুগের মানুষের জীবনকথার ছোট্ট একটু পর্দা উত্তোলন করে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন। বিদেশগত স্বামীদের জন্য যুবতী নারীদের উদ্বেগ চিন্তা মিলনোৎকর্ষা, নারীদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে তাদের জীবন কথার ছিন্নাংশ; বারমুখ্যা প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপনের চিত্রে সেকালের উচ্চ অভিজাত জীবনের টুকরো টুকরো খবর লেখক উপস্থাপিত করেছেন। গল্পে বর্ণিত মানুষের জীবনের এই টুকরো টুকরো চিত্রে লেখক সেকালের ইতিহাসের ঘটনাকে একটুখানি আলোকিত করে তুলেছেন।

ড. সুকুমার সেন—“শরদিন্দুবাবু গল্পটির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন যে কালিদাস সাত সর্গ পর্যন্ত লিখে থেমে গিয়েছিলেন। কারণ আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রমতে বিবাহ ঘটনার পরবর্তী দাম্পত্য সহবাস কাব্যে অথবা নাট্যে বর্ণনীয় বিষয় নয়। কাব্যনামটির কথা স্মরণ করে কবির মন বাসর ঘরের চৌকাট অবধি এসে থেমে যাওয়ায় মন সরছিল না। যেভাবে তাঁর কবি দৃষ্টি দেব-দম্পতীর দ্বার প্রান্ত থেকে উঁকি দেবার ঔৎসুক্য পেয়েছিল তাই রচনাটির গল্প সত্ত্ব।”<sup>১১</sup> অলঙ্কার শাস্ত্রের যে বিধিই থাকুক না কেন কবির মনের স্বাধীনতাও বর্তমান। আলোচ্য গল্পটিতে শরদিন্দুবাবু তারই পরিচয় দিয়েছেন।

উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদী, ময়ূরিকা, মঞ্জরিকা, প্রিয়দর্শিকা, কালিদাস, বরাহমিহির, অমর সিংহ,

বেতাল ভট্ট প্রভৃতি স্থাননাম ও ব্যক্তিনামে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথাই স্মরণ করিয়েছেন। তবে এগল্লে ইতিহাস কিছু নেই। মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হিশেবে উঠে এসেছে সেযুগের সমাজ ও মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালী।

আলঙ্কারিক বিতর্কের আড়ালে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন দাম্পত্য সম্পর্কের সংশয়, সন্দেহ বিশ্বাসহীনতা, দোলাচলতা, আশাহীনতা সর্বোপরি মানসিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অশান্তির শাস্বত প্রতিচ্ছবি। আলোচ্য ‘অষ্টম সর্গ’ গল্লে কবি কালিদাস ও কবি পত্নীর দাম্পত্য-প্রেম-অপ্রেমের বর্ণনায় শরদিন্দুবাবু সেকালের দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সরস ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন। আবার সেকালের নারীদের বর্ণনায় লেখক দেখিয়েছেন সকলেই শিপ্রাতীরে দেখা যুবতীদের মতো সুভাষিণী বা চতুরিকা নন। প্রিয়দর্শিকার মতো বিদুষী ও রসকলাবিৎ নন। কবি পত্নীর চিত্রে লেখক তা দেখিয়েছেন। কবির প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানকে যাওয়া নিয়ে কবি পত্নীর মনের মধ্যে যে ঘৃণা জাগরুক হয়েছে তাতে নারী চরিত্রের আর একটি দিকও তুলে ধরা গেছে। মোটকথা সেকালের জীবন যাত্রার কিছু প্রাণবন্ত চিত্র এই গল্লে ফুটিয়ে তুলে লেখক ইতিহাসের প্রাস্তবর্তী অংশ একটু হলেও আলোকিত করেছেন। বলাবাহুল্য এর সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের কোনো মিল আছে কিনা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভাব্য ইতিহাসের যে গঠন কবির গল্লে হয়েছে তাকে একেবারে অমূলক বলা সম্ভব নয়।

গল্লেখকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মরু ও সঙঘ’ গল্লেখটি ‘বিষকন্যা’ গল্লেখগ্লে স্থান পেয়েছে। এই গল্লেখটিতে উঠে এসেছে মানুষের প্রবৃত্তির কথা। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে শরদিন্দুবাবুর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় বহু গল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যায়। ‘মরু ও সঙঘ’ গল্লেখটিতেও বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-নীতি, কৃচ্ছ সাধন পদ্ধতি ও নিষ্ঠার কথা বর্ণিত হয়েছে।

মধ্য এশিয়া বা চীনে তুর্কিস্থান গল্লেখটির পটভূমি। বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও পরিণতি এবং এই অঞ্চলের ঘটে যাওয়া ঘটনা মরুগ্রাস গল্লেখটির উপজীব্য বিষয়। উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মের কঠোরতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, রীতি-নীতি, দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি সঙঘ-স্থবির পিথুমিত্ত এবং বৌদ্ধ শ্রমণ উচণ্ডের মধ্যে দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলেও শেষ পর্যন্ত মানব ধর্মের জয় হয়েছে। নির্বাণ ও ইতি তার প্রমাণ। নির্বাণ ও ইতির প্রেম-ভালোবাসা ধর্মের কঠিন আগল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। প্রতাপের চেয়ে, ধর্মের চেয়ে প্রেম ও যে বড় সেই সত্যই একে প্রকাশিত। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাণ ও ইতি ধর্মের অনুশাসনে শৃঙ্খলিত থাকে নি।

মোট চারটি চরিত্র গল্লেখটিতে। প্রত্যেকই বৌদ্ধসঙঘের অধিবাসী। তারা হলেন বৌদ্ধসঙঘের অধ্যক্ষ স্থবির পিথুমিত্ত, ভিক্ষু উচণ্ড, নির্বাণ ও ইতি। মূলত পিথুমিত্ত ও উচণ্ডের বিপ্রতীপে নির্বাণ

ও ইতি স্থাপিত। নির্বাণ ও ইতি এক আঁধির সময় নিতান্ত বাল্যকালে এই সংঘে এসে পড়ে। তখন তাদের বয়স আনুমানিক যথাক্রমে পাঁচ-ছয় বছর ও দেড় বছর। সংঘ স্থবির এই দু'জনকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলেন।

গল্পে বর্ণিত নির্বাণ ও ইতি এই দুই যুবক যুবতীকে বাল্যকালে কুড়িয়ে পেয়েছিল বৌদ্ধভিক্ষু পিথুমিত্ত ও উচণ্ড। সঙঘারামে স্থান দেওয়ার পর উভয়ের বাল্য-কৈশোর নির্দিধায় কেটে গিয়েছিল কিন্তু যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পর নিষিদ্ধ সম্পর্ক অনুভব করায় তাদের চিন্তায় সরলতা হারিয়ে যায়। নির্বাণ ইতিকে দেখে সঙ্কুচিত হয় তাকে এড়িয়ে চলতে চায় অথচ ভিতরে ভিতরে আকর্ষণ অনুভব করে। ইতির চিন্তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নারীত্বের পূর্ণতা অনুভব করে নিজের নারীত্বের নিষ্ক্রেমে সে নির্বাণকে আপন করে নিয়েছে। সঙঘারামের দ্বিতীয় ভিক্ষু উচণ্ডের কাছে তাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ব্যাপারটি চোখে পড়তে লাগল। উচণ্ড সঙঘারামের নিয়ম-নীতির কঠোর বাঁধনে বাঁধতে চাইলো নির্বাণকে। ইতির দেহে যৌবন লক্ষণ দেখে উচণ্ডের বিমুখতা গভীর আক্রোশে পরিণত হল। “ভিক্ষুর নিপীড়িত ব্যর্থ যৌবন যেন ইতির মূর্তি ধরিয়া নিরন্তর তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল।” তার মনে হ’ল সংঘে ‘যার’ প্রবেশ করেছে। উচণ্ড ছিল নির্বাণের শিক্ষক, সেই থের পিথুমিত্তকে বলে নির্বাণকে দীক্ষা দেওয়া যায়। নারীর আকর্ষণ ও আসক্তি থেকে দূরে রাখবার জন্য নির্বাণকে ‘উপসম্পদা’ দান করে সঙঘারামের ভিক্ষু হিশেবে গ্রহণ করা হয়। সেখানে কামনা-বাসনা-লোভের স্থান নেই। সেখানে একমাত্র মূলমন্ত্র হ’ল— ‘সঙঘং শরণং গচ্ছামি।’ বৌদ্ধধর্মের তাই-ই নীতি। নির্বাণ ইতির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে নিজের প্রাণধর্মের বাইরে গিয়ে স্বেচ্ছায় এই কঠিন জীবন স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু মন থেকে তা সে মেনে নিতে পারে নি। স্থবির তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নির্বাণকে বুঝিয়েছেন “যার অন্তরে বৈরাগ্য এবং নির্বাণ তৃষণ জন্মিয়াছে সেই সংঘের অধিকারী” কিন্তু ব্যাধতাড়িত হরিণের মতো উচণ্ডের শাসন এবং তিরস্কার ক্লিষ্ট নির্বাণ কর্তব্য স্থির করতে না পেরে একটা কাজ স্বীকার করে নিয়েছে। একদিকে উচণ্ডের তিরস্কার ভীতি অন্যদিকে ইতির প্রেমের আকর্ষণ—দুই থেকে মুক্ত হবার এছাড়া অন্য কোনো পথ তার ছিল না। নির্বাণ দীক্ষা নিয়ে চিন্তা স্থির করতে চেয়েছে—পারেনি। ইতির টান তার প্রাণধর্মের আকর্ষণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা সেই আকর্ষণের হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ভগবান তথাগতের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়েছে। ইতির আকর্ষণে নির্বাণ ধরা দিয়েছে এবং উচণ্ডের দেওয়া দণ্ড স্বীকার করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এই দণ্ডদেশের ভয়ঙ্কর নির্ধূরতা সকলেই বোঝে। এ তাদের ‘মৃত্যুদণ্ড’। সেই মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করে সংঘ থেকে তারা বেরিয়ে গেছে। একদিন পাতিমোক্ষ পাঠ শেষ করে স্থবির মাননীয় ভিক্ষু উচণ্ডকে প্রশ্ন করেছিলেন

“যদি কোনো পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুন।” (শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২) উচণ্ড নীরব থেকেছেন। কিন্তু তারই অন্তরের ঈর্ষা ও পাপদ দুটি জীবনকে মৃত্যু পথে ঠেলে দিয়েছে।

এই শান্তি মহাস্থবির মেনে নিতে পারেননি তিনি নির্বাক থেকেছেন। তিনি বলেছেন “মহাভিক্ষুর অভিপ্রায় দুর্জয়। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কতব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।” উচণ্ড নিজের কঠোরতায় বৌদ্ধ বিধানকে যথাযথভাবে পালন করবার গৌরববোধ করেছে। কিন্তু স্থবিরের কথায় সেও বুদ্ধের ইচ্ছা বুঝতে চেয়েছে। এবং আরেক আঁধির দিকে নির্বাণ ও ইতিকে ফিরিয়ে আনতে বেরিয়েছে। ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটিতে একদিনে সংঘ মানবজীবনের আশ্রয়রূপে আর মরু ধ্বংসরূপে চিত্রিত হয়েছে। আশ্রয় আর ধ্বংস বাইরের প্রকৃতির এই লীলার ভিতরে ভিতরে আরও এবং আশ্রয় নিরাশ্রয়ের দ্বন্দ্ব চলেছে। সেখানে ইতি আশ্রয় উচণ্ড ধ্বংস নির্বাণ এ দুয়ের টানাপোড়নে আক্রান্ত। বাইরে মরুঝড় এসে সংঘকে ধ্বংস করছে আর ভিতরে জীবনধর্মের বিরুদ্ধে চলেছে শুষ্ক শাস্ত্র পত্রের অনুশাসনে জীবনকে নিরুদ্ধ করবার প্রক্রিয়া। লেখক দেখিয়েছেন ধর্মের শুষ্কতার বিরুদ্ধে এই কিশোর কিশোরী জীবনধর্মকেই জয়যুক্ত করবার জন্য প্রাণবাতি ধরে মরু পথে যাত্রা করেছে। সে যাত্রা মৃত্যু পথগামী কিন্তু তবু গল্পকার সেই জীবনের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়যুক্ত করেছেন।

গল্পের শেষে উচণ্ডের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। আকাশের আঁধিতে তিনি বুদ্ধের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখেছেন।

“উচণ্ড চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব — তাহাদের ফিরাইয়া আনিব।” মানব জীবন ও মানবিক গুণাবলীর চরমোৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে স্থবির পিথুমিন্তের মধ্যে দিয়ে। তিনি অন্তরে বাইরে একান্তভাবে সৎ থাকতে চেয়েছেন। তিনি প্রকৃত তথাগতের অনুরক্ত। আত্মবিকারের দ্বারা সত্যকে তিনি আবৃত করেননি। প্রকৃত ধর্মের কথা বলেছেন। ধর্মে দীক্ষিত হয়েও উচণ্ড প্রকৃত ধার্মিক নয়; কারণ ধর্মের পরিপন্থী বিষয়-আশয়ে ঈর্ষা ও লোভ প্রভৃতি ত্যাগ করতে পারেনি সে। পিথুমিন্তের মধ্যে দিয়ে লেখকের মূল বক্তব্য প্রকাশ পায়। এছাড়াও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের কথাও ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কথায়। নির্বাণ চরিত্রটির নামকরণেই তা বোঝা যায়। ইতি নামের তাৎপর্যে প্রেম, ভালোবাসা, সুকুমার প্রবৃত্তি ও অহিংসার কথাই প্রকাশ পায়। এই সকল রিপূর হাত থেকে পরিত্রাণা পাওয়ার নামই তো নির্বাণ বা মোক্ষ। লেখক এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে মানবজীবনের পবিত্র প্রেম, স্বচ্ছন্দ জীবন ও অনাবিল আনন্দের কথাই বলতে চেয়েছেন ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটিতে। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ‘সাহিত্য বিতান’ গ্রন্থে ‘বর্তমান বাংলা সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটির এই সত্যের কথাই বলেছেন—

“... অতীতের রোমান্সকে তিনি (‘মরু ও সঙ্ঘ’) গল্পে যে রূপ-রস দান করিয়াছেন, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। এ গল্পের কল্পনা ও পরিকল্পায় তিনি যে ভাবুকতা ও দার্শনিক রস দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মানব-জীবনের শাস্ত্রত সমস্যাই তাঁহার জীবন-দর্শনকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি তাহাতে যে একটি সুকণ্ঠিত সুমার্জিত বিদ্বান-সুলভ মনোভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও অনন্য সুলভ। এই কাহিনীতে রোমান্স-রস বা ইতিহাসের যাদু যেমন চরমে উঠিয়াছে, তেমনই ইহার ভাববস্তু হইয়াছে — মানুষের সহিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, ভিতরে ও বাহিরে সেই এক শত্রুর সহিত প্রাণাস্তিক সংগ্রাম এবং পরিণামে সেই চিরন্তন হাহাকার।”<sup>১২</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসাহিত্যের ভাঙারে ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটি ‘বিষকন্যা’র মতো বড় গল্পগুলির অন্যতম। গল্পটির কাহিনি দু’টি আবর্তে দশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। শরদিন্দুবাবুর অসাধারণ গল্প বলার ভঙ্গি ও ভাষার পরিবেশানুগ ও চরিত্রানুগ ব্যবহার গল্পে কাহিনিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য— “শঙ্খ-কঙ্কণের narrative চমৎকার। এমন মধুর প্রাঞ্জল narrative শক্তি বর্তমানে আর কোনো লেখকের নাই — কাহারোর নাই — এই কাহারো মধ্যে জীবিত সমস্ত লেখকই পড়েন। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে তুলনীয় ‘প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি ইতিহাসে পদক্ষেপ করেন নাই। ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে আপনার জুড়ি নাই।”<sup>১৩</sup>

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’-এ লেখক ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তুর্কো-মুসলিম শাসক আলাউদ্দিন খিলজীর দিগ্বিজয় যাত্রা ও তার মনোজগতের স্বরূপটি কথাকার গল্পে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দিনকে কেন্দ্র করেই গল্পে দিল্লীর সুলতানী যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়। লেখক সুলতানী রাজত্বের দমন-পীড়ন নীতির পাশাপাশি ছোটছোট হিন্দু রাজ্য ও সেই রাজ্যের রাজাদের রাজধর্ম-কুলধর্ম-রাজ্য শাসন পদ্ধতি, অন্দরমহলের রীতি-নীতি, পারস্পরিক সংহতি ও মৈত্রীর বিষয়টি ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

ইতিহাসে পাঠে জানা যায় যে, খ্রিস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে শিশুনাগবংশীয় রাজাদের মধ্যে পিতৃপুরুষকে হত্যা করে সিংহাসন হাসিল করবার রেওয়াজ ছিল। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটিতেও সেই ছবিই ধরা পড়ে। গল্পটি মূলত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পটভূমিকায় রচিত। আলাউদ্দিন খিলজীও সেই কৌশলই অবলম্বন করে সিংহাসনে দখল করেছে। সর্বোপরি পিতৃব্যের ছিন্ন মস্তক বর্শাফলকের শীর্ষদেশে গেঁথে দিল্লীর রাজপথ পরিক্রমা করেছে। গল্পকারের ভাষায় — “তাঁহার রণপাণ্ডিত্য ছিল, আর ছিল অনির্বাণ নারী তৃষ্ণা। এই দুই মিলিয়া তাঁহার চরিত্র পিশাচতুল্য করিয়া

তুলিয়াছিল। ভারতের অন্ধকার মধ্যযুগেও তাঁহার সমান বিশ্বাসঘাতক নৃশংস ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুলতান বোধ হয় বেশি ছিল না।” এটাই হ’ল ক্ষমতা ও দম্ভ প্রকাশের সেকালীন রীতি রেওয়াজ।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটি বিশ্লেষণের পূর্বে কাহিনির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। স্বেচ্ছাচারিতায় তুর্কো-মুসলিম শাসকের আলাউদ্দিনের দেশীয় রাজা ভূপসিংহের ভাগ্য বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার কাহিনি এতে স্থান পেয়েছে। আলাউদ্দিন ভূপসিংহকে কেন্দ্র করে তৃতীয় ব্যক্তি ময়ূরের শৌর্য ও বীর্যের প্রকাশ। ভট্টনাগেরশ্বরের মুখে কাহিনি বর্ণিত। জানা যায়, ভূপসিংহ রানী, রাজকুমারি, দাস-দাসী ও পাবদত্ত প্রজাদের নিয়ে পরম শান্তিতে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় আলাউদ্দিনের নজর পরে তাঁর রাজ্যের ওপর। ভূপসিংহের সুন্দরী কন্যা শীলাবতীকে ‘সওগত’ হিসেবে চেয়ে বার্তা পাঠায় আলাউদ্দিন খিলজী। আলাউদ্দিনের হাত থেকে বাঁচবার উপায় নেই যেনে ভূপসিংহ নিজের কন্যাকে না পাঠিয়ে দাসী সীমাস্তিনীকে পাঠান। কিন্তু আলাউদ্দিন এই ছল বুঝতে পেরে সাতদিন ভোগ করে রাজপুরী তল্লাশী করে শীলাবতীকে হরণ করে নিয়ে যায়। গল্পে বর্ণিত ভূপসিংহের রাজমহিষী সোমশুঙ্কাকে আঁতুরঘরে রেখে মারা যান। এইসব যত্নগায় ভূপসিংহের মনে প্রতিশোধ বাসনা জেগে ওঠে। প্রথমত ছেলে রামরুদ্রকে দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রামরুদ্র মারা যায়। নিঃসহায় হয়ে পড়ে ভূপসিংহ। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। সুযোগ বুঝে আলাউদ্দিনকে যোগ্য জবাব দেবেন। এদিকে ভূপসিংহের নির্দেশে ভট্টনাগেশ্বর সপ্তমপুরে ‘গোপনীয় দূতকার্যে’ গেছেন। ফেব্রার সময় একভাগ্যাস্থেষী যুবকের দেখা পেয়ে ভূপসিংহের ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনি শোনান। যুবকটির নাম ময়ূর। সে দক্ষ তীরন্দাজী। ভট্টনাগেশ্বর তা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলে মহারাজের নিকটে চলো মহারাজ তোমায় অনুগ্রহ করবেন। যথারীতি ময়ূর রাজপ্রাসাদে চলে আসে। মহারাজ প্রসন্ন হন এবং ভাবেন সবই ভাগ্যের ফল। তাই উপযুক্ত জবাব দেবার সময় এসেছে। ময়ূরকে রাজপ্রাসাদে স্থান দেন। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা ভূপসিংহ ময়ূরকে অনিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। সুযোগ বুঝে ভূপসিংহ আলাউদ্দিনের ব্যভিচারের ফল সামস্তিনীর কন্যা চঞ্চরীকে ময়ূরের সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দিল্লীতে পাঠান। আলাউদ্দিন নিজের কন্যাকে ভোগ করুক এটা ভূপসিংহ দেখতে চান। কানুক আলাউদ্দিন বুকুক—সে কতটা নীচ। বলা যায়, ভূপসিংহ চঞ্চরীকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন।—এটাই হবে আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁর চরম প্রতিশোধ। বাস্তবে তাই-ই ঘটেছে। চঞ্চরীর সর্বস্ব হরণ করার পর আলাউদ্দিন জানতে পারে সে তারই কুকীর্তির ফসল। চঞ্চরী তারই ঔরসজাত। এই ঘটনায় আলাউদ্দিন উন্মাদ বিকৃত মস্তিষ্ক ও রুগ্ন হয়ে পড়ে। তিন বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ময়ূরও শীলাবতীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শেষে ময়ূর ভূপসিংহের

ছোট কন্যা সোমশুক্রাকে পরিণয়সূত্রে বাঁধতে চেয়ে ভূপসিংহের অনুমতে প্রার্থনা করে। এইভাবে মিলনের মধ্যে দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

এবারে ব্যাখ্যা ও বিচারে-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে গল্পটির মর্মসত্য উদ্ধার করা যাক।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ বড় গল্প। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির অধিকাংশই আকারে বড়। কাহিনি রচনার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। কাহিনি বর্ণনার গুণে ঘটনার চমৎকারিত্ব রচনায় তিনি পাঠকের চিত্ত জয় করেছেন। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান বা চরিত্র রচনার অনাবিস্কৃত দৃষ্টিকোণ তিনি তেমন ব্যবহার করেননি। ঘটনার পর ঘটনা রচনায় সম্ভব অসম্ভবের মিলন সাধনে, কাহিনির চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে তাঁর পারঙ্গমতা অতুলনীয়। তাঁর বিষকন্যা, মৃৎপ্রদীপ, চুয়াচন্দন সবই আকারে বড় গল্প। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ দুই আবর্তে দশ পরিচ্ছেদে সাজানো সেই বড় গল্পের একটি।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পের বিষয় একটি প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থতা। কিন্তু প্রতিশোধের জন্য আক্রোশ ক্রোধ বা অন্তর্যন্ত্রণার দাহ গল্পে নেই। বরং একটা পরাজিত মানসিকতা এবং অক্ষমের নিলিপি আছে। তাছাড়া প্রতিশোধের জন্য নিরন্তর ষড়যন্ত্র কিংবা উদ্যম এ গল্পে দেখা যায় না। শরদিন্দু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রোমান্সধর্মী কাহিনি রচনায় লঘু এবং ধীর সঞ্চারি পদক্ষেপে গল্প বলে চলেছেন। এ গল্পে ইতিহাস নিতান্ত পটভূমি মাত্র—আলাউদ্দিন নামমাত্র চরিত্র। আলাউদ্দিন সম্বন্ধে ইতিহাসের একটি সিদ্ধান্ত তিনি প্রস্তাবনা অংশে বলে দিয়েছেন। তিনি ‘রণপাণ্ডিত’ ছিলেন। আর একটি সিদ্ধান্তও ইতিহাস সমর্থিত—তাঁর অনির্বাণ নারী তৃষণ ছিল। তিনি গুজরাতের রানী কমলাকে নিজের অঙ্কশায়িনী করেছিলেন—একথা ঠিক। ‘পদ্মিনী’ সম্বন্ধে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের কিছু সন্দেহ থাকলেও তাও মোটের উপর তাঁর একটি নারীতৃষণর গল্প। এই ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটি আলাউদ্দিনের নারীতৃষণর উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা। এবং এক অর্থে poetic justice ব্যবহার করে গল্পে এই নারীতৃষণকেই আলাউদ্দিনের পতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা। আলাউদ্দিনের রণপাণ্ডিত্যের দিক এই গল্পে দেখানো হয়নি, তাঁর বহু যুদ্ধে জয়লাভ, বহিরাগত মোগলদের বহুবার প্রতিহত করা, প্রশাসনিক ভূমিকা—এ গল্পে নেই। থাকার প্রয়োজনও নেই। লেখক তাঁর চরিত্রের একটি মাত্র দিককেই প্রতিফলিত করেছেন।

আলাউদ্দিন এ গল্পের ইতিহাসের চরিত্র, গল্পের প্রধান চরিত্র নয়। আলাউদ্দিনের নারীতৃষণ অন্য যে মানুষের জীবনে বিপর্যয় এনেছে—যে মানুষের সংসারকে তছনছ করে দিয়েছে— সেই ভূপসিংহের প্রতিহিংসা নেওয়াকে কেন্দ্র করে এ গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভূপসিংহও এ গল্পের মূল চরিত্র নয়। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা, প্রতিশোধ নেওয়া—এটা ভূপসিংহের লক্ষ্য। কিন্তু সেটাই গল্পের প্রথম থেকে দেখানো হচ্ছে না। ভূপসিংহ এসেছে অনেক পরে। প্রথম আবর্তের

দ্বিতীয় অংশে তিনি তাঁর বয়স্যের গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হন, তৃতীয় অংশে আমরা তাঁকে প্রথম দেখি। দ্বিতীয় অংশে রাজ বয়স্যের মুখে ভূপসিংহের বিপর্যয় কাহিনি এবং এর পিছনে আলাউদ্দিনের ভূমিকা জানানো হয়েছে। এই পরোক্ষ উপস্থাপনায় বোঝা যায় ভূপসিংহও গল্পের মূল লক্ষ্য নয়। তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে তাঁর কোনো নিজস্ব ক্রিয়া নেই, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং বেদনাহত চরিত্র (passive sufferer) মাত্র। নিষ্ক্রিয় বেদনাহত ভূপসিংহ একবার প্রত্যক্ষভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিফল হয়েছেন; সেটাও গল্পের অতীত ক্রিয়া। দ্বিতীয়বার কী কৌশলে তিনি তার প্রতিশোধ স্পৃহা সফল করলেন তা বর্তমানের কাহিনি। এবং এই কাজে তাকে সফলতা এনে দিয়েছে যে মানুষটি— সে ময়ূর। আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়েই কাহিনি গড়া হয়েছে—এ গল্পের কেন্দ্রে তাকেই রেখেছেন গল্পকার।

প্রস্তাবনা অংশে আলাউদ্দিনের পরিচয় দেবার পর লেখক পরের অংশ থেকে কাহিনি বর্ণনা শুরু করেছেন। “দিল্লী হইতে দুই শত ক্রোশ দক্ষিণে বিক্ষ্যাগিরির ক্রোড়ে সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই কাহিনীর সূত্রপাত।” সাতপুরা শৈলমালার আবর্তের মধ্যে সাতটি ছোট ছোট রাজ্যের কথা দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে। সেই রাজ্যগুলি বর্তমানে লুপ্ত কিন্তু আলাউদ্দিনের সময় সেগুলি ‘জীবিত’ ছিল। এই গিরিসংকটের মধ্যে ভাদ্রমাসের দ্বিপ্রহরে এক ‘পথভ্রান্ত পথিক’কে নিয়ে এ কাহিনি আরম্ভ হয়েছে। পথিকের ইতিবৃত্ত লেখক পরে বলবেন, আগে তার পরিচয় দিয়েছেন—

“পথিকের বয়স অনুমান বাইশ- তেইশ বছর। সুঠাম বেত্রবৎ দেহ, দেহের বর্ণও বেত্রবৎ। মুখের গঠন খড়্গের ন্যায় শাণিত, কিন্তু মুখের ভাব শান্ত ও সহিষ্ণু। চোখের দৃষ্টি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সুদূর প্রসারী, কিন্তু তাহাতে শ্যেনপক্ষীর হিংস্রতা নাই। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; ঠোঁটের উপর অল্প গোঁফ। পরিধানে একখণ্ড বস্ত্র কটি হইতে জুঙঘা পর্যন্ত আবৃত্ত করিয়াছে, দ্বিতীয় একখণ্ড বস্ত্র উত্তরীর আকারে স্কন্ধের উপর ন্যস্ত। হাতে ধনু এবং তিনটি বাণ।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭)

এ বর্ণনায় যে মানুষটিকে দেখান হল তার বয়স, গাত্রবর্ণ, মনের ভাব এবং তার দেহের ও মনের শক্তির পরিচয় আছে। তার সঙ্গে বেশবাস ও কেশ বিন্যাসের কথায় সে মানুষটির সময় বোঝানো হয়েছে। হাতের অস্ত্র তার যোদ্ধত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত। শরদিন্দু এই চরিত্রটিকেই কাহিনির কেন্দ্র রেখে গল্প সাজিয়েছেন। যদিও আলাউদ্দিনের কথা দিয়ে গল্পের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তবু কাহিনিতে আলাউদ্দিনের বর্তমান ক্রিয়ার কোনো কথা বলা হয়নি। আলাউদ্দিনের কাজের পরিণাম রাজ্যগুলির মধ্যে কী বিশেষ করে পঞ্চম পুরে হয়েছে এবং পঞ্চমপুর কী অবস্থায় আছে সে কথা

বলতেই কাহিনিতে আলাউদ্দিনের কথা এসেছে। আমাদের এই চরিত্রটিকে নিঃসঙ্গ না রেখে লেখক এই অংশে দ্বিতীয় একটি চরিত্রকে এনেছেন। এখান থেকে পরিচয় পর্ব সরিয়ে রেখে গল্পের শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় মানুষটি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। মানুষটি শীর্ণকায় বেশভূষা ভদ্র, পায়ে পাদুকা, মাথায় উষণীষ, ভাবভঙ্গী ও বাচনশৈলী হাস্যরস মিশ্রিত। মানুষটি ভট্ট নাগেশ্বর, পঞ্চমপুরের রাজা ভূপসিংহের বয়স্য। হঠাৎ দ্বিপ্রহরে তাঁর মতো লোকের এই পথে বেরোনোর একটা কৈফিয়ৎ আছে তিনি “গোপনীয় দূতকার্যে” সপ্তমপুরে গিয়েছিলেন। গল্পের পরের বেশ কিছু অংশ কেবল ভট্টনাগেশ্বর এবং প্রথমোক্ত যুবকের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভট্টনাগেশ্বরের ক্ষুধা কাতরতা, যুবকের তীর নিক্ষেপ করার দক্ষতা একই সূত্রে গাঁথা। তীরক্ষেপণের দক্ষতার জন্যই ভট্টনাগেশ্বর তাকে পঞ্চম পুরের মহারাজার কাছে নিয়ে গেছে “তুমি যে রকম অব্যর্থ তীরন্দাজ, মহারাজ নিশ্চয় তোমাকে অনুগ্রহ করবেন।” যাবার পথে যুবক ময়ূরের সঙ্গে কথায় কথায় নাগেশ্বর ভট্ট এই রাজ্যগুলিতে আলাউদ্দিনের অভিযান এবং পঞ্চমপুরের রাজা ভূপসিংহের ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনি শুনিয়েছেন। শরদিন্দু পাঠককে গল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং অতীতের ঘটনা জানাতে এই কৌশল নিয়েছেন।

ভূপ সিংহের পরিবারের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দিকে আলাউদ্দিন খিলজীর নির্দেশে ভূপ সিংহের কন্যা শীলাবতীকে লুণ্ঠন ও হরণ করা, দ্বিতীয় সদ্যোজাত কন্যা সোমশুল্লাকে আঁতর ঘরে রেখে স্ত্রীর মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা ভূপ সিংহকে পয়দস্ত করে তুলে। তাছাড়াও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একমাত্র পুত্র রামরুদ্রের মৃত্যু তাঁকে আরো নিঃসহায় করে তোলে। শাস্ত স্বভাবের এই মানুষটির অন্তরে প্রতিশোধ বাসনার আগুন জ্বলতে থাকে। কীভাবে সে আলাউদ্দিনের প্রতিশোধ নেবে সেই চিন্তায় সেদিন কাটাচ্ছে। আবার তার মনে হয়েছে প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ গ্রহণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। কিন্তু প্রতিশোধের নেশা তাঁর মন থেকে সরছে না। এই দোলাচলতায় সে উদ্ভিন্ন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমান আমলের নৈরাজ্য অস্থিরতা মুসলিমদের ক্ষমতা বিস্তার ও হিন্দু-মুসলিমের যুদ্ধ, ঘটনাকে গল্পটিতে দেখাতে চেয়েছেন। দিল্লীর সুলতানী যুগের কদর্য-পক্ষিলতা, আবিলতা ও প্রতিহিংসা ইত্যাদি ভ্রষ্টাচারের ছবিও এতে পাওয়া যায়। দাসী রমণীদের সম্বন্ধেও শরদিন্দুর ভাবনা-চিন্তার কথা জানা যায়। সেকালে নারীরা শুধুই দাসী, শুধুই ভোগ্যপণ্য, ক্ষমতাবান পুরুষদের অধিগত, নারীর কোনো স্বাধীন ভাবনা-চেতনা বাক-স্বাধীনতা এসব কিছুই ছিল না। বলা যায়, জোর যার মূলুক তার।

শরদিন্দুর গল্প বলার কৌশলে দুটি বিষয় উঠে আসে পাঠেও তা বোঝা যায়। এক তাঁর গল্প বলার আদল, দুই প্রাঞ্জল ভাষা। ‘শঙ্খ-কক্ষণ’ গল্পটি সর্বজ্ঞ কখন পরিস্থিতিতে গল্পটি বর্ণিত।

রাজা ভূপ সিংহের বয়স্য ভট্ট নাগেশ্বর এই গল্পের কথক। গল্প বলতে সে পটু। শ্রোতা পেলেই গল্প বলে। এক্ষেত্রে ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বৃদ্ধ মোঙের কথা স্মরণে আসে।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ নামটিও বেশ ইঙ্গিতার্থক। গল্পে ‘দক্ষিণাবর্ত শঙ্খে’র কথা জানা যায়। কল্যাণ, মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রতীক এই শঙ্খটি। গল্পের মধ্যেও এই শঙ্খটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী। কারণ গল্পের শুরুতে ভূপ সিংহের স্ত্রীর হাত থেকে পড়ে গিয়ে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটি ভেঙে যায়। ফলে ভূপ সিংহের পরিবারে অকল্যাণ ও ভাগ্য বিপর্যয় নেমে আসে। পূর্বে সে কথা বলা হয়েছে। গল্পে দেখা যায় যে, পুনরায় দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এনেছে। কতেই আবার ভূপসিংহের পরিবারে শুভদিন ফিরে বসেছে। গল্পকারের কথায়— “সতেরো বছর পূর্বে রাণীর হস্তচ্যুত দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তারপরেই আসিল সর্বনাশা বিপর্যয়। আজ আবার অযাচিত ভাবে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আসিয়াছে এক অজ্ঞাত কুলশীল যুবক; ... এ কি নিয়তির ইঙ্গিত? তবে কি সত্যই শুভকাল ফিরিয়া আসিয়াছে।” তাই গল্পের কাহিনি ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ নামটিও সার্থক।

‘রেবা রোধসি’ গল্পটি ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পেরই প্রতি গল্প দু’টির মধ্যে মিলও অনেক। আলাউদ্দিন খিলজীর সময়কাল গল্প দু’টির পটভূমি। দু’টি গল্পেই যথাক্রমে আলাউদ্দিন খিলজী ও মালিক কাফুরের রাজ্য বিস্তার এবং ক্ষমতার দস্ত দেখানো হয়েছে। গল্প দু’টির মূল উপজীব্য বিষয় হিন্দু রাজা ও তুর্কো মুসলিম সুলতানের দ্বন্দ। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে আলাউদ্দিন খিলজীর উচ্ছৃঙ্খলতা, কদর্যতা, ব্যভিচারিতা ও কুটিল রাজনীতি-কৌশলের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরের তেমন কোনো বীরত্বের কথা পাই নি। ফলে লেখক সুকৌশলে মালিক কাফুরের দক্ষিণাত্য বিজয়-প্রসঙ্গ নিয়ে ‘রেবা-রোধসি’ লিখলেন। আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে দু’টি গল্প পাঠে জানা যায়, কাহিনির শুরু আর মালিক কাফুরের হাতে শেষ। আবার, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে ময়ূরের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি টান নেই কিন্তু ‘রেবা রোধসি’ গল্পে নির্বাসিত যুবরাজের মধ্যে তা দেখা যায়—উভয় গল্পের মধ্যে এই একটুখানি যা পার্থক্য। দুই যুবরাজের মিলও দেখি। আটরিক মানুষরাই ভাগ্য তাড়িত যুবরাজদের সাহায্য করেছে। নাগরিক জীবন থেকে বাইরে প্রকৃতির লালিত সহজ সরল মানুষের প্রেম ভালোবাসা তাদের জীবনকে অভূতপূর্ব বদলে দিয়েছে।

“শেষ পর্যন্ত রাজ পুত্র তুণীরবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল।” শরদিন্দুবাবু স্বভাবসিদ্ধ প্রকরণ-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন এই গল্পটিতে। এটি তাঁর পূর্বাপর গল্পগুলিতেও দেখা যায়। লক্ষণীয়, গল্পে ক্রিয়ার কারণ গল্পের শুরুতে না বলে ক্রিয়ার ফলটাই বলা হয়েছে। তুণীরবর্মা হ’ল রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভ জাত চতুর্থ সন্তান। তুণীরবর্মাকে ঘিরেই

প্রাথমিক পর্যায় থেকে চরমতমক্ষণ পর্যন্ত গল্পের সঞ্চার ও ক্রমপরিণতি। তুণীরবর্মা স্বাধীনচেতা যুবরাজ। সে কারো শাসন শোষণ মানে না। সে আরও বলশালী ও সুন্দর হয়ে ওঠে। গল্পকারের বর্ণনায়— “উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ... জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।” এই উদ্দামতাই তুণীর বর্মার জীবনের পতন ডেকে আনে। প্রবল উন্মত্ততাবশত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রীকে হরণ করার অপরাধে তাকে নির্বাসিত হতে হয়। ইন্দ্রবর্মার সহানুভূতির কথায় তুণী বলে ওঠে— “মাতৃভূমি! মহেশ গড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু।” রাজ্য থেকে নির্বাসিত তুণীরবর্মা নর্মদা নদীর তীরে রাত কাটিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করলে একদল আটবিক শ্রেণির তরুণীর সাক্ষাৎ পায়। রেবা নামের তরুণীটি তুণীরের গলে মালা পরিয়ে দেয়। গল্পে এই ব্যাপারটি কিছুটা আকস্মিক। কারণ রেবার সঙ্গে তার কোনো পূর্ব সম্পর্ক নেই অথচ তুণীরবর্মার দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বরমাল্য পরিয়ে দেওয়াটা গল্পের সংহতি নষ্ট করলেও এটা একটা চমক। লেখক তুণীরের আশ্রয়দাতৃ হিসেবে রেবাকে দাঁড় করিয়েছে। তুণীর রেবার কাছে থাকতে শুরু করে। রেবাকে নিয়ে ঘর-সংসার শুরু করে। একদিন রেবার সঙ্গে তুণীর শিকারে গিয়ে শুনতে পায়, একদল বহিরাগত স্লেচ্ছ সৈনিক দক্ষিণাত্য বিজয় শেষ করে উত্তরের ছোট ছোট রাজ্যগুলি আক্রমণ করতে চায়। মালিক কাফুরের নির্দেশে তারা লুণ্ঠন চালায়। মালিক কাফুর তাদের প্রধান। রেবা ও তুণীরবর্মা অতি সংগোপনে বৃক্ষে রাত কাটিয়ে স্লেচ্ছ সৈনিকদের গোপন অভিসন্ধি ধরে ফেলে। তার মাতৃভূমিও আক্রমণ ও দখল করবে, এই চিন্তায় সে চিন্তিত। অশ্রু বাড়িয়ে পরে। স্বদেশভূমি রক্ষায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে। কীভাবে স্লেচ্ছদের হাত থেকে পিতৃরাজ্য রক্ষা করবে—এই চিন্তায় সে মগ্ন। আক্রমণ করার পূর্বেই খবরটা জানানো চাই। ফলে কর্তব্যের টানে তুণীর রেবাকে ছেড়ে নদীতে গা ভাসিয়ে দেয়— “ওই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে। রেবা কেঁদো না, যদি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।”

‘রেবা রোধসি’ গল্পটিতে ইতিহাস-প্রসঙ্গ নামমাত্র। ইতিহাস বড় হয়ে ওঠেনি বলেই গল্পটি পাঠককে আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য— “শঙ্খ-কঙ্কণের (পুস্তক) মধ্যে ইতিহাসের ছাপ প্রথমটাতে খুবই আছে এবং বিশেষ উপভোগ্য। দ্বিতীয়টিতে (রেবা রোধসি) খুব বেশি না থাকিলেও একটি জাতীয় আদর্শের পটভূমিকায় কাহিনীটি খুবই উপভোগ্য। —”<sup>১৪</sup> গল্পে মালিক কাফুর ও আলাউদ্দিন খিলজীর কথা-প্রসঙ্গের সঙ্গে ইতিহাস নগন্য। সমস্ত গল্পটাই লেখকের কল্পনার ফসল। কল্পনা এখানে মুখ্য। কারণ লেখক কোনো কিছুর মূল্যে রাজপুত্রদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের ফলশ্রুত জানালেও জাতীয় আদর্শ থেকে যে রাজপুত্ররা

কখনো বিচ্যুত হয় না—মানুষ ঘোলামেলাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু রাজগৌরব তুণীরবর্মার জীবনে এনেছে চরম দুর্দশা। ফলে সে উদ্ভাস্ত হয়েছে। লক্ষণীয় তুণীরবর্মা আটবিক শ্রেণির নারীর ভালবাসা পেয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে চেয়েছে। তার চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষণীয় ও নারীর প্রেম ভালবাসা তাকে বদলে দিয়েছে। ভালবাসা কি, স্নেহ কি রেবার প্রেম থেকেই সে অনুভব করেছিল। তাই মাতৃভূমির প্রতি তাঁর প্রেম জন্মেছে। নদীতে সাঁতার কেটে মাতৃভূমিকে রক্ষার্থে শত্রুর আক্রমণের কথা। নিজের জীবন সংশয় জেনেও প্রিয় রেবাকে ত্যাগ করে সে ছুটে গেছে দেশরক্ষার তাগিদ নিয়ে। মাতৃভূমি, মাতৃসম — তাই সে মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ছুটে গেছে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত যেকোনো মানুষই স্বদেশের কথা ভুলতে পারে না। আজন্ম লালিত মাতৃভূমিকে কেউ কোনো দিন বুলতে পারে না; নারীর টান সে অনুভব করবেই।

জাতীয় আদর্শের প্রতি মোহ কীভাবে জন্মাতে পারে সেই বিষয়টিই লেখক এ গল্পে বর্ণনা করেছেন। গল্পটিতে ইতিহাস-প্রসঙ্গ নামমাত্র থাকলেও শুধুমাত্র গল্পের প্রয়োজনে ইতিহাসকে তিনি এনেছেন। জাতীয় জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই গল্পটির মূল উপজীব্য।

অন্যদিকে ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পে গোলাম কাদেরের স্মৃতির সূত্রে কথক জাতিস্মরণতায় ডুব দিয়েছেন। অপরিচিত ফিরিঙ্গীকে দেখেই কসাইখানার দোকানদার গোলাম কাদেরের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল পূর্বজন্মের স্মৃতি, অতীত জীবনের দুর্বিষহ অসহায় করণ মৃত্যুর কথা, স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার মুখচ্ছবি। বর্তমান জীবনে কসাইখানার দোকানদার গোলাম কাদের রূপে জন্মে অপরিচিত ফিরিঙ্গীর সাক্ষাৎ লাভ করে পূর্বজীবনের ক্রিয়া-কলাপ জানতে পেরেছে। ফলে ওই অপরিচিত ফিরিঙ্গীকে দেখে ছুরি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়। এই ঘটনাটি গোলাম কাদেরের একালের ঘটনা। গোলাম কাদেরের ভাষায়— “গোলাম কাদের বলিল, বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি যে পাগল নই — আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজ বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার — এই গোলাম কাদেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মূর্খ লোক। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩)

গোলাম কাদেরের কথায়, পনের-ষোল বছর আগে তার স্ত্রী এক কন্যা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মরে যায়, হতভাগ্য কন্যা সন্তানটিও একই সঙ্গে মরে। তারপর তার মনে সংস্কার চেপে

বসে— কোনো শত্রুমন তার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ছিল। সেদিন শোকের চেয়ে রাগে প্রতিহিংসায় তার গা জ্বলছিল। সেই ঘাতককে পেলেই যোগ্য জবাব দেবে। সংস্কারগত এভাবে কিছুদিন কাটার পর তার মনে হয়েছিল এসব মিথ্যা; তাই সে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগল। তারপর শেষ পর্যন্ত জীবনটা ওভাবেই কাটতো যদি না সেই কুম্ভণে সেই ফিরিঙ্গীটি তার কসাইখানায় না আসতো। গোলাম কাদেরের কথা—

“শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মতো চোখের পর্দার উপর দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম — এই সেই নৃসংশ রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মতো সে সকল দৃশ্য আমার চোখের উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জমান জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রুর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪)

গোলাম কাদেরের কসাই জীবন-ইতিহাসের পটভূমিকায় ছেদ পড়ে এবং তারপর সে যার কথা বলতে শুরু করেছে তার নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দকী। গোলাম কাদের গল্প-শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলেছে আমি যে মির্জা দাউদ তা ভুলুন। বর্তমান জীবনে যে গোলাম কাদের নামে পরিচিত ব্যক্তি সেই-ই অতীত অর্থাৎ পূর্বজন্মে মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দকী নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান জীবনে গোয়া থেকে আগত ফিরিঙ্গীটি হ'ল ভাস্কো-ডা-গামা। মির্জা দাউদ জাতিতে মূর, আর ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগীজ বণিক। কালিকটের বন্দরে উভয়ের দেখা। ঘটনার সূচনা ও ক্রমপরিণতি এই দু'জন শ্রেষ্ঠীর জীবন-কাহিনিকে অবলম্বন করে। কালিকটে মির্জা দাউদ -এর শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ ইসলামী রীতিতে তৈরি। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও পিতা জীবিত। কিন্তু তিনি সুদীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে কালিকটকেই মাতৃভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ধর্মে তিনি মুসলমান হলেও এক পত্নীক। এতে তাঁর নিষ্ঠুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পত্নীর নাম শালেহা। একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। যেকোনো মির্জা দাউদের মতো সর্বজন সম্মানীয় ব্যক্তি দ্বিতীয়টি নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে সম্মান করেন। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁকে বন্ধুর জায়গায় স্থান দিয়েছেন। দিনের পর দিন ব্যবসায় প্রচুর লাভ হচ্ছিল। সব মিলিয়ে সুখী জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। বিদ্যায়ও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাই।

পর্তুগীজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামা অতিশয় ধূর্ত ও চতুর। অসিবিদ্যায় নিষ্ঠুরতায়

প্রতিহিংসাপরায়ণতায় পারঙ্গম লুঠ করতেও সে সমান দক্ষ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিপরীতধর্মী দু'টি চরিত্রের বৈপরীত্যের ছবি এঁকে তাঁদের জাতীয় জীবন ও ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। ক্ষমতা ও সম্পত্তি দখলের নেশায় পরস্পর বাক্যুদ্ধ ও শেষে অনিয়ুক্ত কালিকটকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

ভাস্কো-ডা-গামা অসি-চালনায় পরাস্ত হয়। মির্জা দাউদ তাকে ইচ্ছে করলেই মেরে ফেলতে পারতো কিন্তু তা করেনি। দেশ ছাড়ার অঙ্গীকারে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভাল মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে মরতেও হয়। কথায় বলে শত্রুর চিহ্ন রাখতে নেই।

মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে মক্কা শরীফ দর্শন করলেন। তারপর সকলে মিলে কালিকট হয়ে ফিরছিলেন। সমুদ্রে পোর্তুগীজ জলদস্যুরা তাদের জাহাজ ঘিরে ফেলে। ভাস্কো-ডা-গামা এই দস্যুদলের নায়ক। মির্জা দাউদকে এবার ভাস্কো-ডা-গামা আর কোনো সুযোগই দিল না। সমস্ত ধনরত্ন দেওয়া সত্ত্বেও ভাস্কো-ডা-গামার অকারণ নিষ্ঠুরতায় জাহাজ শুদ্ধ লোক প্রাণ হারল।

পোর্তুগীজ দস্যুদের কামানের গোলায় মির্জা দাউদের জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। একে একে তার কন্যা-স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। “ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মতো উচ্চ হাসি হাসিতেছে।”

সূর্য পশ্চিম আকাশ ছোঁয় ছোঁয় আকাশ এবং সমুদ্র গরম রক্তের ন্যায় রাঙা হয়ে উঠেছে। পোর্তুগীজদের কামানের গোলায় জাহাজ এবার ধীরে ধীরে সমুদ্র গর্ভে বিলীন যাচ্ছে। যাত্রীদের অসহায় মৃত্যু দৃশ্য লেখকের বর্ণনায়—“যাত্রীদের উর্ধ্বাখিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ত্রীড়া করিতে লাগিল।”

পোর্তুগীজদের কামানের গোলায় মির্জা দাউদ ও তাঁর পরিবারের নিরীহ মানুষদের রক্তপাত সমুদ্রের জলকেও রক্তবর্ণ করে তুলেছে। সূর্যাস্তের রঙ আর সমুদ্রের রক্তবর্ণ জল সমধর্মী হয়ে উঠেছে। ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পটিতে সে ভাষাই ব্যক্ত হয়েছে। এতাই ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ নামটি বহন করে কথাকারের ভাষায়—“সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্ত রেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত হইতেছে। .... সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, পৃ. ৪৮-৪৯)

প্রধানত পঞ্চদশ শোড়শ-শতক ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পটির পটভূমি। ভাস্কো-ডা-গামা, কালিকট প্রভৃতি নাম তার সাক্ষ্য দেয়। গল্পটি বর্ণনাধর্মী হলেও গল্পের ঘটনা, সরস ভাষা পাঠককে আকর্ষণ করেছে। শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষায় সংস্কৃতজাত তৎসম শব্দ ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ থাকলেও ঋজু

ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। রসাবেদনের নিরিখেও গল্পটির সার্থকতা লাভ করেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ‘রক্ত-সন্ধ্যা’য় ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ‘ফিরিঙ্গী বণিকে’র সাহায্য নিয়েছিলেন তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও শরদিন্দু রচিত ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ নামক গল্পে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জলপথে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনের বিষয়টি দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলেন। ‘পদসঞ্চার’ উপন্যাসটি তারই ফসল। মির্জা দাউদ ও ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র-চিত্রণে লেখকের পরিণত মানসিকতার ছাপ বর্তমান। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ঘটনার অনুসারী রূপে অঙ্কিত এই চরিত্র দুটি। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথমনাথ বিশীর স্মরণযোগ্য—

“... ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘চুয়াচন্দন’ গল্প দুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে। ভাস্কো-ডা-গামার আমলের গোয়া নগর এবং তথাকার লোকজন এমন জীবন্ত ভাবে লেখক আঁকিয়াছেন যে তাঁহাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। হয়তো এসব তথ্য তিনি ইতিহাস হইতে পাইয়াছেন কিন্তু এ প্রাণ তো ইতিহাসের গ্রন্থে ছিল না।”<sup>১৫</sup> যথার্থই বলা যায়, শরদিন্দুবাবু ইতিহাসের প্রকৃত মেজাজকে এগল্পে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। শরদিন্দুবাবু রবীন্দ্রোত্তর ও অতীত অনুসারী হলেও বর্তমানের মেজাজ ও প্রবণতাটিকে তিনি ভোলেন নি। এ প্রসঙ্গে প্রথমনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

“... কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের, গল্পের যে ফ্রেমটির মধ্যে এই গোয়া নগরের কাহিনীকে তিনি আঁটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার এক মাংস বিক্রেতা ও গোয়া নগর হইতে আগত এক পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গীর খুনোখুনীকে লেখক অপূর্ব প্রতিভাবলে বহু শতাব্দীর পূর্বেকার ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদের সঙ্গে জড়িত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি বলে, ইহা অসম্ভব; সংস্কার বলে — সম্ভব হইতেও পারে। বিজ্ঞান বলে, ইহা মিথ্যা; আর্ট বলে, ইহা সত্য। লেখক গল্প লেখায় আর্টের সাহায্যেই ইহা সত্য করিয়া তুলিয়াছেন; পড়িবার সময়ে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।”<sup>১৬</sup>

প্রথমনাথ বিশীর এই মন্তব্য অতিশয় যথার্থ। কাহিনি নির্মাণ, অতীতের প্রেক্ষাপট তৈরি, চরিত্র চিত্রণ এবং ভাষাবোধ তাঁর শিল্পকুশলতার প্রধান গুণ। আসলে শরদিন্দু যথার্থ আর্টিস্ট। বলা যায় ব্যক্তি শরদিন্দু হলেন স্টাইলের বাহক।

ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সরস গল্প হ’ল ‘চুয়াচন্দন’। শরদিন্দু কৃত এই গল্পটিতে ইতিহাসের অনুষঙ্গ কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু হয়ে উঠেনি। বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক বড় হয়ে উঠেছে ইতিহাসকে ছাপিয়ে। মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি পাঠে চৈতন্যদের সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে আমাদের। কিন্তু ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটিতে লেখক কিশোর নিমাইয়ের প্রথম জীবনকে ংকেছেন মধ্যযুগীয় চৈতন্য-দেবের পরিচয়ের বাইরে গিয়ে। ‘চুয়াচন্দনের’ পটভূমি ১৫০৪ অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। নিমাই পণ্ডিতের বয়স যখন আঠারো

বছরের নিমাইকে নিয়ে এই চমৎকার গল্পটি লিখলেন। গল্পটি রচনায় প্রাক-মুহূর্তের চিন্তায় লেখকের উৎসাহের বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে— “চুয়াচন্দন লিখে (খুব তৃপ্তি) হয়েছিল। মুঙ্গেরে স্কুলের টিচার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ’বার লিখেছিলাম। যতক্ষণ না লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শান্তি নেই।”<sup>৭</sup>

কিশোর নিমাই ও তাঁর আমলের কাহিনি চিত্রাঙ্কনে গল্পটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। আমরা জানি নিমাই পণ্ডিত পরবর্তীকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নামে পরিচিত হন। এমনকি ভক্তের চোখে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; তিনি অবতার স্বয়ং ভগবান। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব মানুষকেই প্রেম বন্যায় ভাসিয়েছেন চৈতন্যদেব। আদিজ-চণ্ডালকে কোলে তুলে নিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ, হরে মধুর কৃষ্ণ ধ্বনিতে মানুষকে প্রসন্ন করেছেন। জগাই-মাধাইকেও মাপ করেছেন। উল্লেখ্য, কাজী সাহেবও চৈতন্যের সঙ্গে সাধ দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলায় ষোড়শ শতকের ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার দিনে পরিত্রাণ কর্তা তথা নররূপী নারায়ণ হিশেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। চৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কারক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নিমাই পণ্ডিতের সন্ন্যাস জীবন ও ধর্ম সাধনার কথা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আপামর .... কাছে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি চৈতন্যদেবের স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথ ধারণার পরিচয় দেয়— “শ্রীচৈতন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি যুগের প্রতিনিধি—শুধু একটা যুগের প্রতিনিধি নন, সর্বযুগের প্রেমভক্তি, ত্যাগ-তীক্ষ্ণতার একমাত্র প্রতীক বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।” (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০১-২০০২, পৃ. ৮০) পূর্বেই বলেছি শরদিন্দুবাবু চৈতন্যদেবের গোড়ার জীবন নিয়ে আলোচ্য ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটি রচিত। ফলে চৈতন্যদেব সম্পর্কে মানুষের চিরাচরিত ভাবনার বদল ঘটেছে। নিমাই পণ্ডিত এখানে বুদ্ধিদীপ্ত প্রগতিশীল চরিত্র। শুধু কি তাই? তাঁর সহাস্য কৌতুকময় তার দিকটিও আমাদের আকর্ষণ করে। বিষুগপ্রিয়ার চরিত্রও উদার ও স্নেহশীল। চরিত্রটি এখানে কিছুটা প্রগল্ভ। লেখকের কথায়— “তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্ক ও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। একজন অতি গৌরবাস্তি যুবা বয়স বিশ বছরের বেশি নয় — তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরূণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক এক সঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।”

প্রাসঙ্গিকভাবে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটিও যথার্থ—

“চুয়াচন্দন চৈতন্যদেবের আমলের নদীয়ার একটি কাহিনী। যেমন রোমান্টিক তেমন

বাস্তব; কিন্তু ইহার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে কিশোর চৈতন্যের চিত্রটি, চৈতন্যদেবের যে মুণ্ডিত মস্তককৌপীন সম্বল মূর্তির সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, এ চিত্র সে চিত্র নয়। এ সেই দুর্দান্ত বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্তিমান ভয়স্বরূপ, দেব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, এক ডুবে গঙ্গাগর্ভ নিমজ্জিত-পণ্ডিতদের টিকি ধরিয়া টানিয়া তোলা, প্রচুর হাস্যে প্রগল্ভ সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চৈতন্যদেবের চিত্র। চৈতন্যদেব যে এমন ছিলেন তাহা কোন কোন বৈষ্ণব লেখকের জীবনী হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে সে ছবি দেখি নাই। যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, তিনি আবার একদিন অন্ধকার রাত্রে মাঝগঙ্গায় চন্দনের সহিত চুয়ার রাক্ষস-বিবাহ দিয়াছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই। যাঁহারা চৈতন্যদেবের গতানুগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।”<sup>১৮</sup>

কিশোর সহাস্য প্রগল্ভ অথচ বিদ্বান নিমাই পণ্ডিত সমাজে জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। জমিদারের অত্যাচারী ভাইপো মাধবের কামনার দৃষ্টি এবং ব্যভিচারী মিথ্যাচারী থেকে তান্ত্রিকের দেহ সাধনার করাল গ্রাস থেকে ষোড়শী কন্যা চুয়াকে উদ্ধার করে রূপচাঁদ সদাগরের পুত্র বণিক চন্দন দাসের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস পরবর্তী এই কাজ সম্ভব নয়। ফলে গল্পকার শরদিন্দুবাবু মনস্থির করেছেন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পূর্ব কিশোর জীবনকে নিয়ে গল্প রচনা করা। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ছোঁয়ায় ইতিহাসকে পটভূমি করে সেকালের সামাজিক চিত্রকে অনবদ্যভাবে আমাদের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছেন। অন্য এক ব্যতিক্রমী চৈতন্যদেবকে পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তিনি। গল্পটির কাহিনির আকর্ষণ সর্বস্তরের পাঠককে আকর্ষণ করে।

নদীয়া নগরের ধর্মীয় পরিবেশে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তार्কিক, ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত, মুণ্ডিত মস্তক, টিকিধারী গৌঁসাই-তন্ত্রের কথা। পাণ্ডিত্যের শুষ্ক-আস্ফালন দাপটই তাদের পুঁজি অবলম্বন। কখনো কখনো তর্ক এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যে, দেশে অরাজক অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। গৌঁসাই-তন্ত্রের চিরাচরিত ধারাকে কৌতুককর করে তুলেছেন। সমাজে গৌঁসাই-পণ্ডিতদের বাড়াবাড়ি শরদিন্দুবাবু ভালভাবে নেননি। প্রকৃত গৌঁসাই তাঁর কাম্য ছিল। ফলে শরদিন্দুবাবু বাসুদেব সার্বভৌমকে গল্পে এনে গৌঁসাই পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারের জবাব দিয়েছেন। বাসুদেব সার্বভৌম প্রকৃত অর্থে পণ্ডিত, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। মূলত নবদ্বীপে তিনি আসার পর থেকেই প্রকৃত জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। কিশোর নিমাই পণ্ডিতও তार्কিক গৌঁসাইদের উপযুক্ত

জবাব দিয়েছেন। আচার সর্বস্বতাও রক্ষণশীলতা এই জাতীয় গৌঁসাইদের মূল মন্ত্র। ফলে নিমাই পণ্ডিতকে তারা ঈর্ষ্যা ও ভয়ের চোখে দেখে। বলা যায়, লেখক নদীয়া নগরে তথা বাংলার সমাজ পরিবেশে প্রকৃত ধর্মের নীতি-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরণের গল্প রচনা করেছেন। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল, অজাচার তা তিনি মানতে পারেন নি। গল্পের তার পরিচয় পাই— “মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উথিত হইয়াছে — তাহাই আকর্ষণ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ মত্ততায় অধঃপথের পানে স্থলিত পদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান, তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ-মকার উদ্দামনৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১১৮) সমাজে শক্তিমান মানুষেরাই যখন এই খেলায় মত্ত তখন সাধারণ মানুষকি বাদ পড়বে? লেখকও সেই প্রশ্নই এখানে উত্থাপন করে সেদিনের অরাজক, উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের গ্লানিময় দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তন্ত্র সাধনার মূল উপজীব্য বামাচারী। নারী সাধনাই একমাত্র কাম্য। দেহ ও মন্ত্রই তন্ত্রসাধনার রাজ কর্ম। লেখক গল্পে মাধাই ও চাঁপাকে এনে সেই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই ঘটনার বিপ্রতীপে সদর্শক মানসিকতার ছাপও বর্তমান। কদাচার, সজাচার ভ্রষ্টাচারমুক্ত সমাজ পরিবেশ গঠনের কথাও এগল্পে ধরা পড়ে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকটিই কাম্য। ফলে গল্পটিতে সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যশালী বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় পাই। সংস্কৃতির আদান-প্রদানে বাংলার ভূমিকায় যথেষ্ট। প্রাচীন সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার উচ্চমানের পীঠস্থান মিথিলার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক সুদীর্ঘ দিনের। মিথিলায় গিয়ে বঙ্গজ সন্তানের বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রচর্চা করতেন তার পরিচয়ও গল্পে পাই। শরদিন্দুবাবুর মৈথিলি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথা জানা যায়। বিশেষত বিদ্যাপতির ‘বৈষ্ণবপদ’ তাঁকে আকর্ষণ করে। ‘চুয়াচন্দনে’র একটি ঘটনার জন্য বিদ্যাপতি ঠাকুরের কাছে লেখকের ঋণী থাকবার কথাও জানা যায়—

“তঁহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল

কহত হার টুটি গেল।

সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু

শ্যাম দরশ ধনি কেল।”<sup>১৯</sup>

তাছাড়াও ‘চুয়াচন্দন’ গল্পে বিদ্যাপতির কয়েকটি ‘পূর্বরাগে’র পদ পাই। এখনও যাদের ব্যবহার গলেপের মূল কাহিনিকে তরাণিত করেছে। উল্লিখিত ছুয়া সম্পর্কে অনুরাগ ও আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

পদগুলি ব্যবহারে গল্পের কাহিনিও অনেকটা মোড় নিয়েছে।

গল্পের পটভূমিকা হিশেবে পাঠান আমলের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের চিত্র পাই। গল্পে বণিকপুত্র চন্দনদাসের কথায় সে বিষয়টিই উঠে এসেছে। চন্দনদাস বাণিজ্য থেকে ফিরে আসার সময় নবদ্বীপ ঘাটে নেমে নগর ভ্রমণে বের হয়ে ষোড়শী চুয়াকে দেখে আকৃষ্ট হয়। এমনকি আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে চুয়ার বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে। চুয়াচন্দনের কাহিনি এখানে ইতিহাসের খোলস ত্যাগ করে সাধারণ নরনারীর ভাললাগা-মন্দলাগার কাহিনি হয়ে উঠেছে। প্রেমের আকর্ষণে চন্দনের মানসিক পরিবর্তনের পরিচয় পাই। শেষ পর্যন্ত চুয়া সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা জেনে চুয়াকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছে। জমিদারের ভাইপো মাধব অত্যাচারী। সে সবাইকে ভয় দেখায়। মানুষের ক্ষতি করতে তার দ্বিধা নেই। স্বচ্ছাচারী, অসহিষ্ণু। তদুপরি চন্দন দাস সব কিছুকে উপেক্ষা করে চুয়াকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও কৌশলকে আশ্রয় করে নিমাইয়ের সহযোগিতায় চন্দন দাস চুয়াকে উদ্ধার করে বিয়ে করে। স্বয়ং নিমাই পণ্ডিতই ছিলেন এই শুভ কাজের পুরোহিত।

নিমাই চরিত্রটি অত্যন্ত Dynamic এবং active। চুয়া ও চন্দনদাসের বিয়ে দিয়ে সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি প্রগতিশীল সমাজ গঠনের কাজটি করেছেন তিনি। আধুনিক মনন নিয়ে একটি কিশোরী মেয়ের কথা ভেবে তার বিয়ের ব্যবস্থা করাটা নিমাইয়ের সামাজিক কাজ বলে মনে হয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের ২৭ জুলাই সিনেমা জগতে প্রবেশ করেন। চিত্র নাট্য লিখে উপার্জনও করেন কিছুটা। সিনেমার জন্য গল্প লেখার তাগিদ তাঁর মনে থাকা সম্ভব ছিল। সে জন্যই তাঁর লেখাগুলিতে চিত্র নাট্যের রূপ বর্তমান। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটিতেও চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। গল্পটি একটু-আধটু বদল করলেই চলচিত্রের রূপ নিতে পারে। একজন প্রতিভাধর প্রযোজক ও কাহিনি লেখক তা করতেও পারেন।

প্রসঙ্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি সৃষ্টির কারণ হিশেবে জানিয়েছেন—“চুয়াচন্দন লিখে (খুব তৃপ্তি হয়েছিল। মুগ্ধেরে স্কুলের টিচার শশীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ’বার লিখেছিলেন। যতক্ষণ বা লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শান্তি নেই। চুয়াচন্দনের শান্ত সুচিন্তিত প্রেমের আবেদন কল্পনার চুয়াচন্দনের কাহিনি বাস্তবরূপ ও পাঠককে আকর্ষণ করে। তিনি গল্পটি রমণীয় করে তুলেছেন ইতিহাসকে নামমাত্র ব্যবহার করে। ভাষাকে বাহক হিশেবে মনে করে শরদিন্দু তাঁর রচনা গভীর সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পটিতে সেই বৈশিষ্ট্য

লক্ষণীয়। (জীবন কথা : অমনিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্প-পরিচয়, পৃ. ৪২৪) গল্পটি খুবই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল। নবদ্বীপের ও তাত্ত্বিকতার পটভূমিতে লেখা এবং বিস্মৃতপ্রায় বাঙালীর সুদূর দেশে বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী এই উভয়ে মিলিয়া যে একটি সুপারিকল্পিত কাহিনীকে খাড়া করিয়াছেন তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক।”<sup>২০</sup>

বাঙালি জীবন ও বাঙালির ধর্ম, শিক্ষা, বাণিজ্য ও ধর্মের উচ্ছ্বলতা, নরনারীর প্রেম ইত্যাদি চমৎকার ভাবে চিত্রিত হয়ে উঠেছে ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটিতে। গল্পের নামকরণও যথার্থ। চরিত্রকেন্দ্রিক হওয়ায় গল্পের মর্মসত্য উজ্জ্বলরূপ পেয়েছে। তদুপরি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ হওয়ার কারণে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্নাতক পর্যায়ে) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গল্পটির মান বেড়েছে।

নিমাই চরিত্র লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব। নিমাই পণ্ডিতের বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি সহাস্য কৌতুকপ্রিয় নিমাই অধিকতর প্রাণবন্ত। চন্দনদাসের সঙ্গে চুয়ার মাতামহী বুড়ির সহাস্যকৌতুক বাচন ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। বুড়ি মিষ্টি মধুর কথায় বলে চন্দন দাস আকৃষ্ট হয়েছিল। কৌশলে চন্দনদাস কাজ হাসিলের লক্ষে নিজেকে বুড়ির নাতি বলে পরিচয় দেয়। চুয়াকে চন্দনদাসের গোচরে আনে। বুড়ির চরিত্র যুগপদ কৌশলী ও চতুর। বুড়ির কথাবার্তা শুনে চন্দনদাস ধীরে ধীরে চুয়ার প্রেমে পড়ে। অতঃপর চুয়া চন্দনের প্রণয়, উদ্ধার, বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা গল্পটির পরিণতি। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটি একটি সার্থক প্রেমের গল্প হিশেবে ব্যাখ্যাত করতে পারি। কারণ গল্পে পাই চুয়া ও চন্দনদাসের প্রেম সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। পাশাপাশি চৈতন্যদেবের পৌরহিত্যে বিয়ের বিষয়টিও অতিশয় চমৎকার।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরদের নিয়ে ‘চুয়াচন্দনে’র পর শিবাজীকে কেন্দ্র করে ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি রচনা করলেন। শিবাজীর জীবন ও কর্ম ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটির উপজীব্য বিষয়। ইতিহাস অনুষঙ্গ থাকলেও ইতিহাস প্রকট নয়। ইতিহাস গল্পের পটভূমি মাত্র। সময়কে নির্দিষ্ট ভাবে বোঝানোর জন্যই এতে ইতিহাস ব্যবহৃত হয়েছে। অতীত ইতিহাসকে সরিয়ে রাখলে এই জাতীয় গল্পে লক্ষ করা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব জীবনেরই কোনো না কোনো নিগূঢ় সত্য। ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটিতেও সে কথাই ব্যক্ত। শক্তি নয়, বুদ্ধি ও যুক্তিই বড় কথা। শিবাজীর চরিত্রে অন্তত সে সত্যই ধরা পড়ে। শিবাজীকে ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটিতে লেখক অত্যন্ত যুক্তিবাদী, প্রতিভাধর এবং দূরদর্শী চরিত্র রূপে এঁকেছেন। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পের কিশোর নিমাই আর ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পের কিশোর শিবাজী একে অপরের দোসর। উভয়ের ব্যক্তিত্ব, সংস্কারমূলক মানসিকতা, সাহস ও নেতাজনোচিত মনোভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দু’জনকে একাননে বসিয়েছে। শরদিন্দুবাবু শিবাজীর কিশোর জীবনের ছবি আঁকতে জানান— “বাঘের বাচ্চা’র মূল

কথাটি Elphinstone এর History of India -র একটি পংক্তিতে পাওয়া যায়। অন্য কোথাও উহার উল্লেখ আছে কিনা জানি না। স্যর যদুনাথের ‘শিবাজী’তে কিছু নাই।”<sup>২১</sup>

গল্পে কিশোর শিবাজীকে প্রধান উপজীব্য চরিত্র হিসেবে এঁকে গল্পের স্বাদ বকলে দিয়েছেন। কিশোর শিবাজীর অশ্বচালনায় দক্ষতা, দস্যুবৃত্তির নৈপুণ্যতা, ঘন জঙ্গল ও খাঁড়া পাহাড়ের প্রান্ত অশ্বদৃষ্ঠে পথ চলা রোমান্স কাহিনিকেই স্মরণ করায়।

ইতিহাসের যোদ্ধা শিবাজীর কিশোর জীবনের কথায় ধরা পড়ে শিবাজীর দক্ষতা ও শারীরিক ক্ষমতার কথা। কিশোর শিবাজীর শারীরিক গঠনের পরিচয় লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই চমৎকার। তাঁর মুখের গঠন অতিশয় তীক্ষ্ণ, শ্যামবর্ণ, বয়স প্রায় ষোল। পাশাপাশি তাঁর দৈহিক গঠনভঙ্গিটি অসাধারণ— মৃদঙ্গের মতো মুখ, তীক্ষ্ণ নাক, শিকারীর মতো উজ্জ্বল ঘন কালো চোখ। হঠাৎ তার মুখ দেখলে কঠিন ধারযুক্ত বাঁকা তলোয়ারের কথা মনে পড়ে। বেঁটে শরীরেও অত্যন্ত শক্তি। হাত হাঁটু পর্যন্ত। তেজী ও পেশীবহুল হাত ঘোড়ার পিঠে বসে মাটিতে হাত বাড়ালে পাথরও তুলতে পারে। শিবাজী সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

“ ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পে কিশোর শিবাজীর চিত্র পাওয়া যায়। কিশোর শিবাজীকে আমরা কোথাও দেখি নাই। শিবাজীর শরীরের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য রকমে বস্তুগত। শিবাজীর দেহের উর্ধ্বার্ধ যে নিম্নার্ধের অপেক্ষা সবল ও পুষ্ট ছিল, ইহা শরদিন্দুবাবু কোথাও পড়েছেন কিনা জানি না; কিন্তু শিবাজীর অশ্বারূঢ় চিত্র দেখিলেই এই কথাটি মনে হয়। বোধ হয় ইহা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেরও প্রতীক। শিবাজীর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহার নিম্নার্ধ বা ভিত্তি অস্পষ্ট ছিল, ইহাই বোধ করি তাহার সবচেয়ে বড় কারণ। এই গল্পে আমরা দেখিতে পাই শিবাজীর human জ্ঞান ছিল। বোধ করি অধিক বয়সেও তিনি এ শক্তি হারান নাই। নতুবা আওরঙ্গজেবের কয়েদ হইতে সন্দেশের ঝুড়ি করিয়া পালাইবার বুদ্ধি তাঁহার মনে আসিত না।”<sup>২২</sup>

শিবাজীর এহেন চরিত্র আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও গল্পের প্রয়োজনে রোমান্স বীরের বৈশিষ্ট্য আরোপ করায় তা হয়ে উঠেছে বিশ্বাসযোগ্য। গল্প বৃদ্ধের মুখ দিয়ে গল্প বলানোর রীতি শরদিন্দুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘোড়ার পিঠ চলতে চলতে গল্প পিপাসু কিশোর শিবাজী বৃদ্ধ দাদোর কাছে গল্প শুনতে চায়— “এবার আমার মা’র বিয়ের গল্প বলো।” এর জবাবেই বৃদ্ধ দাদো গল্প বলতে শুরু করে। তোমার মা জিজা যদুবংশের কন্যা। দাক্ষিণাত্যে এরকম বংশ কমই আছে। প্রথানুযায়ী ‘ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী’ উৎসবে দোল পূর্ণিমার দিন

আবীর খেলা হ'ত। বংশ পরম্পরায় রাজপুত্র বংশে দোল-উৎসবে আবীর খেলার রেওয়াজ আজ অবধি চলে আসছে। উৎসবে সবাই যখন মত্ত, মদ্যাসক্ত আসক্ত ঠিক ঐ সময় দক্ষিণাত্যের হিন্দু সম্রাট লখুজীর কন্যা জিজার সঙ্গে তোমার বাবা শাহজীও আবীর খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। পরস্পর পরস্পরকে মুখে-গালে আবীর রাঙিয়ে দেয়। আবীর মাথা শরীরে উভয়ে যখন সকলের সামনে যুগল মূর্তি রূপে উপস্থিত হয় তখন লখুজী সহসা বলে ওঠে— “লখুজী উচ্চ হাস্য করে উঠলেন, তারপর দু'টিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন, ‘রাধা-গোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এ দু'টির বিয়ে হলে কেমন মানায় বলুন তো?’” পানাসক্ত লখুজীর এই কথার জবাবে তোমার ঠাকুর্দা মালোজী ভোসলে এক কৌশলের আশ্রয় নেয়—উপস্থিত সকলের সামনে বলে ওঠে — “মহাশয়গণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, লখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগদত্তা করলেন।” — এতে লখুজীর নেশার ঘোর কেটে যায়। প্রচণ্ড ক্ষোভে বিরমিতে জ্বলতে থাকে এবং হুংকার দিয়ে বলে এত বড় স্পর্ধা মালোজীর — এটা তার কল্পনার অতীত। কিন্তু উপায় নেই লখুজী স্বয়ং উচ্চারণ করেছেন। সকল পারিষদবর্গ নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে লখুজীর সঙ্গে তোমার ঠাকুর্দার দ্বন্দ্ব বাঁধে। কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না। লখুজী জিজার বিয়ের সম্বন্ধ অন্য দু'-এক জায়গায় স্থিরও করেছিল। কিন্তু তা হয়নি। এদিকে কিশোরী জিজার বয়স তেরোতে পা দিয়েছে। অনেক মনমালিন্যের পর জিজার পিতা লখুজী তোমার ঠাকুর্দাকে ডেকে জিজাকে পুত্র বধূর সম্মতি দেয়। অবশেষে তাদের বিয়ে হয়। এই জিজাবাই-শাহজীর কাহিনি লেখক অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন। এই ‘গল্পের মধ্যে গল্পটি’ পাঠককে আদ্যন্ত ধরে রেখেছে। শরদিন্দুবাবুর প্রায় বেশির ভাগ গল্পে ‘গল্পের মধ্যে গল্প বলা’ ভঙ্গিটি লক্ষণীয়— যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটিও এই গুণেই পাঠকের আকর্ষণ বাড়ায়।

গল্পের মধ্যে ঘন অরণ্যের যে অপরূপ ছবি পাই তা গল্পটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। গল্পের কাহিনি অনুসারী অরণ্যের বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ করে। গল্পে বর্ণিত দাদো কোণ্ডুর চরিত্রও অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তার সরস, সন্দিগ্ধ বাক্য ও স্নেহপূর্ণ আচরণ সত্যিই ‘দাদু-নাতি’র সম্পর্কের মধুরতাকে চকিতে হাজির করায়। মাওলী চাষা দেওরাম ও তার মেয়ে নুনা, বিণ্ডিয়া, তানাজী ছোট খাটো সব চরিত্রই উপযুক্ত রূপে অঙ্কিত। শিবাজীর মা জিজাবাই চরিত্রটি আড়ালে থাকলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবাজীকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সর্বোপরি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা শিবাজীকে মায়ের ভক্ত করে তুলেছে।

সপ্তদশ শতকে শিবাজীকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, ঔরঙ্গজেবের পতন, মারাঠা

জাতির আত্মজাগরণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে লেখা ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি। ঐতিহাসিক উপাদান থাকলেও লেখকের ইতিহাস কল্পনার প্রাধান্যই বেশি। ফলে গল্পটি ইতিহাসের পটভূমিতে আটকে না থেকে কিশোর শিবাজীর দৃঢ়তা যুক্তিসিদ্ধ আচরণ, মানবিকতাবোধ ও বীরত্ব তার ব্যক্তিত্বের পরিচায় বহন করে। কিশোর বয়সে যে উচ্ছ্বাস আত্মফালন, বন্ধাহীন ভাবাবেগ ও যুক্তিহীন মনোভাব থাকে, তার বৈপরীত্যে লেখক শিবাজীকে অঙ্কন করে কিশোরদের পরিণত ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। গল্পটি কিশোরদের গল্প অন্যান্য শিশু কিশোর গল্পের তুলনা হলেও কৈশোরের প্রণবতাগুলি এতে নেই। ফলে গল্পটির আবেদন ব্যতিক্রমীধর্মী।

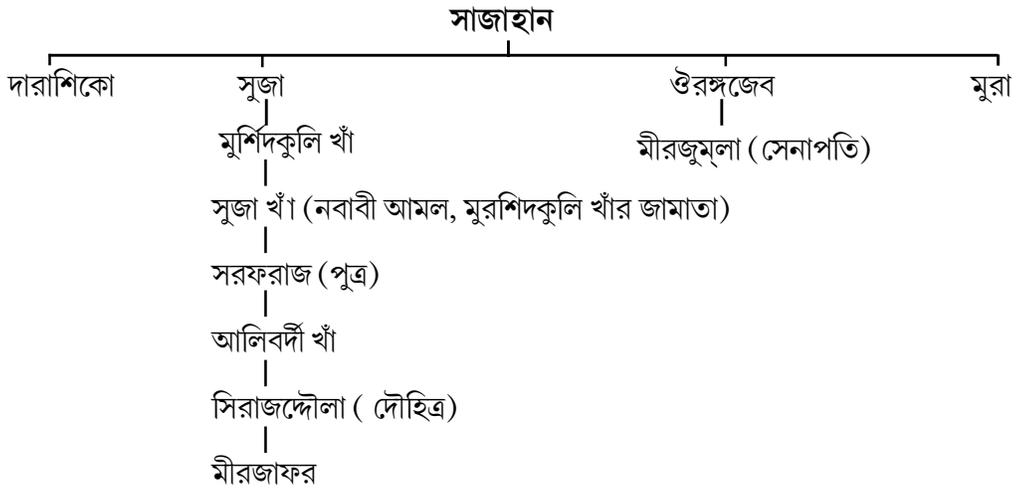
গল্পটির পটভূমি নির্বাচনে, চরিত্র-চিত্রণে, গল্প কৌশলে, গতিময় ভাষার ব্যবহারে ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি শুধু শিশু কিশোরদের আকর্ষণ করে না যেকোনো স্তরের পাঠকের মন কাড়ে। মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাক— “‘চুয়াচন্দনে’র গল্পগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ‘বাঘের বাচ্চা’—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহাকেই বলে 'reconquest of antiquity'। ইহা আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।”<sup>২৩</sup>

শরদিন্দুর এই জাতীয় ইতিহাস-মূলক ছোটগল্পগুলিতে ইতিহাসের পাশাপাশি রোমাঙ্গরসের ব্যবহার লক্ষণীয়। রোমাঙ্গের ব্যবহার কখনো কখনো ইতিহাসকে লঘু করে দেখায়। যেমন— ‘রুমাহরণ’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘সেতু’, ‘মরু ও সঙঘ’ ও ‘বিষকন্যা’ ইত্যাদি। উল্লিখিত গল্পগুলিতে দূরাচারী অতীত ইতিহাসের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় রোমাঙ্গ ও আধুনিক রোমাঙ্গের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কিন্তু আলোচ্য ‘তক্ত মোবারক’ গল্পটি একটু অন্য ধরার। এখানে ইতিহাসই মুখ্য। ইতিহাসকে ঘিরেই গল্পের সূচনা, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। রোমাঙ্গের প্রসঙ্গ নেই এই গল্পে। লেখকও জানিয়েছেন— “ ‘তক্ত মোবারক’ ঐতিহাসিক কাহিনী। পূর্বে আমি যত ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়াছি, রোমাঙ্গই ছিল তাদের লক্ষ্য; তক্ত মোবারক গল্পে ইতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছি।”<sup>২৪</sup>

মুঙ্গের গল্পটির পটভূমি। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রচিত এই গল্পটির। মধ্যযুগের মোঘল নীতি ও মোঘল হারেমের ধারাভাষ্য কাহিনী এটি। একটি ‘তকত্ সিংহাসন’ তথা তক্তসিংহাসনকে অবলম্বন করে গল্পের সূত্রপাত। লেখক বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে এই সিংহাসনটি মঙ্গলময় বা কল্যাণকর কিন্তু গল্পে তার বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। গল্পে সিংহাসনটি হয়ে উঠেছে অভিশপ্ত, ধ্বংসাত্মক ও নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনির প্রতীক। কারণ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের গ্লানি, কদর্যতা, ভ্রষ্টতা, নারীহরণ, নিষ্ঠুর হত্যা, বর্বরতা ইত্যাদি কালিমালিপ্ত ঘটনা ঐ সিংহাসনটির প্রত্যেকটি খোদিত পাথর সাক্ষী দেয়। পাশাপাশি নীরব, নিরুচ্চার অথচ বলিষ্ঠ

সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতীক রূপ এই তক্ত্ মোবারক সিংহাসনটি তার অতীত গৌরব ধরে রেখেছে।

লেখক ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে চেয়ে গল্পের তাৎপর্যকে বেশ স্পষ্টভাবে এঁকেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান শাজাহান ও তার পুত্রদের পারস্পরিক সিংহাসন দখলের লড়াই, অবিশ্বাস্য উচ্চাভিলাসী মনোভাব, অদম্য ভোগলিপ্সু বিলাস, বৈভব ও কুটিল নৃশংসতা মোঘল রাজত্বকে অনেকটাই শক্তি বিচলিত করে। ইতিহাসের সেই বিষয়টি গল্পটির প্রধান উপজীব্য। শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার সঙ্গে তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবের ভাতৃঘাতী লড়াই-এর ইতিহাসই মূল বিষয়-আশয়। এই দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি লেখক মধ্যবর্তীকালীন সুলতানদের কথাও কাহিনির প্রয়োজনে বর্ণনা করেছেন। একনজরে শাজাহানের পরবর্তী শাসকদের নাম সারণির সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক—



(শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, তক্ত্ মোবারক গল্পে প্রাপ্ত, পৃ. ২২৫)

তক্ত্ মোবারককে ঘিরে ভাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে উঠে। তবে গল্পকার সুজার তক্ত্ মোবারকের কাহিনিটিকে বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করে গল্পটিকে রমণীয় করে তুলেছেন। সুজা চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা, শক্তির দর্প যথাযথ রূপ পেয়েছে। গল্পের প্রথমাংশে জানা যায়— “তক্ত্ মোবারক — মঙ্গলময় সিংহাসন! কথিত আছে, এখনও গ্রীষ্মকালে এই সিংহাসনের পাষাণগাত্র বহিয়া রক্তবর্ণ স্বেদ ঝরিতে থাকে, যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হইতেছে। সেকালে মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, বাদশাহীর অতীত গৌরব গরিমা স্মরণ করিয়া তক্ত্ মোবারক শোণিতাশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। তক্ত্ মোবারকের শোণিত ক্ষরণের ইতিকথা আরও নিগূঢ়, আরও মর্মান্তিক।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২২৪) আবার পাশাপাশি লেখক জানান — “তক্ত্ মোবারকের মতো এমন অভিশপ্ত সিংহাসন বোধ করি

পৃথিবীতে আর নাই।” (তদেব)

এই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সুজার জীবনেতিহাস পরিব্যাপ্ত। শুধু সুজার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বিরুদ্ধেই নয়, ভ্রষ্টাচার রাজশক্তির বিরুদ্ধে, অমনুষ্যত্বের শক্তিদম্বের বিরুদ্ধে রক্তমাখা সিংহাসন প্রতিবাদের প্রতীক। দানবীয় শক্তির হাতে অসহায় ভাবে জীবন-হারানো মানুষগুলো জ্বালাময়ী প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদী নজর বোখারী তার পুত্র মোবারককে খুইয়েছে, হারিয়েছে পুত্রবধুকে। মোবারকের ঘাতক, মোবারকের স্ত্রী পরীবানুর লুণ্ঠক অত্যাচারী সুজাই আবার তার ওপর (নজর বোখারী) দায়িত্ব দিয়েছে মঙ্গলময় সিংহাসন তৈরি করতে। মনের তীব্র জ্বালা, যন্ত্রণা অসহনীয় দুঃখ, পুত্রশোক, পুত্র বধুর জন্য অসহায় বাক্যালাপ তিলে তিলে তাকে তুষের আগুনের মতো পুড়িয়েছে। আর সেই ক্রোধের ফসলই হ'ল চিরকালের অভিশপ্ত সিংহাসন তক্ত মোবারক। এই সিংহাসনে বসলেই পতন সুনিশ্চিত। ফলে সুলতান সুজারও পতন ঘটে। এই সিংহাসন দখল করে কেউই রাজত্ব করতে পারে নি — সকলেই মহাকালের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গল্পটির রমণীয়তা আমাদের আকর্ষণ করে। কারণ গল্পটির কাহিনি পাঠে তা বোঝা যায়। ‘তক্ত মোবারক’ একটি সিংহাসনের নাম। এই সিংহাসনটি সুজার নির্দেশে অসহায়ভাবে নির্মাণ করে প্রস্তর শিল্পী নজর বোখারী। মোবারক নজর বোখারীর একমাত্র পুত্র, পুত্রবধুও রয়েছে। পরম সুখে-শান্তিতে বাস করছিল এই ছোট্ট পরিবারটি। একদিন মোবারক পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে সুলতান সুজার রোষে পড়ে। মোবারক নির্ভীক, সৎ ও স্পষ্টবাদী চরিত্র। সুজার বর্বরোচিত ও অশোভন আচরণে মোবারক ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। সুলতান সুজার অকথ্য অভব্য ব্যবহারের প্রতিবাদ গর্জে ওঠে। এছাড়াও, ভাইয়ের হাতে পরাজয়ের কথা শুনিয়া খোটা দেয়। ফলে সুজা রাগ সামলাতে না পেরে মোবারকের মাকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা ব্যবহার করায় মোবারক হাতে থাকা ছিপ দিয়ে সুজার কপালে বারি মারে। এতে সুজা চরম রেগে গিয়ে খাপে ঢাকা তলোয়ার বের করে মোবারকের গলায় আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ মোবারকের মৃত্যু হয়। মধ্যযুগীয় বর্বরতা এতে প্রকাশিত। তাদের মানুষ কত তুচ্ছ কারো প্রাণ নিতেও মানুষের প্রাণ মূল্যহীন। এই বর্বর স্থূলতানদের কিছু যায় আসে না। সুজার চরিত্রের রূপ আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মোবারকের অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রীকে জোরপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। ক্ষমতাহীন, শক্তিহীন নজর বোখারী তার প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। সে জানে এটাই সুলতানদের রীতি তাই লোভ লালসার অন্ত নেই। বর্বরতা তাদের রক্তে। নজর বোখারী সুজাকে কি আটকাতে পারে? ফলে অসহায়ভাবে নিজের পুত্রের রক্ত দিয়ে অভিশপ্ত সিংহাসন তৈরি করেছে।

‘তক্ত মোবারক’ নামটি বিশেষ তাৎপর্য ও ইঙ্গিত বহন করে। নামকরণের বিষয়টিও

অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী। স্বেচ্ছাচারী সুজার তলোয়ারের আঘাতে মোবারকের অশরীরি আত্মাও সুজার এরূপ আচরণের, লালসা ও উদ্রগ্র কামনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। গল্পটির নামেই তা দ্যোতিত হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয় সুলতানী আমলের সুলতানী রীতি অনুযায়ী মুসলমান সুলতানদের ভোগলিপ্সু, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, উদ্রগ্র কামনা-বাসনা, নারীলিপ্সু, নিষ্ঠুর ও নির্দয়রূপ ইত্যাদি এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। তবে সব সুলতানই যে কামনা-বাসনা ও নির্দয়-নিহর ছিলেন তা নয়। মধ্যযুগের প্রেক্ষিত হলেও তা হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এই গল্পটি পাঠে শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসাশ্রিত গল্প ‘অমিতাভে’র কথা মনে পড়ে। মানব চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে সেখানে জানা যায়— “মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৬) ‘তজ্জ মোবারক’ গল্পেও সুলতান সুজা তারই উদাহরণ। কারণ অতিতুচ্ছ কারণে সে নিষ্পাপ-নির্দোষ মোবারককে হত্যা করেছে। মোবারক হত্যা, পুত্রবধূর ভাগ্য বিপর্যয়, পুত্রশোকের দ্বারা জর্জরিত নজর বোখারী চরিত্রটি অসহায়ভাবে তার কথায় সিংহাসন তৈরি করেছে।

‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’ এবং ‘মরু ও সঙঘ’ গল্পগুলিতে বৌদ্ধ অনুষঙ্গ, বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব, বৌদ্ধ-সঙঘের জীবন-প্রণালী হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, দ্বেষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকলেও ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটিতে বৌদ্ধ-ধর্ম ও ধর্ম-মাহাত্ম্যই প্রধান উপজীব্য বিষয়। অভিরাম ভিক্ষুর চরিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। আদ্যন্ত বৌদ্ধদেবের প্রকৃতরূপ কেমন ছিল সেটাই ছিল লেখকের উদ্দীষ্ট।

ভগবান বৌদ্ধের চন্দন-মূর্তিকে গল্পটির মূল কেন্দ্রে স্থাপন করে লেখক বৌদ্ধ ভিক্ষু অভিরামের বৌদ্ধ অনুরক্তের কথা প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধদেবের প্রকৃত মূর্তি কেমন ছিল— তারই সন্ধানে অভিরাম নিযুক্ত। দীর্ঘ অন্বেষণের পর তথাগতের প্রকৃত মূর্তির সন্ধান সে পায়। ভিক্ষু অভিরাম বিহারের জেতবনে ভগ্ন ইট আর পাথরের স্তূপের মধ্যে একটি শিলালিপির সন্ধান পান। প্রাপ্ত শিলালিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা রয়েছে তথাগতের প্রকৃত চন্দন-মূর্তি হিমালয়ের কম্পন প্রবণ জঙঘাদেশে অসুর শ্রেণির দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্মাশোকের আমলে নির্মাণ করেছিলেন। তিন মাসের পর অভিরাম গল্পকথক বিভূতিবাবুকে সব কথা খুলে বলে ও উভয়ে চন্দন-মূর্তির দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। ভুটিয়া মোড়লের সাহায্যে পর্বত শৃঙ্গে স্থাপিত বৌদ্ধ মূর্তির কথা সবিস্তারে জানতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সেখানে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। উপায় বলতে শুধু বহুকালের জীর্ণ লোহার সেতুটি। বাতাসের আঘাতেই তা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হতে পারে। অভিরামের প্রবল বাসনা ভগবান বৌদ্ধদেবের দর্শন লাভ। বিপদের

সমভাবনা বুঝেও সে বৌদ্ধস্তুপে পৌঁছায়। তার সঙ্গিটি কিন্তু যেতে সাহস পেলে না। কথক গেল না ঠিকই কিন্তু তারা ভেতরে ছিল অনুসন্ধান কাম মন। আর অভিরাম বৌদ্ধ-অস্ত্রপ্রাণ। সেই টানেই অভিরাম বৌদ্ধ স্তুপে যায় এবং শৈল ভূমির স্বাভাবিক প্রবণতা ভূ-কম্পনের ফলে বৌদ্ধ স্তুপ হুড় ঘুড়িয়ে খাদে পড়েছে। কথক সেই দৃশ্য ও অবলোকন করে হতচকিত হন। তার আর খোঁজ মিলল না। পুণ্যাহুতিই তার কাম্য ছিল ফলে যে সব বাধা অতিক্রম করে বিপদের দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে। যুগে যুগে প্রকৃত ভসরা তাই-ই করে এসেছে। অভিরাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হিমালয়ের কমান প্রবণ জগুঘাদেশের বর্ণনায়, বৌদ্ধ-স্তুপের চন্দন-মূর্তি ইচ্ছায়, মরচে পরা জীর্ণ লোহার শেকলের ওপর দিয়ে বৌদ্ধ-স্তুপে পৌঁছানো, স্তুপের চারিদিকে গভীর খাদ, বৌদ্ধ-ভিক্ষুর নির্বাণ লাভ ইত্যাদি দৃশ্য আমাদের মনে রোমাঞ্চ জাগায়। ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটিও ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চ-মূলক কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মস্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

“রোমাঞ্চই আপনার কবিত্বের মূল প্রেরণা।... আপনি বাস্তবের বাস্তবতা খুঁড়িয়া দেখিতে চান না, জীবনের কোনো ব্যাখ্যা বা philosophy আপনার মনকে চাপিয়া ধরে না — সে পিপাসা আপনার নাই; অর্থাৎ আপনি Keats -এর Nightingale -এর মত ভাগ্যবান — মানবমনের বা প্রকৃতির চিরবসন্তের দেশে পলাইয়া বাঁচিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। আপনি passion ও emotion গুলিকে নিজের মতো পাক করিয়া একটু রস তৈয়ার করিয়া দেন এবং ইহার জন্য Situation, incident ও character নিজের মত করিয়া গড়িয়া লন। .... ইহাই আপনার বাহাদুরী।...”<sup>২৫</sup>

পণ্ডিতেরা ভারতীয় সমাজে নানা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যেমন—ক্লাসিক্যাল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর বৈরীতা ও অসহিষ্ণুতার রূপটিও লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম সংঘাত ও ধর্ম সমন্বয়ও চোখে পড়ে। বলা যায়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় পরিবর্তন অবশ্যস্বত্বী। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে তা জানা যায়। পরধর্ম সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, পরধর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা ও ধর্মান্তরনের প্রবণতা অতীতযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও ধর্মান্তরের বিষয়টিও দেখা দিয়েছে। স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ অর্থের লোভ কিংবা সামাজিক উৎকর্ষতার লোভ দেখিয়ে আদিবাসী (সাঁওতাল ইত্যাদি) সমাজের নিরক্ষর গরীব মানুষদের হোম-যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে ধর্মান্তরিত করেছেন। এই প্রক্রিয়ার যে শেষ নেই সে কথাই গল্পকার বলতে চেয়েছেন। ধর্মীয় বিদ্বেষ আজও বিদ্যমান। ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে পীড়ন সমাজকে আজও অস্থির করে তুলছে। কিছু মানুষ চেপ্টা করছেন এসবের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। কিছু মানুষ চেপ্টা করছেন এসবের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। লেখনির মাধ্যমে চালানো হচ্ছে প্রচার।

সাম্প্রদায়িকতার রেশ আজও ভারতীয় সমাজকে বিচলিত করে তুলছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
সম্প্রীতি ও সন্ততির রূপটি কাম্য। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য উদাহরণ।

নির্দেশিকা :

১. শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১০
২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮
৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৫
৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৬
৫. নিতাই বসু, সত্যাশ্বেষী শরদিন্দু, পৃ. ৪৯
৬. নিতাই বসু, সত্যাশ্বেষী শরদিন্দু, পৃ. ৪৯
৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, গল্প পরিচয়, পৃ. ৪২৮
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্পপরিচয়, পৃ. ৪২৪
৯. প্রভাতাংশু মাইতি, স্টাডিস্ ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩৯১
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্প পরিচয়, পৃ. ৪২৪
১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, ভূমিকা, পৃ. ১১
১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৬
১৩. তদেব, গল্প-পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৮
১৪. তদেব, গল্প-পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৭
১৫. তদেব, গল্প পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৭
১৬. তদেব, গল্প পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৭-৪২৮
১৭. তদেব, গল্প-পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৪
১৮. তদেব, পৃ. ৪২৮
১৯. তদেব, পৃ. ৪২৪
২০. তদেব, পৃ. ৪২৭
২১. তদেব, পৃ. ৪২৫
২২. তদেব, পৃ. ৪২৭
২৩. তদেব, পৃ. ৪২৬
২৪. তদেব, পৃ. ৪২৫
২৫. তদেব, পৃ. ৪২৬

## চতুর্থ অধ্যায়

# শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ

‘কালের মন্দির’ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। ১৩৫৮ বাংলা সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালের ৯ই মার্চ মুঙ্গেরে এই কাহিনি রচনার আরম্ভ। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পর লেখক কর্মসূত্রে বোম্বাই চলে যান। ফলে উপন্যাসটি আর লেখা হয়নি। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আবার কাহিনি লিখতে শুরু করেন। ১৯৫০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গল্প শেষ করে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন “বারো বছর ধরিয়া মাছের কাঁটার মতো গল্পটা আমার গলায় বিঁধিয়া ছিল। এত দিনে বাহির হইল। বেশ স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতেছি।” সমাপ্ত উপন্যাস প্রসঙ্গে শরদিন্দু ডায়ারিতে লিখেছেন “অনেকবার লিখিব মনে করিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি; কিন্তু এ ধরণের উপন্যাস আধখানা মন দিয়া লেখা যায় না। তাই উহা নূতন করিয়া ধরিতে সাহস হয় নাই। ইতিমধ্যে এই এগারো বছরে কাহিনীর অনেক সূত্র মনের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।... তবু আবার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। গল্পের কাঠামোটা ভুলি নাই, তাহারই উপর নূতন করিয়া রঙ ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছি। জানিনা, রোমান্সের রঙ আগের মত ফলিবে কিনা। যদি শেষ করিতে পারি পাঠকেরা হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গল্পের কোনখানে এগারো বছরের ব্যবধান।” রোমান্সের ইন্দ্রজাল মগ্ন পাঠক প্রথম পাঠে এই ব্যবধান ধরতে পারেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য হিশেবে শরদিন্দু নিজে দুটি কথা বলেছেন—

১. নিছক গল্প বলা

২. নানা জাতির মিলনে গড়ে ওঠা এক ভারতসত্তার কথা বলা।

এই উপন্যাসের শেষাংশ ১৯৪৮ সালে লেখা। এর মধ্যে ১৯৪৬-৪৭ -এ সারা দেশব্যাপী জাতি দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি জুড়ে দিয়েছেন। “যাহারা মানুষে মানুষে ভেদ বুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচার মুঢ় নয়—মিথ্যাচারী।” দেশের নানা প্রান্তে এই ভেদবুদ্ধি প্রসূত হিংসা এবং সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব সাধারণ মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল আর তারো চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল শিল্পী সমাজকে। ১৯৩৮ -এ এ কাহিনি শেষ হয়ে গেলে হয়তো দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এত প্রাধান্য লাভ করতো না।

এই উদ্দেশ্য গল্পের মধ্যে মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে নি। বরং গল্প বলাটাই মুখ্য হয়েছে। গল্প

বলতে শরদিন্দু জানতেন। অনেক সময় সেই গল্পের পটভূমিকা হিশেবে তিনি ইতিহাসকে বেছে নিয়েছেন। ইতিহাসের পটভূমিকা আধুনিক মানুষের কাছে প্রায়গুকারে ঢাকা, অপরিচিত এবং রহস্যপূর্ণ। ঐতিহাসিকদের চেষ্ঠায় তার মোটাদাগের কথাগুলি কিছুটা স্পষ্ট হলেও মানুষের জীবন যাপন, তাদের জীবনের সমস্যা সংকট—বিশেষত ঔপন্যাসিকের কাছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সেকালের মানুষের প্রেম ভালোবাসার কাহিনি কিছুই জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে সেই অতীতের মানবজীবনের গল্প বলেছিলেন—তাদের প্রেম প্রণয়ের কাহিনি শুনিয়েছিলেন। আরও কেউ কেউ সে কাজ করেছেন। শরদিন্দু সেই অতীত-রহস্যবৃত্ত জীবনের রোমাঙ্গ-রসকে তাঁর কল্পিত কাহিনির মধ্যে তুলে ধরেছেন। রোমাঙ্গ লেখকেরা রহস্যপূর্ণ কাহিনি পছন্দ করেন। এজন্য অতীত ইতিহাসের বৃত্তান্ত ও প্রেক্ষাপট তাঁদের রচনার উপাদান হিশেবে গুরুত্ব পায়।

M. H. Abrams লিখেছেন—

“The Prose romance, ... has as Precursors the chivalric romance of the middle ages and the gothic novel of the later eighteenth century ... it tends to be set in the historical past, and the atmosphere is such as to suspend the reader’s expectations based on everyday experience. The plot of the prose romance emphasizes adventure, and is frequently cast in the form of the quest for an ideal....” (A glossary of Literary Terms Harcourt College Publishers, Indian reprint 2001, p. 192)

এই রোমাঙ্গ লেখাই লেখকের লক্ষ্য। তিনি এজন্য একটা আদর্শের সন্ধানে তাঁর নায়ককে প্রেরণ করেন। অনেক সময় সে শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। বহু রোমাঙ্গের এবং অসম্ভব ঘটনার অবতারণা করে লেখক কাহিনি রস জমিয়ে তোলেন। নায়কের মনের ‘primal desires’, ‘hopes’, ‘terrors’—রোমাঙ্গ লেখকের লেখায় ফুটে ওঠে। শরদিন্দু এই রোমাঙ্গ রস ঘনীভূত করে তোলার জন্যই রহস্যময় অনুকারাচ্ছন্ন অতীতের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কারণেই বারবার তিনি ইতিহাসের এক একটা সন্ধিকালকে অবলম্বন করেছেন। এই সন্ধিকালগুলি ইতিহাসে ঘটনাপূর্ণ, কাজেই মানুষের মনের কল্পনাকে সহজে উদ্বেজিত করে তুলতে পারে। সেগুলির অন্ধকারপূর্ণ প্রেক্ষাপটও মেলোড্রামাটিক ঘটনাবর্ত সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী। শরদিন্দু এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘটনাবলি প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে তাঁর নিজের অধীত বিদ্যা, সৃষ্টিশীল কল্পনা এবং শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ তৎসম ভাষাকোষ ব্যবহার করেছেন। এইভাবে অতীত ইতিহাসের একটি ভাবময় রূপ ও তাঁর

লেখায় গড়ে উঠেছে। ইতিহাসকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন—তাতে ইতিহাসের কী রূপ ফুটে উঠেছে—সম্ভব-অসম্ভব কাহিনির সমাবেশে ইতিহাসের এই গড়ে ওঠা রূপের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য।

‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বিষয় হুণ অধিকৃত এক রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে সেই রাজ্যের মৃত রাজার অপরিচিত পুত্রের আকস্মিক সাক্ষাৎ প্রণয় ও বিবাহ। মধুরাস্তিক রোমান্স রসসিক্ত এই কাহিনির মধ্যে ইতিহাসের কোনো সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। লেখক নিজেই বলেছেন কাহিনি সম্পূর্ণতই কল্পিত, এবং স্কন্দগুপ্তের নাম ছাড়া এতে ইতিহাসের কোনো স্পর্শ নাই। “আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক” (ভূমিকা) স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে, প্রথমে কাল্পনিক আখ্যায়িকার কথা বলি।

কাহিনি হুণ রাজ্য ‘বিটক’ দেশকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ‘বিটক’ দেশ সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো খবর পাওয়া যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুসারে “প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হুণগণ একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।” (ভূমিকা উদ্ধৃত) যে রাজ্যের প্রাচীন নাম শরদিন্দু দিয়েছেন বিটক। বিটক রাজ্যের এক প্রপায় এ কাহিনির আরম্ভ। ‘প্রপা’ শব্দটি প্রাচীন। ঋগ্বেদে এর ব্যবহার আছে। মনুসংহিতায় আছে। পথের পাশে জলসত্রগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণ নারীদের উপর ন্যস্ত থাকত। ‘প্রপাপালিকা’ নামটি তারই পরিচায়ক। এই পথ পার্শ্বের জল সত্রগুলি ভারতবর্ষের একটি কল্যাণমূলক আদর্শের পরিচয় দেয়। কত প্রাচীন তার ব্যবহার ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে তা কিছুটা বোঝা যায়। এই প্রপায় পালিকা সুগোপার কাছে হুণ বৃদ্ধ মোঙের বিলাপ দিয়ে কাহিনির শুরু। এই হুণ যোদ্ধা মোঙ পঁচিশ বছর আগেকার হুণ আক্রমণের স্মৃতি কণ্ঠয়ন করতে ভাল বাসত। তাই সুযোগ পেলেই সে গল্প করতো। সুগোপাকে সেই গল্প শোনাতে গিয়ে সে হুণদের অতীত, তাদের বিক্রম, রাজপুরী আক্রমণ, নিষ্ঠুরতা—এসব কাহিনি বলে যাচ্ছিল। লেখক তার মুখ দিয়ে এই গল্প বলিয়ে হুণদের এই রাজ্যস্থাপনের অতীত আখ্যান পাঠকদের জানিয়েছেন। এ কাহিনি কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই পঁচিশ বছর আগের কথা বলবার জন্য মোঙের মতো বৃদ্ধ যোদ্ধার স্মৃতি চারণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই স্মৃতি কথা গল্পের পক্ষে খুব দরকারী। মোঙের কথা থেকে জানা যায়—

১. এই রাজ্যের বর্তমান রাজা একদিন এদেশের বীৰহীন রাজার মাথা কেটে শূল শীর্ষে স্থাপন করেছিলেন

২. এ রাজ্যের ক্ষুদ্র বালক রাজপুত্রের দেহ নিয়ে হুণ যোদ্ধারা মুক্ত কৃপাণের উপর লোফালুফি করছিল

৩. চু ফাঙ সেই ক্ষত-বিক্ষত রাজপুত্রকে নিয়ে যায়

৪. রাজকোষের লুণ্ঠিত অর্থ এ রাজ্যের রাজাকে উপহার দিয়ে তুয্ফান চট্টন দুর্গের অধিপতি হয়

৫. রাজপুত্রের ধাত্রী এবং সুগোপার মা একই ব্যক্তি এ কথা শোনা যায়। কিন্তু তার কোনো খোঁজ মেলেনি।

৬. হুণদের অধিপতি বর্তমান রাজা রোটাধর্মান্দিত্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন

এই কথাগুলি এ গল্পের আদি কথা; গল্পের exposition-এর পূর্বকথা। এ হল আদি কথার আদি কথা। একথাগুলির পিঠেই পরের গল্প গড়ে উঠবে। আদি কথার ও আগের কথা কীভাবে বলতে হবে লেখকেরা নানাভাবে তার কৌশল আবিষ্কার করেন। শরদিন্দু এখানে সময়ক্রমে গল্প বলে চলেছেন। তাই মোঙের গল্পের অবতারণা। এই অতীত কাহিনির পটভূমিতেই নূতন কাহিনির প্রস্তাবনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই উপন্যাসের নায়ক চিত্রককে আনা হয়েছে। এবং এই পরিচ্ছেদেই উপন্যাসের নায়িকাকেও এনেছেন লেখক। সুগোপা দুই চরিত্রের যোজক; পরে স্পষ্ট হবে সুগোপা বর্তমান রাজকন্যার বন্ধু এবং আগেকার রাজপুত্রের ধাত্রীকন্যা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই অতি কল্পনার শুরু— রোমাপের অতিরেকের সূত্রপাত। রাজকন্যার সখীর সঙ্গে চিত্রকের প্রগলভ আলাপের বাড়াবাড়ির মুখেই ছদ্মবেশী রাজকন্যার প্রবেশ এবং চিত্রকের ঘোড়াচুরি করে পালানো। এই পরিচ্ছেদেই লেখক পরিচয় উদ্ঘাটক চিত্রকের ললাট-তিলকের জন্ম চিহ্নের কথা জানিয়ে ছিলেন। গল্পের পক্ষে এ সবার প্রয়োজন আছে—ইতিহাসের দিক থেকে নয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্কন্দগুপ্তের কথা এসেছে—এবং তার সঙ্গে হুণ রাজ্য বিটককে জোড়া হয়েছে। স্কন্দের কথা পরে বলা হবে—আপাতত কাহিনি প্রসঙ্গে বলি। চিত্রক রাজকুমারীর অশ্বচোর—তাকে মদিরা গৃহে খুঁজে পায় সুগোপা। বিটক রাজ্যের রাজধানী কপোতকুটে নিশ্চয় মদিরাগৃহের সংখ্যা গণনাতে ছিল না; সুগোপা তার মালাকরকে খুঁজতে গিয়ে চিত্রককে খুঁজে পায়। যামিক প্রহরীরা তাকে সুগোপার নির্দেশ মতো তোরণ রক্ষীর জিন্মায় রাখে। আর এই এক রাত্রির মধ্যেই আকস্মিক ভাবে রাজপুরীর গুপ্ত সুড়ঙ্গ আবিষ্কার হয়। সেই সুড়ঙ্গের কূটকক্ষে রাতের মতো চিত্রকের স্থান জোটে, আর তাতেই পঁচিশ বছরের বন্দিনী পৃথার (সুগোপার মা) সম্মান মেলে। এই সব অতি কাল্পনিক ঘটনা বিন্যাসের জাল বিস্তার করে লেখক সম্ভব অসম্ভবের সব সীমা ছাপিয়ে গেছেন। লেখক অসম্ভব ও আকস্মিকের, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সব স্তর উল্লম্ফনশীল কল্পনার বেগে অতিক্রম করে গেছেন। এই ভাবে অতিক্রম প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে অতীত কাহিনি থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিক্রমা করে লেখক নায়ক চিত্রক বর্মাকে নায়িকার কাছাকাছি এনে ফেলেছেন। সুগোপার মা পৃথার সম্মান পাওয়া গছে। পৃথার উদ্ধারের ওপর অষ্টম পরিচ্ছেদে রাত্র রাজপুরীতে গুহের

সঙ্গে চিত্রকবর্মার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এবং গুহের মৃত্যু আরও একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। এ উপন্যাসে তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক হুণ প্রধান ধর্মান্তিত্যের সম্বন্ধে দু-একটি খবর দিয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ধারাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরই কন্যা বর্তমান গল্পের নায়িকা রট্টা যশোধরা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন চট্টন দুর্গের অধিপতির মৃত্যুর পর তার পুত্র কিরাত সে দুর্গের অধিপতি হয়ে বসেছে। সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু রাজকন্যা তাতে রাজি নয়। রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে অহিংসার উপাসক হয়েছেন। তিনি চট্টন দুর্গে চৈনিক অর্হৎদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। কিরাত তাঁকে ছলনা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

চিত্রক রাজা স্কন্দগুপ্তের দূতের পত্র কেড়ে নিয়ে রাজমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। কিন্তু রাজমন্ত্রী চতুর ভট্ট তাকে বিশ্বাস করেননি। তাকে রাজাপুরীতে একপ্রকার নজরবন্দী রেখেছেন। এই নৈকট্যকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলবার অভিপ্রায়ে রোমান্সের ডানায় ভর করে লেখক চিত্রক ও রট্টাকে একই সঙ্গে চট্টন দুর্গে রাজার কাছে নিয়ে চলেছেন। সে যাত্রার নাম দিয়েছেন বন্ধনহীন গ্রন্থি। চিত্রক ও রট্টা যশোধরার এই অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রার চিত্র বাংলা সিনেমার পথ শেষ না হবার নীতি মাধুর্যে পূর্ণ। তার উপর যাত্রা পথে পাহালায় উভয়ের অবস্থান ও রাত্রিযাপন, চিত্রকে রাত্রে রাজকুমারীর দ্বার রক্ষা সমস্তই মাধুর্য ও প্রণয়পূর্ণ। গল্পে এই যাত্রার বর্ণনা রোমান্সের পক্ষীরাজের ডানায় ভর করে উড়ে চলা। চট্টন দুর্গ থেকে আসা চৈনিক পরিব্রাজকের মুখে রাজা ধর্মান্তিত্যের প্রায় বন্দীত্বের সংবাদ শুনে চিত্রক ও যশোধরা স্কন্দগুপ্তের সাহায্য প্রার্থী হতে যাত্রা করেছে। যাত্রাপথের বর্ণনা দুঃখদায়ক না হয়ে হয়েছে আনন্দপূর্ণ। এমনকি রাজকুমারী হুণ রাজকন্যা যাত্রাপথের অশেষ ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করে পর্বতগুহায় রাত্রিযাপন করেছেন। আর এই যাত্রা, রাজকুমারী ও চিত্রকের নৈকট্য, নিবিড় বিশ্বাস বোধ একই পাহালায় চিত্রকের রাত্রি জেগে রাজকন্যাকে পাহারা দেওয়া, তা জানতে পেরে রাজকুমারীর পরিতৃপ্তি এসবই নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ পর্যায়। এরপর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে বন্যপশুর জ্বলন্ত দৃষ্টির সম্মুখে জীবন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে চিত্রকের যে দায়িত্ববোধ—তা থেকেই বলা হয়ে যায়। প্রস্তাব আসে রাজকন্যার দিক থেকেই কারণ রাজকন্যাই এখানে মর্যাদার দিক থেকে উত্তমর্গ।

“অস্ফুট কণ্ঠে রট্টা বলিলেন—রাজকুমারী নয়, বলো রট্টা

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক কম্পমানকণ্ঠে বলিল—রট্টা

বলো রট্টা যশোধরা

রট্টা যশোধরা।”

আরেক দিক থেকে শরদিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাঞ্চগুলির উত্তরসূরী। রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাসের

গতির কথা বলেছিলেন। নির্মলকুমারী যখন মানিকলালের ঘোড়ায় চড়ে বলে তখন বঙ্কিম কোনো কৈফিয়ৎ দেননি। বরং পাঠককে কিঞ্চিৎ লঘু বিদূপ করেছিলেন। শরদিন্দু এমনই বেগে কাহিনি চালনা করেছেন যাতে তার রোমান্স রসের টানে গল্পের পাঠক এগিয়ে চলে। শরদিন্দু কালের মন্দিরা কাহিনিতে কোনো সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা টানেনি। স্ফুটাবারে নারীর প্রবেশ যে কীরকম অসম্ভব তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। বরং স্কন্দ রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। আর্য না হুণ এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। রট্টাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—“ তোমাকে জীবন সঙ্গিনী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।”<sup>২২</sup> চিত্রকের প্রতি নিবিড় প্রণয়ে রট্টা এ প্রস্তাব স্বীকার করে নি। “রাজাধিরাজ, ... মার্জনা করুন। হৃদয় দিবার অধিকার আমার নাই।”<sup>২৩</sup>

রোমান্স রসের প্রয়োজনীয় ‘প্রথম দর্শনে প্রেম’, পুরুষের চিত্তে নারীর রূপাসক্তি, প্রণয়ে ব্যর্থতা, এসব কিছুই আয়োজন কাহিনিতে উপস্থিত। তার সঙ্গে আছে চিত্রকের প্রতি রট্টার প্রণয়বোধের একনিষ্ঠতা। স্কন্দ এখানে প্রতি নায়িকা প্রতি নায়ককে ছেড়ে নায়কের প্রতি মনোনিবেশ, পাঠক মাত্রেরই মনে স্বস্তি আনে। রোমান্সের ধর্মই তাই। স্বার্থ থেকে স্বার্থোধ চরিত্র রচনা রোমান্স রসকে ঘনীভূত করে। এরপর কাহিনির আর অতি অল্পই বাকি থাকে। চট্টন দুর্গে স্কন্দের সৈন্য ও রণহস্তী চট্টন দুর্গে পৌঁছে যায়। সেখানে ও কাহিনিতে ঈষৎ জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা; কিরাতে দূত চট্টন দুর্গের দুর্গপাল মরু সিংহ হুণ শিবিরে সাহায্য চাইতে যাবার পথে ধরা পড়ে। তার ঘোড়ার কার্পেট দিয়ে মোড়া, তাই ‘অশ্বক্ষুর হইতে কিছুমাত্র শব্দ বের হয়না।’ কিরাতে দূতের উপর দৈহিক পীড়ন চালিয়ে কিরাতে মনোভাব বোঝা যায়। তার তরবারির কোষ থেকে হুণ রাজের উদ্দেশ্যে লিখিত অগুরুত্বকের পত্র পাওয়া যায়। তাতে চট্টন দুর্গাধীশ কিরাতে উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

এরপর কাহিনির আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ধর্মানিত্য বিটঙ্ক রাজ্য ছেড়ে সংঘে আশ্রয় নেবার সংকল্প জানান। বিটঙ্ক রাজ্যের উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়। চিত্রক ও রোটাধর্মানিত্যের বিয়েতে কাহিনি শেষ হয়। কিন্তু শেষের পরেও একটা পরিশিষ্ট থাকে। সেখানে রোটা ও চিত্রকের বিয়ের আনন্দ নিয়ে রাজ্যের প্রজাদের উচ্ছলিত সুখের মধ্যে একটি কথা বলা হয়েছে। রাজকন্যা রোটা যশোধরা সুগোপার কাছে আগেই চিত্রকের পরিচয় জেনে গিয়ে ছিলেন। তারপর সমস্তটাই জ্ঞাতসারে ঘটানো। রট্টা বলেছে চিত্রকের পরিচয় জেনে সে তার কর্তব্য ঠিক করে নেয়।

“মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ দিব, নাচেৎ তোমার হৃদয় জয় করিব। কিন্তু তুমি প্রতিহিংসা লইলেনা। তাই তোমার হৃদয় জয় করিলাম; আর তোমাকে ভালবাসিলাম।”<sup>২৪</sup>

সমস্ত গল্পটার মধ্যে রোমান্সের যে কল্পলোক রচনা হয়েছে তা পাঠকের আগ্রহকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। উপসংহারে নায়ক নায়িকার মিলনে সে রোমান্সের পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাসের কোনো চরিত্রই ইতিহাসের নয় “ কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক।” এখন প্রশ্ন ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখক কতটা ইতিহাসের মেজাজ ধরে রাখতে পেরেছেন?

ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য নয় ইতিহাসের রস চাই। যেমন মসলা আস্ত থাকুক বা বেটে ঘেঁটে একাকার করা হোক ব্যঞ্জনের স্বাদ চাই, তেমনি ইতিহাসের তথ্য আস্ত থাকুক বা নাই থাকুক ইতিহাসের আস্বাদ চাই। শরদিন্দু একথাটা খুব ভাল জানতেন। তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল দুটি। এক তীর কল্পনা শক্তি এবং কল্পনাকে সাকার করবার রচনাশক্তি। রচনা শক্তি বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সবই শরদিন্দুর ছিল। ফলে অতীত অন্ধকারের গর্ভগৃহ থেকে একটি আস্ত যুগ পরিবেশ সমেত সেই যুগের পাত্র পাত্রীদের সাকার করে দেখাতে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। এ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বেশি নয়, কারো কারো ভূমিকা অত্যন্ত কম। চিত্রক এবং রত্না যশোধরা প্রধান দুই পাত্রপাত্রী। এদের জীবনকে অবলম্বন করে একটা রোমান্স ঘনিয়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে আর একটি বৃহত্তর মানবিক বার্তা দেওয়া এই দুই কাজ তিনি ভালভাবেই করেছেন।

চিত্রক এ উপন্যাসের নায়ক। তার দুর্ভাগ্যময় অতীত (শৈশব) থেকে সৌভাগ্যময় বর্তমানে প্রতিষ্ঠা এ কাহিনির বিষয়। চিত্রক তার অজ্ঞাত পরিচয় জীবনে একটা পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। সে রাজপুত্র। পঁচিশ বছর আগে হুণ আক্রমণে তার পিতামাতা নিহত হয়। তার পালিকা মাতা নিরুদ্দিষ্ট। হুণ সৈন্যদের তরবারিতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত। তাকে হুণ চু-ফাঙ রক্তকর্দম থেকে তুলে বুলিতে ভরে নিয়ে যায়। কেন সে তাকে রক্ষা করে তার কারণ জানা যায় না। তারপর শৈশব কৈশোর অতিক্রান্ত চিত্রক যুদ্ধ ব্যবসাতে নিযুক্ত হয়ে আত্মরক্ষা করে। নিজের জীবন নিজের হাতে তাকে গড়ে নিতে হয়েছে বলে, যুদ্ধ করে তাকে টিকে থাকতে হয়েছে বলে সে স্বীয় কর্মে পটু, বিদ্যার চেয়ে তার বুদ্ধির প্রার্থ্য বেশি; বিপদের মধ্যে বুদ্ধি স্থির রাখা তার স্বভাবসিদ্ধ। সে চতুর, স্বার্থসিদ্ধি পরায়ণ, উপস্থিত প্রয়োজনের দিকে তার ঝোঁক; জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দোলাচল অবস্থায় সে আত্ম চিন্তা করে। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও শক্তি দুইই তার যথেষ্ট। চিত্রককে সৈনিক শ্রেণির চরিত্র রূপে গড়ে তুলে সে কালের ধর্ম তার উপর আরোপ করাতে লেখক সিদ্ধ কাম হয়েছেন। গুপ্ত যুগের মানুষের আচার ব্যবহার রীতি-প্রথার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রকের ব্যবহারে তেমন কোনো কালৌচিত্যের অভাব দেখা যায় না। তবে তরবারির উপর শিশু রাজপুত্রকে নিয়ে

লোফালুফির পরও তার বেঁচে যাওয়া একটু বেশি বিশ্বাসের উপরে আঘাত দেয়। তারপর অপরিচিত পরদেশি (যে ঘোড়া চুরি করে ধরা পড়ে) তার সঙ্গে রাজন্যাকে পাঠানো- রোমাসের অতিরেক।

চিত্রকের শশিশেখরের সঙ্গে কথোপকথন বা আচরণের মধ্যে যে প্রগলভতা তা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষা করে রাজ অবরোধে কঞ্চুকী লক্ষ্মণের নজর বন্দী হয়ে থাকার সময় সে তার পরিচয় জানতে পারে। এরপর সে প্রতিশোধ স্পৃহায় চঞ্চল হয়। রাজকুমারীও তার পরিচয় জেনে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেন। চিত্রকের মনে এই সময় থেকে একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিনে স্বাভাবিক প্রতিশোধ প্রবণতা অন্যদিকে রাজকুমারীর প্রতি আকর্ষণ এই দুয়ের দ্বন্দ্ব চিত্রক একটা যুক্তি খুঁজে পায়। রাজকুমারী তো তার প্রতি কোনো অন্যায় করেননি কাজেই তার উপর প্রতিশোধ নেবার মানে নেই। রাজার উপর প্রতিশোধ নেওয়াই তার লক্ষ্য হয়। রাজকুমারীর প্রতি তার চাপা অনুচ্ছ্বসিত প্রেম তার সেবা ও সাহচর্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। বিপদের মধ্যে ধৈর্য রক্ষা উদ্ধারের পথ খুঁজে নেওয়া এসব কাজে তার স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রকের প্রতি রাজকুমারীর আকর্ষণ কৌতূহল থেকে তৈরি হয়ে প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর দৃঢ় হয়। সম্ভবত চিত্রকের আকার ও প্রকারের মধ্যে রাজকুমারী একজন পুরুষের পরিচয় পেয়েছিলেন। তার পরিচয় সুগোপার মুখ থেকে শোনার পর রাজকুমারীর মন কীভাবে তাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিতে প্রস্তুত হল সে ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে। আরো প্রশ্ন রাজ অবরোধের মধ্যে নারীর যে সংকীর্ণ স্বাধীনতা তা কীভাবে রাজকন্যা এড়িয়ে গিয়ে চিত্রকের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় একালের প্রেমিক প্রেমিকার মতো কথোপকথন করলেন। লেখকের দিক থেকে একটা কৈফিয়ৎ আছে। সেটাই তাঁর প্রধান যুক্তি। রট্টা হুণ কন্যা, অবরোধ প্রথা যদিও এদেশে চালু হয়েছে তবু তা ততো কঠোর নয়। দ্বিতীয় যুক্তি রাজ্যে রাজা নেই, রাজার প্রতিনিধি হিশেবে রাজকন্যা অনেকটাই স্বাধীন। তৃতীয় যুক্তি রাজকন্যা পিতার অনুসরণে বুদ্ধের স্মরণ গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর মধ্যে ঈর্ষা বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নেই। চিত্রক রাজকুমারীর উপর প্রতিশোধ নিল না—তাই রট্টা ভালোবাসার দ্বারা তাঁর প্রতিদান দিয়েছে।

রট্টার মধ্যেই লেখকের মনোভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। রট্টা হুণ কন্যা। কিন্তু তার মা আর্ষ। তার মধ্যে আর্ষ ও হুণ রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। রট্টার বাবা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। হুণদের জীবনের হিংস্রতা পরিহার করে অহিংসা ধর্ম নিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে মোঙের কথা দিয়েই হুণদের অতীত জীবনের সঙ্গে বিটঙ্ক রাজ্যের বর্তমান অবস্থার তুলনা করা হয়েছে। মোঙের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন হুণ জাতি ভেড়া হয়ে গেছে। রাজার সম্বন্ধে তার শ্লেষোক্তি “তরবারি

যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈতন্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে।”<sup>৬</sup>  
এই কথার মধ্যে রাজ্যের রাজার ও দেশের পরিস্থিতি বোঝানো হয়েছে। রট্টাকে চিত্রক প্রশ্ন করে  
“আপনি হুণদুহিতা। আর্য জাতি অপেক্ষা হুণ জাতির প্রতি আপনার মনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে।”  
রট্টা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছে—

“আর্য!—হুণ! আমার মাতা আর্য ছিলেন, পিতা হুণ। আমি তবে কোন জাতি? জানি না। সম্ভবত  
মনুষ্য জাতি।”

আর পক্ষপাতের প্রসঙ্গে উত্তর দিয়েছে—

“এই আর্য ভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ  
তাহাদের ছাড়া অন্য মানুষ আমি দেখি নাই।”<sup>৭</sup>

রট্টার মুখ দিয়ে এই ভাবে লেখক উদার মানবতার আদর্শ প্রচার করেছেন। এ কাহিনির ভূমিকায়  
তিনি বলেছিলেন—

“গল্প বলা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্ত করা যাইতে  
পারে—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন

শক হুণ দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।”

ভারতবর্ষে বহু মানুষ বাইরে থেকে এসেছে। তারা একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাধীন অস্তিত্ব  
হারিয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। যারা এই নিয়মকে স্বীকার করতে চায় না তাদের সম্বন্ধে  
লেখকের বক্তব্য—

“যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম  
লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে তাহারা শুধু বিচার মূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।”

ভারতবর্ষের অঙ্গহানি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পারস্পরিক অবিশ্বাসের দিনে শরদিন্দু এই উপন্যাস  
লিখে মানুষকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত আজকের পরিস্থিতিতেও এই বার্তা যথেষ্ট  
উপযোগী।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে চিত্রক বা রট্টা কিংবা ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের  
গল্প মাত্র। বিটক্ক নামের কোনো রাজ্য ছিল বলে জানা যায় না। তবে একথা ঠিক হুণদের একটা  
অংশ পাঞ্জাব ও আরও পশ্চিমে কোথাও কোনো ছোট রাজ্যে থেকে গিয়েছিল। ইতিহাসের এই  
সংকেতটুকু নিয়েই কাহিনির ডালপালা ছড়ানো হয়েছে। লেখক সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা  
মনে রেখেই কাহিনি নির্মাণ করেছেন। বাস্তবের হুণ কন্যার মধ্যে এই অহিংসধর্ম, হুণ রাজ্যের

রাজকন্যার পক্ষে এই উদার আদর্শবোধ অবলম্বন করার সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এখানেই ইতিহাসের চেয়ে কবি কল্পনার সত্যের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ।

স্কন্দই একমাত্র ইতিহাসের চরিত্র। স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস লেখক অনুসরণ করেছেন। কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। সমকালীন একটি অভিলেখ থেকে জানা যায় সে সময় শত্রুর আক্রমণে গুপ্ত বংশের রাজলক্ষ্মী বিচলিত হয়েছিলেন। স্কন্দ শত্রু জয় করে রাজলক্ষ্মীকে স্থির করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় রাজ্য নিয়ে স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে তাঁর ভাইদের বিবাদ হয়েছিল এবং “goddess of sovereignty of her own accord, selected him as her husband, having in succession discarded all other princess.”<sup>৭</sup> স্কন্দগুপ্ত বেশিদিন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। তাঁর সময়েই পুষ্য মিত্রীয় এবং শ্বেত হুণদের আক্রমণে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। মোঙের গল্প বলার মধ্যে হুণদের কথা এসেছে। বক্ষু নদীর তীরে তাদের দুর্দমনীয় জীবন পিপাসার কথা মোঙের কথা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন। বক্ষু নদীর উৎপত্তি আফগানিস্তানে। মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। নদীর নাম লাতিনে Oxus। বৈদিকে বক্ষু। বর্তমানে এর নাম আমুদরিয়া। শরদিন্দু ‘বক্ষু’ নামটি ব্যবহার করেছেন। এই মধ্য এশিয়া থেকেই হুণরা হিন্দুকুশ পেরিয়ে গান্ধার রাজ্য দখল করে। কিন্তু ৫৬০ খ্রি. স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে আর এগোতে পারেনি। এরপর তারা পারস্য দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাসে তাদের ভ্রূরতা এবং বর্বরতার কথা পাওয়া যায়।

শরদিন্দুর উপন্যাসে হুণদের নির্ভুরতার বিবরণ কেবল সাম্রাজ্য দখল করবার সময়কার কাহিনীতে পাওয়া যায়। রাজ্য জয়ের পর সব ক্ষেত্রেই অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাজপুত্রকে অস্ত্রের উপর লোফালুফি, ধনভাণ্ডার লুণ্ঠ, নারী হরণ এইরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে আছে তার পরবর্তীকালে হুণদের নির্ভুরতার বিবরণ বিটক্ক রাজ্য নেই, কিন্তু ষড়যন্ত্র ও প্রতিশোধ বেরার বাসনা চন্টন দুর্গের অধিপতি কিরাতে বর্ণনায় আছে।

স্কন্দগুপ্তের কথা উপন্যাসে প্রধান নয়, গল্পে তিনি কেবল ইতিহাসের মেজাজ আনবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছেন। শরদিন্দু যতটা সম্ভব ইতিহাসের তথ্য কাহিনীতে ব্যবহার করেছেন। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকেই হুণ আক্রমণ হয়। রাজলক্ষ্মীকে স্থির করবার জন্য স্কন্দ হুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। কাহিনী শুরুর সময় স্কন্দের বয়স পঞ্চাশ বছর। স্কন্দের দেহ বলদৃপ্ত, জরার চিহ্নহীন। কিন্তু ইতিহাসের এই তথ্যগুলি গল্পের পটভূমি তৈরি করেছে মাত্র। এলাহবাদ লিপিতে হরিষেণের প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত ‘কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ’ ছিলেন।

স্কন্দের সমকালীন একটি অভিলেখ-এ (Incription) তাঁর শত্রুদমন করার প্রশংসা আছে। তাঁর বীরত্বের কথা সারাদেশে কীর্তিত হত (This heroic achievement of Skanda gupta was sung in every region (Ibid, p. 25) কিন্তু তাঁর কবি ও ভাবুক চেহারার কথা শরদিন্দু নিশ্চয় কোনো ইতিহাস সূত্র থেকে পেয়েছেন। তিনি তাঁকে বীর অপেক্ষা ভাবুক শ্রেণির মানুষ হিসেবেই এঁকেছেন। স্কন্দের রাজনৈতিক গুণাবলী অপেক্ষা এই কোমলতা ভাবুকতা এবং আত্মবিশ্মৃত কিংবা কখনো আত্মগত ভাবের পরিচয় উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হয়েছে। লহরী বলেছে “মনের মধ্যে তিনি বড় একাকী” বলেছে “তিনি সেবা লইতে জানেন না।” (৮৭) স্কন্দের ভাবুক চরিত্রের দুটি প্রকাশ। স্কন্দের বিমনা ভাব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বিমনা ভাব দেখাতে পাশার দানের কথা বলা হয়েছে। রাজার ভাবনা হুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রকাশ পাশার দান। “স্কন্দ দুই হাতে পাষ্টি ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন— পাশা বলিতেছে এবার হুণকে তাড়াইতে পারিব না।” (১৫) আবার ষোড়শ পরিচ্ছেদে পাশাখেলায় রট্টার কাছে পরাজিত হয়ে পণ রক্ষা করতে চন্টন দুর্গে গিয়েছেন। স্কন্দের আর একটি প্রকাশ তার প্রেমিক চরিত্র। স্কন্দ ভোগী নন—লহরী বলেছে ভোগে তাঁর রুচি নেই কিন্তু রট্টা যশোধরাকে তাঁর জীবন সঙ্গিনী করবার বাসনা হয়েছে। ভোগে আসক্তি থাকলে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন না আবার রট্টার প্রত্যাখ্যানও সহ্য করতেন না। কেবল রট্টাকে বলেছেন “আমাকে ভুলিও না, ... আমাকে মনে রাখিও।”<sup>৮</sup> স্কন্দ চরিত্র রচনায় শরদিন্দু কালিদাসের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত কিন্তু নিজের স্বভাব বর্জিত নয়। স্কন্দকে তিনি দুয়ান্তের মতো আদিরসের নায়ক করে গড়েননি। লুকাচ ওয়াণ্টার স্কন্দের লেখায় যে লক্ষ করেছিলেন স্কন্দের চরিত্রে সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য শরদিন্দু দেখাতে পেরেছেন। পিপ্ললী মিশ্রের মতো স্থূল বিদূষকেরা যেভাবে রাজার মনোরঞ্জন করতেন তাতে রাজা ও রাজসভাসদদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পিপ্ললী মিশ্র কালিদাসের বিদূষক চরিত্রের আদলে গড়া। তা আসলে বিদূষক চরিত্রের প্রথা অনুসরণ স্কন্দ চরিত্রটি ঐতিহাসিক; কিন্তু ইতিহাসের চেয়ে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার জীবনের করে লেখা। নিয়ন্ত্রক বেশি। স্কন্দের হস্তক্ষেপেই উপন্যাস অংশে চিত্রক কিরাতের হাত থেকে রাজা ধর্মানিত্যকে মুক্ত করেছেন। রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করেছেন। এগুলির কোনোটাই ইতিহাসকে প্রভাবিত করেনি। স্কন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও উপন্যাসের ঐতিহাসিক মহিমা বৃদ্ধি লাভ করেনি। বরং একথা বলা যেতে পারে স্কন্দ ইতিহাসের যে পর্বে হুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরত আছেন সেই সময়কার হুণ অধিকৃত একটি রাজ্যের সম্ভাব্য চিত্র—এ উপন্যাসে লেখক এঁকেছেন।

কিন্তু চরিত্র নয় কাহিনি রচনাই এ উপন্যাসের মূল কথা। কাহিনির মধ্যেই ইতিহাসের অতীতকে তিনি জীবন্ত করে গড়ে তুলেছেন। চরিত্র এবং কাহিনির মধ্যে লুকাচ ইতিহাসের সারসভা

(Sense of history) খুঁজেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন অনেক লেখকই তাঁদের সমকালীন বাস্তবতাকে এখানে ওখানে ইতিহাসের ঘটনা মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। শরদিন্দুর কাছে ইতিহাসের উপাদান প্রায় কিছুই ছিল না কেবল একটি দুটি ধারণা ছিল। তাই দিয়ে উপন্যাসের মায়ালোক এবং ইতিহাসের অতীত লোক গড়ে তুলেছেন।

‘কালের মন্দিরার’ শুরু হচ্ছে কপোতকূট থেকে কিছু দূরে (দু দণ্ডের পথ) প্রপাপালিকার ফুটিরে। প্রপাপালিকার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বৃদ্ধ হুণ মোঙ পঁচিশ বছর আগেকার হুণ আক্রমণের কাহিনি বিবৃত করেছে। মোঙের গল্প উপন্যাসে অতীত বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে কাহিনির সূচনা করেছে। এতে গল্পের কালগত সংহতি এবং ক্রিয়াগত সংহতি রক্ষা হয়েছে। এভাবে অতীত কথা না বললে গল্প পাঠকের পক্ষে সেই ধরা সম্ভব হত না। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেই অতীত কথার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বর্তমানের প্রধান দুটি চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন এবং একটা Conflict তৈরি করেছেন। প্রপাপালিকা সুগোপা এই দুই চরিত্রের মধ্যবর্তিনী, মোঙ পশ্চাৎপট রচনাকারী। রাজপুত্রী রটা পুরুষবেশে সুগোপার জলসত্রে এসে পড়েছেন।

মোঙ চিত্রক কথালোপের মধ্যে চিত্রকের পরিচয় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। সুগোপার সঙ্গে তার চটুল রহস্যলাপে তার যে প্রকৃতি পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় পরে গল্পের মধ্যে তার সমর্থন নেই। চিত্রককে আর কখনো কোনো রমণীর প্রতি এরকম আচরণ করতে দেখা যায় না। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও কাহিনির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ চিত্রকেরা এই ধৃষ্টতার প্রেক্ষিতেই আকস্মিক ভাবে তার জন্মগত প্রকৃতির একটি দিক উদ্ঘাটিত করে দেখানো হয়েছে। সুগোপার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গভীর উত্তেজনার মধ্যে চিত্রকের ললাটের চিহ্ন জ্বলে উঠেছে। “সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল চিত্রকের দুই চক্ষু হীরক খণ্ডের মত জ্বলিতেছে, তাহার ললাটস্থ তাম্রবর্ণ চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে।”<sup>৯</sup> সুগোপা চিত্রকের রক্ত তিলক দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। এই ললাট চিহ্ন পাঠককে জানানো দরকার ছিল। অ্যারিস্টটলীয় উদ্ঘাটনের প্রক্রিয়ার জন্য এই চিহ্নটি কাজে লেগেছে। দ্বিতীয়ত নিঃসঙ্গ সুগোপার সত্রাস দৃষ্টি তার নিরুপায় অবস্থা বুঝিয়ে দেয়; স্তম্ভিত অবস্থা বুঝিয়ে দেয় চিত্রকের ললাট তিলকের ...। আর এই পরিস্থিতিতেই নাট্য চমক সৃষ্টি করে প্রবেশ করেছে কিশোর অশ্বারোহী। কিশোর অশ্বারোহীর “সুগোপা” ডাক সুগোপাকে যেমন স্বস্তি দিয়েছে তেমনি চিত্রককে পথ ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করেছে। কাহিনির দিক থেকে এই চমক প্রয়োজন ছিল। রাজকুমারীর এই আকস্মিক আগমন চিত্রককে যেমন বিমূঢ় করে তেমনি সুগোপাকে স্বস্তি দেয়—পাঠকেও চমক দিয়ে জাগিয়ে তোলে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অশ্বারোহীর প্রশ্নের উত্তরে সুগোপা—বলেছে “ঐ বিদেশী গ্রামীণটা প্রগলভতা করিয়াছিল মাত্র”<sup>১০</sup> কিন্তু কেউ

এর প্রতিকার চায়নি। অশ্বারোহী তরুণ চিত্রককে অশ্বরক্ষা করতে বলেছে। আর এই পরিস্থিতিতেই চিত্রকে ললাট চিহ্ন আবার আরক্ত হয়ে উঠেছে। সে অশ্ব চুরি করে পালিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইভাবে কাহিনি-কার কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন

১. চিত্রকের সঙ্গে সুগোপাকে কেন্দ্রে রেখে কিশোর রাজকুমারীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত পটভূমিতে—গল্পের প্রকৃত সূত্রপাত হয়েছে।

২. এই পরিচ্ছেদে নবাগত বিদেশি চিত্রক-সুগোপার সঙ্গে প্রগলভতায় এবং রাজকুমারীর অশ্বচুরি করে কাহিনিতে একটা Conflict তৈরি করেছে। এই Conflict থেকেই প্রাথমিক বিরোধের মধ্য দিয়ে চরিত্র দুটি পরিণতিতে মিলনের দিকে গেছে। এই ভাবে মোঙের অতীত বর্ণনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক জীবনের নিরুত্তাপ অবস্থার মধ্যে একটা action দেখিয়ে লেখক কাহিনির মধ্যে যেমন একটা উত্তাপ তৈরি করেছেন তেমনি পাঠকের মনকেও জাগরুক করে তুলেছেন।

৩. চিত্রক এই কাহিনির নায়ক। তার অতীত উদ্ঘাটনের কোনো একটা উপায় চাই। সেই উপায় তার ললাট চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। পরে পৃথা এই চিহ্ন দেখেই তিলক বর্মা নামে তাকে শনাক্ত করতে পারবে। এইভাবে কাহিনিতে কয়েকটি দিক প্রথম দুটি পরিচ্ছেদেই উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। উদ্ঘাটনের এই রীতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত নাটকে এবং প্রাচীন গ্রিক নাট্য সাহিত্যে বেশ প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম মগধের দূত। এই পরিচ্ছেদের দুটি অংশ; প্রথমটি পরবর্তীটির পটভূমি। আর যে চিত্রকবর্মা ক্রমশ কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে তার গুরুত্বের কারণও তো জানানো দরকার। তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে রাজা স্কন্দের কথা; ইতিহাসের কথাই ঔপন্যাসিক নিজের ভাষায় তুলে দিয়েছেন যুবরাজ স্কন্দ যে বিদেশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন সে কথা ইতিহাস সমর্থিত। এই খানে গল্পের প্রয়োজনে লেখক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে হুণ অধিকারের বর্ণনা দিয়ে গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিটঙ্ক দেশ হুণের অধিকার ভুক্ত হয়ে রইল। আর তারই আনুগত্য দাবি করে চিঠি নিয়ে যাবে রাজদূত। হুণ আক্রমণের সময় পাঞ্জাব প্রদেশের সমস্ত সামন্ত রাজাদের কাছেই দূত পাঠানো হয়েছিল সমবেত প্রতিরোধের জন্য। ইতিহাসের সত্য। সেই সূত্রে কল্পিত বিটঙ্ক রাজ্যেও দূত পাঠানো সম্ভব। এটা ইতিহাসের তথ্য না হলেও ইতিহাসের বিচ্যুতি নয়। তারপর দেশে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ চলে তখন যে অস্ত্র শক্তির প্রাবল্য এবং চাতুর্যের জয় হয় তাও সত্য। কাহিনি অংশে এই ভাবে শশিশেখরকে প্রবঞ্চিত করে তার সব কিছু চিত্রক কেড়ে নেয়। এই অংশটুকু অতি সরলীকৃত কিন্তু চিত্রকের পরবর্তী কার্যকলাপের জন্য মগধরাজের পত্র এবং স্মারক দুটি খুব প্রয়োজনীয় ছিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিদূষক পিপুলের স্থূল রসিকতা এবং শশিশেখরের

অজ্ঞতা সত্ত্বেও শুধু এই কারণে অংশটির প্রয়োজন। নতুবা শশিশেখরকে প্রবঞ্চিত করে তার সর্বস্ব হরণ একটু বেশি কল্পনাশ্রয়ী।

মাঝখানের পরিচ্ছেদগুলি সবই ঐতিহাসিক রোমান্সের কাহিনি বিন্যাসের পরিচায়ক। রাজপুরীর মধ্যে চোর ধরার ক্ষেত্রে প্রহরী অপেক্ষা সুগোপার ভূমিকা চমকপ্রদ। চতুর চিত্রক এই প্রথম এবং শেষবারের মতো বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে ধরা পড়েছেন। আসলে তাকে ধরাই উদ্দেশ্য—রাজপুরীতে আনানোই লক্ষ্য। এরপর চিত্রক আত্মরক্ষার এবং প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবেছে—তাতে এই অনায়াস জড়িমা নেই। অন্যদিকে রাজকুমারী রট্টার মধ্যে যেমন রোমান্সের নায়িকার মূর্তি ফুটে উঠেছে তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মেবার পতন নাটকের মানবপ্রেমী দেশপ্রেমী ও বিশ্বপ্রেমী চরিত্র—ছাপও পড়েছে। রট্টা লেখকের উদ্দেশ্যের বাহন। আর্ষ অনার্য মিলনের দূতী।

আগেই বলা হয়েছে স্কন্দই এর ইতিহাসের ভিত্তি আর ইতিহাসের সম্ভাব্যতার দিক মনে রেখে এর কাহিনি গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটি কথা বলা দরকার। ইতিহাসে পাওয়া যায় স্কন্দ ৪৫৫ খ্রিঃ থেকে ৪৬৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ১২ বছর রাজত্ব করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্কন্দকে কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মনে করতেন। শরদিন্দুও তাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকের এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর প্রথম পরিচ্ছেদে শরদিন্দু স্কন্দের ‘ষোড়শ রাজ্যক্ষে’ কাহিনির পত্তন করেছেন কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তাঁর রাজত্ব কাল ১২/১৩ বছরের বেশি নয়। অবশ্য তাতে শরদিন্দুর কিছু করার ছিল না। তিনি রাখালদাসকে অনুসরণ করেছেন। আর এই রাজ্যকাল ব্যাপারটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়—কেননা কাহিনির বিষয় হুণ আক্রমণের পটভূমিতে একটি কল্পিত রোমান্সের পরিবেশন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন জাতিধর্মের মিশনের বাণী প্রচার। ইতিহাসের যে পর্ব ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বিষয়—তখন কোনো ভাবুকের পক্ষেই রট্টার মতো ভারত-ঐক্যের বাণী প্রচার—জাতি-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে মানব মহিমা ও ভারত মহিমার মন্ত্র প্রচার সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় কালৌচিত্য লঙ্ঘন—ইতিহাসকে এ কালের—বিংশ শতকের ভাব ধর্মে বিশিষ্ট করে তোলা।

ইতিহাসের পুনর্গঠন অর্থে সে কালের ইতিহাস কীরকম ছিল তার একটা সম্ভাব্য ছবি গড়ে তোলা। সেরকম ছবি গড়তে গেলে ইতিহাসের তথ্য যতটা দরকার লেখক তা পাননি। যেভাবে রট্টা যশোধরা বিদেশি দূত চিত্রকের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পাছশালায় রাত কাটিয়েছেন— গুহাবাস করেছেন এবং স্কন্দের স্কন্ধাবারে পৌঁছেছেন তা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়। যদিও মধ্য যুগে নারীরা কোথাও কোথাও রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য শাসনে অংশ নিয়েছেন— কেউ কেউ যুদ্ধে গেছেন যুদ্ধ পরিচালনাও করেছেন কিন্তু সাধারণভাবে মেয়েরা এতটা স্বাধীনতা পেতেন

না। তাঁরা অভিভাবকদের রক্ষণা বেষ্টনেরই থাকতেন। এজন্য শরদিন্দু তাঁকে আর্ষ কন্যা না করে ‘হুণ কন্যা’ হিসেবে দেখিয়েছেন। এবং তাঁর চরিত্রের কোমলতা ও চারুশীলতার সঙ্গে অশ্বারোহন দক্ষতা ও পথের বিপদ উত্তীর্ণ হবার মতো চারিত্র্য শক্তিও যোজনা করেছেন। তবে যুগের যে গাঢ় অন্ধকারে হুণ আক্রমণ পর্বের (পঞ্চম শতক) ভারত ইতিহাস আবৃত ছিল শরদিন্দু তাঁর সৃষ্টি চাতুর্যে, তাঁর কালের প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য সহযোগে, তাকে একটা নবরূপে একালের কাছে উপস্থিত করেছেন। একটি তথ্যে পাওয়া যায়—

“Women even sometimes took part in war - Akkadevi (sister of chaluksya king Jaysimha II) fought battles ... Umadevi, queen of Hoysala King Virballala II led two campaigns ...)”

শরদিন্দু দাসী রমণীদের প্রতিও সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসে সুদর্শনা লহরী, ‘গৌড়মল্লারে’ কুহ কোনো অংশে রাজ অন্তঃপুরনারীদের চেয়ে কম জান না। দাসী রমণীদের ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অসাধ্য সাধন, ষড়যন্ত্র, কাহিনির খাতিরে উচ্চস্থানে আসন দেওয়া ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে কম লেখকই ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী বিয়ের কথা মনে পড়ে। শরদিন্দুও সাবিত্রীকে পবিত্র বলেই মন্তব্য করেছেন। হয়তো ‘চরিত্রহীন’ পড়ে শরদিন্দুর মনে দাসীদের সম্পর্কে একটা সদর্থক ধারণা জন্ম নিয়েছে। শরদিন্দুর মতে—

“‘চরিত্রহীন’ আজ শেষ হয়ে গেল। অনেকে বলে বইখানা রুচি বিরুদ্ধ। যারা বলে তারা সাহিত্যিক নয়। এ বইয়ের প্রত্যেক পাতা ফুলের মত শুভ্র—অভ্রের মত নির্মল! আমি এমন বই পড়িনি, যার সব চরিত্রগুলোই মহান, অভভেদী, বৃহৎ। ‘চরিত্রহীন’ একটা মহাকাব্য। দোষও আছে—কিন্তু দোষগুলো এতই তুচ্ছ—আমাদের মর্ম স্পর্শ করতে পারে না। এ যেন একটা উদার, স্বর্গীয় মহাসঙ্গীত। এর মধ্যে সমাজের সঙ্কীর্ণতা নেই—আবার বিচারের ক্ষুদ্র শুচিতা নেই—সবই যেন একটা বিরাট মহত্ত্বের স্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে। মনে ভাবি, এ পৃথিবীটা যদি শরৎবাবুর কল্প-জগতের মত হত। সতীশের মত চরিত্রহীনতা যদি কারও থাকে সে ধন্য; সাবিত্রীর মত ভ্রষ্টা যদি কেউ থাকে সে সার্থক; কিরণময়ী মত অপরাধিনীর অপরাধ যার সে মহান!”

অর্থাৎ নারীর প্রতি সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলিতেও। শরদিন্দু নিজেও তা দেখিয়েছেন। এছাড়াও রূপে গুণে সকল পুরুষের লোভনীয় করে রট্টা চরিত্রকে অঙ্কন করে বলেছেন তাতে কিরাতের দোষ কি? এতেও কিন্তু স্কন্দের সুপ্ত প্রেম বাসনার প্রকাশই ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, নারী পুরুষের মিলিত

সংসারই পারে শান্তি দিতে। তাই স্কন্দ যখন শেষ বয়সের চিন্তায় মগ্ন থেকেছে তখন তাঁর মনে বিয়ের চিন্তা ঘুরে ঘুরে এসেছে। কারণ নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূর্ণতার প্রতীক। সুতরাং আলোচ্য উপন্যাসে পিপ্লী মিশ্র ও তার স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গ তুলে লেখক স্কন্দের মনে বিবাহের স্বাদ জাগাতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে চিত্রকের মনে রট্টা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। সে ভেবেছে রমণীর মন কোমল ও তরল—অল্পতাপে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কারণ স্কন্দের ব্যক্তিত্ব, ঐশ্বর্য, শশাগরা ভারতবর্ষের সশ্রী অধীশ্বর ইত্যাদি দেখে হয়তো রাজকুমারী ভুলতে পারে। তার (চিত্রক) তো কিছু নেই। তাই সে মনে মনে চিন্তিত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের একজন বিরাট ব্যক্তিত্বকে কীভাবে প্রেমিক করে তুললেন, কী করে ভাবুক ও সাংসারিক করতে চাইলেন—সত্যিই সাধারণ পাঠক হিশেবে আমাদের কৌতূহল বাড়ায়। আর এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

চিত্রক কিন্তু সংশয়ের অবকাশ পায়। তদুপরি বন্ধু গুলিক বর্মার কথা তাকে আরো হতাশ করে তোলে। গুলিকের কথায় ধরা পড়ে নারী সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। সে বলে নারী যতক্ষণ তোমার বাহু মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ তোমার, বাহু মুক্ত হলে আর কেউ নয়। অনেক দেশের নারী দেখলাম; সকলই সমান, কোনো ভেদ নেই। চিত্রকেরও তাই-ই অভিজ্ঞতা। আসলে শরদিন্দুর বাস্তব অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা তাঁরই সৃষ্টি এই গুলিক বর্মা। তাই স্বাভাবিকভাবে নারীর প্রতি আকর্ষণের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রকের মনে জেগে ওঠে পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা। মনে পড়ে যায় ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা।

শরদিন্দুর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গৌড়মল্লার’। মল্লার রাত্রিকালীন রাগ হিশেবে পরিচিত। পটভূমিকায় লেখক উপন্যাসের পটভূমি হিশেবে গৌড়দেশকে নিয়েছেন, আর কাল হিশেবে নিয়েছেন রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী কুড়ি বছর। তিনি এই গ্রন্থে “এই সময়ে বাঙালীর চরিত্র, সংস্কৃতি, গ্রাম্যজীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা” (পটভূমিকা) করেছেন। এই জন্য নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ এবং সুকুমার সেনের ‘প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী’র পুস্তিকা তাঁর প্রধান অবলম্বন। রাজবর্গের কথা এ উপন্যাসে প্রধান নয়—সাধারণ নরনারীর জীবন কথাই এর লক্ষ্য। ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসে তাঁর ঈঙ্গিত ছিল ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে শক হুণ পাঠান মোগল মিলে মিশে গেছে। পাটান মোগল মিলেছে কিনা তা এ গল্পে বলা হয়নি। বলা হয়েছে আর্ঘ্য ও হুণ

জাতির মিলনের কথা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলনের কথা। ইতিহাসের তথ্য এখানে কম, লেখকের অভিপ্রায় ইতিহাসের ভিতরে সম্ভাবনার বীজ বপণ করেছে। ইতিহাস অপেক্ষা লেখকের অভিপ্রায় এখানে বড়। ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে ইতিহাস অংশ ক্ষীণ; মানবজীবনের কাল্পনিক রূপ রচনা প্রধান। অভিপ্রায় এখানে ইতিহাসকে কুণ্ঠিত করেনি।

শশাঙ্ক বাঙালি রাজাগরের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। রোটারগড় গিরিগাত্রে “শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক”<sup>১০</sup> নামটি ক্ষোদিত আছে। এই সূত্রে অনুমান করা হয় তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত<sup>১১</sup> ছিলেন শশাঙ্ক একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শত্রু ছিল অনেক। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানবদের মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের মতো রাজনীতি জ্ঞান দূরদর্শিতা এবং কূটনৈতিক বুদ্ধি তাঁর ছিল না। ফলে ভাস্করবর্মা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। তারপর জয়নাগ নামে একজন রাজা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। জয়নাগের কোনো পরিচয় জানা যায় না। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই তথ্যগুলিকে ঔপন্যাসিক যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেখানে ইতিহাস নীরব সেখানে ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বর প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের তথ্যের অভাব ঔপন্যাসিকের কল্পনার দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন মুদ্রা এবং অভিলেখ থেকে মনে করা যায় জয়নাগ ৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন। মহারাজাধিরাজ উপাধি থেকে মনে হয় তিনি বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন।<sup>১২</sup> History of Bengal -এ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

“On the basis of the tradition recorded in MMK. We may hold that after the anarchy and confusion caused by the invasion of Bhaskarvarman has subsided, and a son of Sasanka had vainly tried to reestablish the fortune of his family, the kingdom passed into the hands of Jaynaga.”<sup>১৩</sup>

রাধাগোবিন্দ বসাকের মন্তব্যের প্রসঙ্গ উদ্ধার করে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন

“It is just possible that Jaynag ruled after the death of Sasanka and before conquest of Karna Subarna by Bhaskar Varman.”<sup>১৪</sup>

শরদিন্দু কাহিনীতে এই দ্বিতীয় সূত্রটি গ্রহণ করেছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মানব ৮ মাস রাজত্ব করেন, কিন্তু তিনি ভাস্করবর্মার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি। ভাস্করবর্মা রাজপুরী দুদিন অবরোধ করে রাখার পর তৃতীয় দিনে পুরীতে প্রবেশ করেন। ইতিহাসে মানবদেবের কোনো

খবর মেলেন না। সম্ভবত তিনি এই যুদ্ধে নিহত হন বা শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যু ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। মানবদেবের সঙ্গে নিশ্চয় ভাস্করবর্মার যুদ্ধ ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দেই হয়ে থাকবে। এর কুড়ি বছর পরের গল্প বজ্রদেবের সিংহাসনারোহন। এটা একান্তই ইতিহাসের বাইরের কথা। ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ জয়নাগ সিংহাসন দখল করতে পারেন। গল্প অনুসারে ৬৫৭-৫৮ সাল। সেটা মারাত্মক ত্রুটি নয়। উপন্যাস অংশে শরদিন্দু মানবদেবের পুত্র বজ্রদেবকে একদিনের জন্য সিংহাসনে বসিয়েছেন। ইতিহাসে একথা পাওয়া যায় না। গৌড়ে মাৎস্যন্যায়ের যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে লেখক এই অনৈতিহাসিক রোমাঞ্চিক ঘটনাকে স্থান দিয়েছেন। এ বিষয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টি অপেক্ষা অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস এ উপন্যাসের মূল বিষয় নয়। পরিপার্শ্ব বা পটভূমি মাত্র। অন্যান্য উপন্যাসে রাজরাজড়ার কাহিনি তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ বা প্রণয় পরিণয় বিষয়বস্তু হলেও ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসের বিষয় সাধারণ মানুষের জীবন কথা। পটভূমিকায় লেখক বলেছেন ‘শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে’ “বাঙালীর চরিত্র, সংস্কৃতি গ্রাম্যজীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল” তাই তিনি দেখাতে চেপ্টা করেছেন। শুধু এই নয় আরো কিছু উপপাদ্য তাঁর ছিল। সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়ায় লেখকের লক্ষ্য

১. ৭ম শতকের মধ্যভাগে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তা বলা
২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় দেওয়া
৩. এই মাৎস্যন্যায়ের যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতির কথা বলা
৪. এই শতবার্ষিক ত্রাস্তিকালে বাঙালির বহির্বাণিজ্যের অবস্থা কী হ’ল তা দেখানো।

কাজেই লেখক এখানে কোনো প্রণয় কাহিনি কেন্দ্রিক রোমাঞ্চ রচনার উদ্দেশ্য নেন নি বরং দেশের সমাজ ইতিহাস ঘটিত বিষয়কে ইতিহাসের ইঙ্গিত নিয়ে গড়ে তুলেছেন। আর এই পুনর্গঠন কর্মে নীহাররঞ্জন রায়ের সংগৃহীত উপাদান তাঁর কাহিনির ভিত্তি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জ্ঞান তার সহায়ক, সুকুমার সেনের বাংলা ও বাঙালি তাঁর সমাজ বোধের দর্শক।

এ উপন্যাসের শুরু আভীর পল্লীতে—বেতসগ্রামে। কর্ণসুবর্ণ থেকে বিশ ক্রোশ উত্তরে মৌরী নদীর তীরে। এটি শেষ গ্রাম। তারপর আর গ্রাম নেই। আর গ্রামে ইক্ষু মাড়াই দিয়ে কাহিনির শুরু। ইক্ষু ধান্য এবং গোধান গ্রামের তিন সম্পদ। এই তিন দিকের প্রসঙ্গই এ উপন্যাসে এসেছে।

“গ্রামের দক্ষিণ দিকে ইক্ষু ও ধানের ক্ষেত। ধান্য ইক্ষু গোধান এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ...

গোধন হইতে আসে ঘৃত নবনী; ইক্ষু হইতে গুড়। এই গুড়ই দেশের প্রাণবস্তু;”

‘সদুক্তি কর্ণামৃত’-এ হেমন্তের বাঙলার একটি ছবিতে এই গুড়ের কথা বলা হয়েছে : “সংস্কৃত-ধনদিন্দুযন্ত্র মুখরা গ্রাম্য গুড়ামোদিন :”<sup>১৮</sup> (আখ মাড়াই কলের শব্দে মুখরিত গ্রামগুলি গুড়ের গন্ধে আমোদিত)। ধান এবং গোধান এই দুটি সম্পদ ও বাঙলার অর্থনীতির প্রাণবস্তু। শরদিন্দু এই উপন্যাসে সেই সমাজ-অর্থনীতির দিক থেকেই কথারম্ভ করেছেন। বহির্বাণিজ্যের কথাও প্রথমেই বলা হয়েছে। আর বাংলার সঙ্গে স্থলপথে উত্তর ভারতের যোগের কথাও এসেছে। তাম্রলিপ্ত থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত পথের কথা নীহাররঞ্জন রায়ের লেখাতেও আছে। এই পথে সার্থবাহ, অন্তর্বাণিক ও তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করতেন। মোটের উপর শাস্ত্র নির্বিঘ্ন মস্তুর গ্রাম্য জীবনের ছবি এঁকেই কাহিনির সূত্রপাত হ’ল। লেখকও মানুষের এই সুখ শান্তির কথা বলে শুরু করেছেন : “বেত্রকুঞ্জে ক্লাস্ত কিসণে দ্বিপ্রহরে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে; কিশোরী সখীরা গলা ধরাধরি করিয়া মনের কথা বিনিময় করিতে যায়... প্রকৃতির কোনো সহজ মধুর মস্তুর জীবনযাত্রা; জটিলতা নাই, আড়ম্বর নাই উদ্বেগ নাই। মহাকাল এখানে অতি মৃদুচ্ছন্দে পদপাত করেন।”

গ্রামের এই শান্ত রসাম্পদ, সুখী ও সম্মিলিত জীবনের আনন্দের বৃত্তে একমাত্র গোপা ও রঙ্গনাই বিচ্ছিন্নতার দুঃখ ভোগ করছে। প্রথম পরিচ্ছেদের কাহিনি উপস্থাপনায় সম্মিলিত গ্রামীণ জীবনের ভিতর থেকে লেখক এই দুই নারীকে আলাদা করে নিলেন। গ্রাম পটভূমি রূপে পিছনে পড়ে রইল। এই দুই নারীর জীবনের উপর দিয়ে এবার কাহিনির রথচক্র ঘর্ষিত মন্ড্রে প্রবাহিত হয়ে চলবে।

কাহিনির সূত্রপাত ভাস্করবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে মানবদেবের পরাজয়ের দিনে। রণক্লাস্ত মানবদেব কজঙ্গলের যুদ্ধে জয়ের আশা নেই দেখে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বেতসগ্রামের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছান। লেখক এখান থেকে কাহিনি শুরু করেছেন। ইতিহাসের কথা সূত্রে তিনি লিখেছেন শশাঙ্কের মৃত্যুর ঠিক আট মাস পরে যুদ্ধে মানবদেব পরাজিত হন। “আজ হইতে ঠিক আটমাস পূর্বে গৌড়কেশরী শশাঙ্কদেব বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন।”<sup>১৯</sup> আর বিস্ময়াহত মোহাচ্ছন্ন, রঙ্গনার প্রশ্নের উত্তরে মানবদেব জানিয়ে ছিলেন “আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু আপাতত রাজা।”<sup>২০</sup>

ইতিহাসে পাই ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কদেবের মৃত্যু হয়। ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প’-এ বলা হয়েছে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ কলহে ও বিদ্রোহে গৌড়রাষ্ট্র ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প’-এর প্রয়োজনীয় অংশের ইংরেজি অনুবাদে পাই—

“After the death of Soma the Ganda Political system was reduced to mutual distrust, raised weapons and mutual jealousy - One (king)

for a week; another for a month; then a republican constitution - such will be the daily condition of the country on the bank of the Ganges where houses were built on the ruins of monasteries. Thereafter Soma's (Sasanka's) son Manava will last for 8 months 5(1/2) days.”<sup>১১১</sup>

রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বর্ণনাকে ‘অনেক পরিমাণে সত্য’ বলে স্বীকার করেন। আর এই অভ্যন্তরীণ কলহের কথা শরদিন্দু উপন্যাসেও বর্ণনা করেছেন। মানবের পরাজয়ের মূল কারণ হিসেবে তিনি মন্ত্রিগণের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেছেন। “রাজপুরুষদের মধ্যে ঘরে ঘরে চক্রান্ত চলিতে লাগিল। রাজ্যের মর্মকোষে কীট প্রবেশ করিল।” শত্রু পক্ষ এই সুযোগ নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করল। সেনাপতিদের মনেও ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষ সঞ্চারিত হয়েছিল। কাজেই মানবদেব ভাস্করবর্মার হাতে পরাজিত হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কর্ণসুবর্ণে পৌঁছে আর একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি। এর ঠিক পাঁচদিন পরে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল ইতিহাসে তা লেখেনি। যেখানে ইতিহাসের শেষ সেখান থেকেই কাহিনির সূচনা।

কজঙ্গলে ভাস্করবর্মার সঙ্গে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে মানব রণত্যাগ করেছিলেন। তখনো মানবদেব আশা ছাড়েননি। কিন্তু শত্রুরা তার পশ্চাদ্ধাবন করছিল। উপন্যাসে বলা হয়েছে পরদিন দিবা এক প্রহরের সময় ভাস্করবর্মার একদল সৈন্য—কুড়ি পাঁচশজন পদাতিক বেতসগ্রামে আসে। তারা জানতে চায় গৌড়ের রাজা বা রাজপুরুষ কেউ এখানে লুকিয়ে আছে কিনা। গ্রামের লোকেরা দলে ভারি বলে এরা গ্রামে লুটপাট চালাতে পারেনি। গ্রামের নিরুত্তাপ জীবনযাত্রার মধ্যে তারা ক্ষণিকের বিভ্রান্তি এনেছে বটে কিন্তু গ্রামীণ জীবনকে লণ্ডভণ্ড করতে পারেনি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা রাজড়ার যুদ্ধ গ্রামীণ জীবনের নিরুদ্বেগ প্রশান্তিকে খুব বেশি নষ্ট করতে পারেনি। চিরপ্রচলিত প্রথাবদ্ধ জীবনের পরিবর্তন হয়নি। দেশের লোকেরা রাজার খোঁজও তেমন একটা রাখত না। মানবদেবকে রঙ্গনা শশাঙ্কদেবের কথা বলেছে—কিন্তু শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর খবর গ্রামের কারো জানা নেই। না জেনেই তাদের জীবন চলত। হেমন্তে ইক্ষু মাড়াই এর কাজ যেদিন শুরু সেদিন কজঙ্গলে রাজ্যরক্ষার এবং রাজার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চলেছে—তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। যুদ্ধে মানবের পরাজয়ের পরও আখ মাড়াইয়ের কাজ যথারীতি চলেছে। রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে প্রজার কোনো জ্ঞান ছিল না কোনো উৎসাহ ছিল না।

এই নিরুদ্ভিগ্ন আত্মীয়পল্লীর গ্রামীণ বেতসকুঞ্জে রঙ্গনার সঙ্গে মিলন হয়েছে কল্পনার রাজপুত্রের। চাতক ঠাকুরের ভবিষ্যৎ দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। মানবদেব রঙ্গনার বরমাল্য

গ্রহণ করেছেন, এক রাত্রি তার কুঞ্জে কাটিয়েছেন এবং অভিজ্ঞান অঙ্গদ রঙ্গনাকে দিয়ে আবার আসবার কথা বলে গেছেন। ইতিহাসের রাজপুত্র এখানে কল্পনার নায়ক হয়ে উঠেছে। মানবদেবের যে রূপ এখানে দেখি তাতে পাই তিনি স্বভাব-উন্মুক্ত ও অকপট চরিত্রের মানুষ। “মানুষটি যে স্বভাবতই মুক্ত প্রাণ, তাহা তাহার হাসি হইতে প্রতীয়মান হয়।” মানবদেব যুদ্ধে পরাজয়ে হতাশ নয় বরং জীবন রসিক পুরুষ। সম্মুখে রাত্রির আশ্রয় মিলেছে, সফেন দুক্ষে ক্ষুধাতৃষণ ও তখনকার মতো তৃপ্ত; রঙ্গনার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। “রঙ্গনার পুষ্পপেলব যৌবন লাভণ্য তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।” বেতসকুঞ্জে শোলার মালা বদন করে মানবদেব মনের মানুষ খুঁজে পেলেন আর রঙ্গনা পেল তার সোনা পোকা—রাজপুত্র স্বামী। আর পেল প্রতিশ্রুতি যদি রাজ্য রক্ষা করতে পারি, ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। সে পথ করছি। মানবদেব আর রঙ্গনার এই মালাবদল বৃত্তান্তের মূল সূত্র মনে হয় রাজসিংহ উপন্যাসে নির্মলকুমারী-মানিকলালের সম্পর্ক বনুন এবং দুগ্ধন্ত শকুন্তলার সম্পর্কের মেলবন্ধনে লিখিত।

মানবদেব রাজ্যরক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু এখানে ইতিহাসের কথা একবার বলা দরকার। ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে মানবদেবের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এমন কথা ইতিহাসে দেখা যায় না। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ গৌড় ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সেখানে চারটি পৃথক রাজ্য—পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্ত—দেখেছিলেন। ভাস্করবর্মা এর কয়েক বছরের (within a few years) মধ্যে ভাস্করবর্মা এই রাজ্যগুলি দখল করেছিলেন। ৬৪২ খ্রি. তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে কজঙ্গলে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিলিত হন। অবশ্য নীহাররঞ্জন রায় একটি অনুমানের কথা বলেছেন। “৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মা-হর্ষবর্ধন সাক্ষাৎকারের আগেই ভাস্করবর্মা কোনো সময় পুণ্ড্রবর্ধন কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়া কর্ণসুবর্ণের স্কন্ধাবার হইতে এক ভূমিদান পট্টোলী নির্গত করাইয়াছিলেন।”<sup>২২</sup> ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার একথা বলেননি। তিনি বলেছেন আত্মঘাতী বিদ্রোহেই সম্ভবত শশাঙ্কের বিশাল রাজ্যের শক্তি নষ্ট হয় ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।<sup>২৩</sup> তবে History of Bengal (Vol. I) গ্রন্থে ড. রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন ভাস্করবর্মা এবং হর্ষবর্ধন ৬৩৪ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময় শশাঙ্কের রাজ্য দখল করেন। ইতিহাসের এই সংকেত লেখক মানবের সঙ্গে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মার যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে তুলে ধরেছেন।

মানবদেবের চরিত্রের যে সহজ মুক্তপ্রাণ অকপট চিত্র শরদিন্দু এঁকেছেন—ইতিহাসে তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প’ নামক বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র মানবদেবের রাজত্ব করবার কথাও নেই। তাই ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ তথ্যের অভাবে এই কথাতেও সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এঁরা সকলেই স্বীকার করেন রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্যই রাজ্য নষ্ট

হয় এবং তা বহিঃশত্রুদের পথ সুগম করে। ইতিহাসের এই ইঙ্গিতের ভিতর থেকেই শরদিন্দু মানব চরিত্রের সম্ভাব্য উপাদান পেয়ে থাকবেন। মানব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন “পিতার মতই সে দুর্মদ বীর... কিন্তু মন্ত্রণাসভায় তাহার বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে নাই।” শশাঙ্ক ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। মানবের সে ক্ষমতা ছিল না। শশাঙ্ক সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন তিনি “গৌড় স্বাতন্ত্র্যের নায়ক।”<sup>২৪</sup> তাঁর স্বাধীন গৌড়রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল ‘গৌড়তন্ত্র’ গড়ে তোলা।<sup>২৫</sup> তিনি একটি নূতন সদর্শক আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন—অনেক নূতন নূতন রাজপুরুষের পদ এবং রাজকর্ম বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় বলেন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশি আত্মসচেতন হইয়াছে, নূতন নূতন সামাজিক দায় ও কর্তব্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে (ঐ, ১/৪৪৫)। এই আমলাতন্ত্রই তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতালভের দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনে। শরদিন্দু সেই বিপদের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। লক্ষণীয় বজ্রকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে প্রধান কারিগর ছিলেন শশাঙ্কের এক পুরানো মন্ত্রী কোদণ্ড মিশ্র। “শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর মানবদেবের হ্রাব রাজত্বকালে মন্ত্রীদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, কোদণ্ড মিশ্র তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই।” কোদণ্ড মিশ্র কাঙ্ক্ষনিক চরিত্র। কিন্তু যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন শশাঙ্কদেব এবং যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজ্যনাশের রন্ধ্রপথ নির্মাণ করেছিল তিনি তাদেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর নাম নির্বাচনে, ভূমিকায়, আকৃতি রচনায় শরদিন্দু তাঁকে সে কালের একজন সাথর্ক প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

আবার মানবদেবের কথা প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যুদ্ধে পরাজিত মানবের মধ্যে কোথাও রাজ্যচ্যুত হবার উদ্বিগ্ন এবং ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা দেখা যায় না। শশাঙ্কদেবের মতো তার তির্যক বুদ্ধিমত্তা দেখা যায় না। শরদিন্দুর লেখায় মানবের বীর ধর্ম এবং উদ্বিগ্ন মুক্ত সহজ জীবনভোগের অভিলাষ লক্ষ করা যায়। ভবিষ্যৎ অনাগত এবং অনিশ্চিত, তার জন্য এই মুহূর্তের জীবন সুখকে উপেক্ষা নয়—মানবকে প্রাচীন classical বীর চরিত্রের এই আদর্শে শরদিন্দু গড়ে তুলেছেন। তার পক্ষে রাতের মত নিরাপদ আশ্রয় আহার এবং রঙ্গনার মতো সঙ্গিনী কোনোটাই উপেক্ষার বস্তু নয়। রঙ্গনার পক্ষে এইরকম অচেনা অজানা পরপুরুষের কাছে আত্মদান কতোটা বাস্তব সম্মত -এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই সম্ভাব্যতা গড়ে তোলবার জন্য চাতক ঠাকুরের দূরদর্শিতা পরিচ্ছেদে তার ভবিষ্যৎ দর্শনের অবতারণা করা হয়েছে। রঙ্গনার চুলে সোনাপোকা বলতে দেখে চাতকঠাকুর হ্যালুসিনেশনের বশে (?) ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন। সোনা পোকা দেখে তাঁর মনে হল রঙ্গনার সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে। এই ভাবে হঠাৎ ভয় হয়ে চাতকঠাকুর যুদ্ধ দেখলেন

আর রঙ্গনার চুলে সোনাপোকা বসতে দেখে বিয়ের সম্ভাব্য ইঙ্গিত পেলেন। রঙ্গনার মা গোপাকে বললেন ওর সিঁদুর পরার সময় হয়েছে— দেবতারা তাই ইশারায় জানিয়ে দিলেন। রঙ্গনার জন্য রাজপুত্র আসছে।

হ্যালুসিনেশনের বশে সোনাপোকাকে সিঁদুর ভেবে চাতকঠাকুর হয়ে divinely possessed পড়েন—অর্থাৎ তার উপর দেবতার ভর হয়। তার চেতনা ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই ভর যুক্ত অবস্থায় তিনি দেবতার ইশারা বুঝতে পারেন। ভর হওয়া বা দেবতার আবেশ বশে ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া আমাদের লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাচীন গ্রিসে এ জিনিসে বিশ্বাস ছিল। হ্যালুসিনেশনে এখনো বিশ্বাস আছে। আর আমাদের দেশে এখনো লোকের ভর হয়। শরদিন্দু এই লোকবিশ্বাসের সাহায্য নিয়ে রঙ্গনার বিয়ের পটভূমি তৈরি করেছেন—গোপার বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করেছেন। তাছাড়া গোপার অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। গোপার জীবনে সৈন্য সংগ্রহকারী রাজপুরুষের আকস্মিক আগমন এবং রঙ্গনার জন্ম-এসবই তাকে গ্রামীণ মানুষের সমষ্টিবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। চাতকঠাকুর ছাড়া গ্রামের আর কারো সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল না, ফলে গ্রাম-সমাজে একঘরে নিঃসঙ্গ দুই নারীর পক্ষে দীর্ঘ অপেক্ষার দিনগুলি পেরিয়ে একটা আকস্মিক আশার আলো দেখতে পাওয়া—রঙ্গনার জীবনে স্বামীলাভের সুযোগ আর সব অবিশ্বাসকে ছাপিয়ে উঠেছে। এইভাবে দুই প্রজন্মের দুই রাজপুরুষের আগমনের ফলে রঙ্গনা এবং বজ্রের জন্ম। গ্রামীণ নারীদের যৌন শিথিলতার (?) কোনো সামাজিক ইঙ্গিত এখানে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। মানবদেব রঙ্গনাকে গোপনে বিয়ে করেছেন। এ হল বরকন্যার পরস্পর আকর্ষণ জনিত গান্ধর্ব বিবাহ। ‘গৌড়মল্লার’ সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন— “তোমার অমোঘবীর্য এক নায়ক কর্ণসুবর্ণের রাজবল্লভ। দ্বিতীয় মানবদেবও অমোঘবীর্য। গোপাও যেমন রাঙাও তেমনই এক রাত্রেই গর্ভবতী। অবশ্য অসম্ভব কিছুই নয়। আর সেকালে হয়তো এমনই হইত।”<sup>২৬</sup>

এরপর বেতসগ্রামের কথা কম। কেবল বজ্রের বাল্যকালের দু-চারটি ছবি দিয়ে লেখক বজ্রকে যৌবনে উত্তীর্ণ করেছেন। মাবোর সময়টুকু গ্রামের শিশুদের বড় হয়ে ওঠার সময়কার সাধারণ বিবরণ। বত্রের শিক্ষা সক্ষমতা এবং গুঞ্জার প্রতি আকর্ষণের কাহিনি।

রাজনৈতিক ইতিহাস এ উপন্যাসের বিষয় কিন্তু কোনো রাজা বা রাজপুরুষকে কেন্দ্র করে সে কাহিনি গড়ে ওঠেনি। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা শুরু হয়—শতবর্ষের মাৎস্যন্যায় হিশেবে যা ইতিহাসে পরিচিত—তারই প্রথম পর্বের কয়েকবছরের কাহিনি নিয়ে এ উপন্যাস রচিত। একটা ব্যাপারে কালগত সংগতি সম্বন্ধে সংশয় জাগে। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কোন

সময় মানবদেবের সঙ্গে রঞ্জনার গান্ধর্ব বিবাহ ও এক রাত্রির মিলন। তাহলে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কোনো সময় কিংবা ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বজ্রের জন্ম। রঞ্জনার সঙ্গে মানবের মিলন কোণে হৈমন্তিক সন্ধ্যায়, তখন মানবের শাসনকাল ৮ মাস অতিক্রম করেছে। হেমন্তে মিলন আর বর্ষায় বজ্রের জন্ম। সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে; আকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ঢাকা। বজ্রের হুংকার ধ্বনির সঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে। অর্থাৎ ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে বজ্রের জন্ম। ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ বজ্রের বয়স ২০ বছর পূর্ণ হবে।

ইতিহাসের যে সংকেত লেখক দিয়েছেন তাতে পাই ভাস্করবর্মা মারা গেছেন। তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা তখন রাজা। শীলভদ্র বজ্রকে বলেছেন ‘কয়েকবছর হল ভাস্করবর্মার মৃত্যু হয়েছে’। ভাস্করবর্মার মৃত্যু ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসে পাই ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর অগ্নিমিত্র রাজা হয়েছেন। অগ্নিমিত্রের উল্লেখ বাংলার ইতিহাসে নেই। তবে ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে’র সাক্ষ্যে গৌড়ে এসময় প্রায়ই রাজা পরিবর্তন হত। কর্ণসুবর্ণের প্রজারা সে নিয়ে মাথা ঘামাত না। উপন্যাসে পাই কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্রে অগ্নিমিত্রের মৃত্যু হয়। কোকবর্মা রাণী শিখরিণীকে নিয়ে যান। আর একদিনের রাজা বজ্রের হাতে কোকবর্মার মৃত্যু হয়। কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বজ্রকে সিংহাসনে বসান, আবার রাণী শিখরিণীকে হস্তগত করে জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। বজ্রদেবের একদিনের শাসন—একদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে আরোহন ইতিহাস অনুমোদিত নয়, কিন্তু এ সময়কার অস্থির শাসন ব্যবস্থার চিত্র। বজ্রদেব উপন্যাসের চরিত্র, লেখকের কল্পনার সৃষ্টি; কিন্তু লেখক তাকেও ইতিহাসের গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত করে সে সময়কার ইতিহাসের ধারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

উপন্যাস অনুসারে বজ্রের কুড়ি বছর হিশেবের দিক থেকে ৬৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে হবার কথা। অথচ ইতিহাসে দেখি জয়নাগ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কর্ণসুবর্ণ দখল করেছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন “গৌড়ে ভাস্করবর্মার অধিকার খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই জয়নাগ নামক একজন রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন।”<sup>২৭</sup> আবার

“History of Bengal (Vol I) অনুসারে On the basis of the tradition recorded in MMK. We may hold that after the anarchy and confusion caused by the invasion of Bhaskaravarman had subsided, and a son of Sasanka had vainly tried to reestablish the fortune of his family the Kingdom passed into the hands of Jaynaga.”<sup>২৮</sup>

এই ইতিহাস অনুসারে ভাস্করবর্মার আক্রমণের পর মানবদেব (বা কোন পুত্র) রাজ্য

পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। আসলে এই পর্বের ইতিহাস যথেষ্ট তথ্যের অভাবে পুনর্নির্মাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। শরদিন্দু যা করেছেন তাতে ইতিহাসের ধারাকে সহজ পথে চালিত করা হয়েছে। মানব ভাস্করবর্মার হাতে নিহত হয়নি অন্ধ হয়ে নদীতে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত কুল পেয়েছেন। আর সেটা তার যুদ্ধে পরাজয়ের পাঁচ দিনের ভিতরের ঘটনা। তারপর বজ্রের জন্ম থেকে কুড়ি বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অন্ধ মানব পথে পথে বেতসগ্রাম খুঁজে ফিরেছেন। আর সেই হিশেবে মানবের পুত্র বজ্র ৬৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে একদিনের জন্য রাজা হয়েছেন। ইতিহাসে যেটা জয়নাগের রাজত্বকাল। অবশ্য জয়নাগ কতদিন রাজত্ব করেছেন তা জানা যায় না। সে যাইহোক গল্পের দিক থেকে শরদিন্দু ইতিহাসের ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ কালের জয়নাগকে আরো দশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। তাতে ইতিহাসের তথ্যভঙ্গ হতে পারে কিন্তু মাৎস্যন্যায় পর্বের ইতিহাসের সত্যভঙ্গ হয়নি। বজ্র কল্পনার সৃষ্টি—তাকে দিয়ে রাজ্য প্রশাসনের বদল পুনর্বদলের ছবিটা দেখানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু তথ্যগত ইতিহাসের ক্রমভঙ্গ দোষের কথা বাদ দিলে লেখক এ উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক জীবনের কথা যথাসম্ভব গড়ে তুলেছেন। সেটা ইতিহাসের আলোয় অতীতের পুনর্নির্মাণ।

বজ্র এ কাহিনির নায়ক। এ উপন্যাসের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ বেতসগ্রামের পটভূমিতে ঘটা ঘটনার বিবরণ। বজ্রের জন্ম, তার বড় হওয়া, বজ্র গুপ্তা সম্পর্ক, গ্রামের কথা—এসব নিয়ে এই কটি পরিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে বজ্র উনিশ পেরিয়ে কুড়ি বছরে পড়েছে। আর তার জন্ম কথা জেনে সে কর্ণসুবর্ণের উদ্দেশে পিতার সন্ধানে যাত্রা করেছে। প্রথম আট পরিচ্ছেদ বজ্রের গ্রাম জীবন। লেখক সামাজিক ইতিহাসের দিকে আর একটু মনোযোগ দিয়ে সপ্তম শতাব্দীর গ্রাম জীবনের সম্ভাব্য একটি ছবি আরও বিশদ করে আঁকতে পারতেন। অবশ্য গ্রামের দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ছবি তিনি দিয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদে বজ্র গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরোয়। বজ্রের যাত্রাপথের বর্ণনার সূত্রে তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বজ্রের জীবনের প্রথম পর্ব গ্রাম জীবন, দ্বিতীয় পর্ব অরণ্য পরিবেশ, তৃতীয় পর্ব নগর জীবন। প্রথম পর্বের কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি অংশ বজ্রের অভিজ্ঞতার সূত্রে উঠে এসেছে। কাহিনিতে পাই অরণ্য জীবনের কথা। গল্পের প্রয়োজনে লেখক বজ্রের ভ্রমণ পথের প্রথম অভিজ্ঞতা হিশেবে দেখান এক বৃদ্ধ অন্ধের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা। এটুকু গল্পের পরবর্তী অংশের সঙ্গে যোগহীন, কিন্তু বজ্রের পিতার কথা সূত্রে প্রয়োজনীয়। বনপথে শবর জীবনের সরল এবং আন্তরিক রূপের সঙ্গে বজ্রের পরিচয় হয়েছে। এর দুটি প্রয়োজন ছিল। প্রথমত হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা অনুসারে সপ্তম শতকে বাংলায় আর্য

প্রভাবের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু যারা বাংলার আদি অধিবাসী তাদের জীবন কেমন ছিল তা দেখান দরকার। এরা প্রধানত অরণ্যে, পর্বতগুহায়, বা কোন দুর্গম স্থানে বসবাস করতো। তাদের জীবনযাপনের ছবি ‘গৌড়মল্লারে’র একটি স্বর হিসেবে উঠে এসেছে। তাদের সহজ সরল জীবনরূপ, খাদ্য সংগ্রহ, নারী পুরুষের সহজ সম্পর্ক অকুণ্ঠ প্রণয়লীলা—অতিথি প্রীতি—এসবই ৭ম শতকের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির একটি অপরিরিত্যজ্য দিক। শবর জীবনের এই রূপটি চর্যাগীতির শবর জীবনের আদর্শে গঠিত। আর একটা কথা। শবর শবরীর এই আদিম সরলতা দেখে বজ্র মুগ্ধ হয়েছে। বজ্র গ্রামের মানুষ। সে জীবন ও অনাবশ্যিক জটিল নয়। কিন্তু তাও বজ্রের মনে হয়েছে— “কী মধুর ইহাদের জীবন! এই তিনটি আদিম নরনারীর মধ্যে কি নিবিড় ভালবাসা! ঈর্ষা নাই, স্বার্থপরতা নাই ক্ষুদ্রতা নাই, আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য।” বজ্রের এই অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল। কেননা কর্ণসুবর্ণের জীবন যাত্রার মধ্যে সে আর কয়েকদিনের মধ্যেই গিয়ে পড়বে।

পথের অভিজ্ঞতার সূত্রে এরপর এসেছে ‘জয়নাগ’ নামের সঙ্গে পরিচয়। বজ্র ‘জয়নাগ’ সম্বন্ধে জেনেছে শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধ বিহারে। কিন্তু লেখক তার অভিজ্ঞতার মধ্যে জয়নাগের দলের গোপনে রাজ্যে ঢুকে পড়া রাজ্যে ক্রমে ক্রমে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা—যড়যন্ত্র করে রাজ্য দখল—এসব এনে রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। রাজা অগ্নিমিত্র ভোগ জর্জর, প্রশাসনে তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই, রাণী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন, রাজপুরী হয়ে উঠেছে নরক—এসবই রাজ্যের দুর্বলতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। জয়নাগ এ কাহিনিতে শেষ পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণ দখল করবেন। কীভাবে তিনি তা করবেন তার ইঙ্গিত বজ্রের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখানো হয়েছে।

শীলভদ্র ও বৌদ্ধবিহারের কথা বজ্রের অভিজ্ঞতার তৃতীয় দিক। রাতের আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে কচ্ছু শবরের সঙ্গে তার দেখা হয়। এই রাতের আশ্রয়ের খোঁজ করতে গিয়েই সে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে পৌঁছায়। রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহার কোনো কল্পিত বিষয় নয়। ইতিহাসে সে মহাবিহারের কথা পাওয়া যায়। হিউয়েনের সাঙ এর বিবরণে পাওয়া যায় রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপান্তে এই বিহার অবস্থিত ছিল। অনেক বৌদ্ধ শ্রমণ এখানে থাকতেন এটিকে তিনি “magnificent and famous establishment” (R.C. Majumdar (ed), History of Bengal, Vol-I, p. 414) বলে উল্লেখ করেছেন। কর্ণসুবর্ণে দশটি বা তার কিছু বেশি বৌদ্ধ বিহার ছিল। (এ) খনন কার্যের ফলে কর্ণসুবর্ণের রাজবাড়ী ডাঙ্গায় একটি বৌদ্ধবিহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, (দ্বিতীয় পর্ব), সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৯৪৩) তবে বজ্রের সঙ্গে শীলভদ্রের দেখা হওয়া—লেখকের কল্পনা প্রসূত। শীলভদ্র অবশ্য এই যুগের মানুষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ

তাঁর কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কাজেই শীলভদ্রকে এই বিহারে দেখানো অনৈতিহাসিক নয়। শীলভদ্র বজ্রকে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পেরেছেন—তাকে কর্ণসুবর্ণে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বজ্রকে মানবদেবের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। কর্ণসুবর্ণের রাজা ভাস্করবর্মার মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং বর্তমান রাজা অগ্নিবর্মার কথা বলেছেন। যতদূর জানা যায় ভাস্করবর্মা অকৃতদার ছিলেন, সুতরাং তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা নিতান্তই কাল্পনিক চরিত্র। এই বৌদ্ধবিহার ও শীলভদ্রের প্রসঙ্গ লেখক এনেছেন সম্ভবত গল্পের একটি সূত্র তুলে দেবার জন্য। শীলভদ্র বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি শশাঙ্কের গুণগ্রাহী হবার কথা না। শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্রোহ সুপরিচিত। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণে বা ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে’ সে কথাই আছে। নীহাররঞ্জন রায় ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’-এ একে ‘নিছক অনৈতিহাসিক কল্পনা’ (১/৪৪৯) উড়িয়ে দিতে চান না। রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্কের দোষ স্থালনের পক্ষপাতী। শরদিন্দু শীলভদ্রের মুখে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্রোহকে ‘যুদ্ধের উত্তেজনা’ সঞ্জাত বলে ব্যাখ্যা করিয়েছেন। তিনি শশাঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে বুঝিয়ে বলার পর শশাঙ্ক আর কোনো বিদ্রোহ দেখান নি। শশাঙ্কের দোষস্থালন শুধু নয় শীলভদ্রের মাধ্যমে বজ্রকে কর্ণসুবর্ণের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে। শীলভদ্র বজ্রকে সোনার অঙ্গদ ঢেকে রাখবার উপদেশ দিয়েছেন। আর একটি তথ্য এখানে জানানো হয়েছে। এদেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুইই বিনষ্ট হয়েছে। দেশ দস্যু তাকরে পূর্ণ। অরাজক দেশে সাধু ও তস্কর হয় এ সব সামাজিক পরিস্থিতির কথা পাঠককে জানানো দরকার। অন্য কোনো চরিত্রের দ্বারা এ কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই শীলভদ্রের মুখে রাষ্ট্রের পরিস্থিতি জানাতে হল। আর এই রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি সবটাই তথ্যগত। এ গুলি বাংলাদেশের ইতিহাসের তথ্য সম্মত পরিচয়। এই পরিচয় যেমন সামাজিক পরিস্থিতি অবহিত করার জন্য প্রয়োজন তেমনি কাহিনির জন্য একটি সূত্র এখানে দেওয়া হয়েছে—যা পরে কাজে লাগবে। শীলভদ্র বজ্রকে বলেছেন কোদণ্ড মিশ্রের কথা। তিনি একসময় শশাঙ্কদেবের সচিব ছিলেন। এই পরিচয়ই কাহিনিতে একটা Jerk আনবে। কাহিনিকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। বজ্রের জন্ম বর্ণনা করে যে কাহিনির শুরু সেই বজ্রের জীবনকে লেখক একটা আকস্মিকতায় গড়ে তুলেছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কাহিনি নগরে গিয়ে পৌঁছল। নায়ক বজ্র গ্রাম অরণ্য ও বৌদ্ধবিহারের জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করে নগরে এসে দাঁড়াল। বজ্রের এই যাত্রাকে আধুনিক নায়কের আত্মসন্ধান যাত্রা হিসেবে দেখতে ইচ্ছা হয়। নানা কারণে তা করা যাবে না। তবু সতীনাথ ভাদুড়ীর টোঁড়াই যেমন গ্রাম ছেড়ে বিসকাঙ্ক হয়ে গান্ধীবাদী হয় এবং শেষে আজাদ দস্তায় গিয়ে পৌঁছায় এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়, এখানে বজ্রও সেই ভাবে একটার পর একটা জীবন পর্ব

অতিক্রম করে চলেছে। শীলভদ্র তাকে নগরে যেতে নিষেধ করেছিলেন—কিন্তু বজ্র সে নিষেধ শোনেনি। শীলভদ্র তাকে কর্ণসুবর্ণে আসন্ন যুদ্ধের পরিস্থিতির কথাও বলেছেন বজ্র তাও শোনেনি। নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তবে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে চরিত্রের অন্তর্মূল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে তার জীবনের ভাবনা, অনুভূতি ও চেতনাকে বদলে দেয় সেরকম চরিত্র বজ্রের নয়। বজ্রের প্রাথমিক ভাবনা-চিন্তা ও অনুভূতির পরিবর্তন হয়নি। তার চরিত্র অনেকটা টাইপধর্মী।

কর্ণসুবর্ণে বজ্র যে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্য দিয়ে গেছে সেগুলি হল : ১. নগরজীবন, ২. বাণিজ্য ব্যবস্থা, ৩. রাজাস্তম্ভপূরের পরিবেশ এবং ৪. একদিনের রাজা হবার অভিজ্ঞতা। নগরজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এগুলি পরপর জড়িত হয়ে এসেছে। কর্ণসুবর্ণের সৌন্দর্য মুগ্ধ বজ্র এই নগরের সঙ্গে যেন নাড়ীর টান অনুভব করেছে। কিন্তু একটা বিপরীতমুখী মনোভাব তাকে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক করে দিয়েছে। এজন্য নগরের টানে বজ্র ভেসে যায়নি। কর্ণসুবর্ণে বজ্রের প্রথম পরিচয় কবি বিশ্বাধরের সঙ্গে। বিশ্বাধর লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয় বিলাসী, তরল স্বভাবের মানুষ। দুঃখের বিষয় কর্ণসুবর্ণে কোন যথার্থ ভদ্র নাগরিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। লেখক তাকে নগরের অন্ধকার দিকটির দিকেই নিয়ে গেছেন কাজেই তার অভিজ্ঞতায় নগরের সামগ্রিক পরিচয় ধরা পড়ে নি। কবি বিশ্বাধর সেকালের নাগরিক বাঙালীর একটি টাইপ। নীহারঞ্জন রায় ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’-এ সেকালের বাঙ্গালির যে রূপ রচনা করেছেন—শরদিন্দু তাকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। বিশ্বাধর নিজের নাম বলেছে—‘কবি বিশ্বাধর’। অর্থাৎ তার প্রধান পরিচয় সে কবি। প্রাচীন গ্রন্থে বাঙ্গালীর ‘কবি’ পরিচয় কোথাও আছে কিনা বলা যায় না। তবে একালের বাঙ্গালীর ‘কবি’ পরিচয় বহু বিখ্যাত। সেই সূত্রে বাঙ্গালীর প্রাচীন চরিত্র পরিচয়ে ‘কবি’ হবার বাসনা থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বাধর আদিরসের চটুল কবিতা লিখে বড় লোকের বৈঠকখানায় শোনাত। বিশ্বাধর “তালপত্রের ন্যায় কৃশ” কিন্তু তার সাজসজ্জা বেশ পরিপাটি। ধূতি উত্তরীয় তার পরিধান, মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। কবি ক্ষেমেন্দ্র গৌড়ের ছাত্রদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন “এই সব ছাত্রের দেহ এত ক্ষীণ যে, হস্ত স্পর্শেই ইহাদের দেহ ভাঙিয়া পড়িবে” (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১২৬) বিশ্বাধর ক্ষেমেন্দ্রের আদর্শে গড়া। বাৎস্যায়ন গৌড় পুরুষদের সম্বন্ধে খবর দিয়েছেন— তারা আঙুলে বড় বড় নখ রাখতেন এবং নখে রঙ লাগাতেন (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৩৭১)। শরদিন্দু বিশ্বাধরের নখ রাখার কথা বলেছেন। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের কথাও বাৎস্যায়নের লেখায় আছে। ইতিহাসের তথ্য দিয়ে কর্ণসুবর্ণের নাগরিক মানুষের রূপ গড়া হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসে তথ্য ঠিক রেখে শরদিন্দু বিশ্বাধরের মত মানুষ গড়েছেন। বিশ্বাধর বজ্রকে নিয়ে দুদণ্ড মস্করা করতে চেয়েছিল। তার প্রচুর আহাৰ বিশ্বাধরের কৌতূহল জাগায়। অল্প কয়েকটি

কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতু মুদ্রা দিয়ে বজ্র ময়রার দোকানের খাবার প্রায় শেষ করে এনেছে। লেখক বলেছেন “সেকালে বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না”; দেশে সোনারূপার অভাব হয়েছিল অন্নবস্ত্রের অভাব হয়নি। এই কথাটি বোঝানোর জন্য বজ্রকে অল্প মূল্যে অনেক খাবার দিতে হয়েছে।

দেশে সোনারূপার অভাব হয়েছিল—সেকথা শীলভদ্র ও বলেছিলেন। ৭ম শতকে দেশে বহির্বাণিজ্যে সংকট দেখা দিয়েছিল। রাজ্যে প্রশাসনিক স্থিরতা ছিল না বলে অন্তর্বাণিজ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। বহির্বাণিজ্যের অভাবে দেশে সোনা রূপা আসছিল না। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন শশাঙ্কের আমলেই বাঙলার রাষ্ট্রীয় অবস্থায় গুরুতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। ... অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুইই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ১৯১) সোনা অত্যন্ত দুর্মূল্যও হয়েছিল। আর নগরের সাধারণ লোকও যে দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে কবি বিশ্বাধরের মত লঘুচিত্ত রঙ্গপ্রিয় লোকেরও—বজ্রের অঙ্গদ অপহরণ করবার উদ্দেশ্যের মধ্যে। বজ্র অর্থের প্রয়োজনে বিশ্বাধরের সঙ্গে স্বর্ণকারের কাছে যায়। তাতেও এই সোনার দুর্মূল্যতার কথা ওঠে।

নগরে বজ্রের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা রাণী শিখরিণী দর্শন। লেখক বলেছেন “নারী নয়, ললৎ-শিখা লালসার বহি” তার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করার দরকার নেই শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ‘তার মুখে এমন কিছু আছে যা পুরুষের স্নায়ুশোণিতে আগুন লাগিয়ে দেয়’। এই লালসাবহি রাণী শিখরিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ গল্পের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বর্ণ বিক্রয় করে বজ্র কর্ণসুবর্ণে এক জনবিরল প্রান্তে শৌণ্ডিক বটেশ্বরের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার পক্ষে কাহিনিতে কোন মোচড় আনা সম্ভব ছিল না। দু’জন মানুষ বজ্রকে নিয়ে কাহিনিতে মোড় ফিরিয়েছে। একজন কবি বিশ্বাধর অন্যজন রাণী শিখরিণী। বিশ্বাধর তার অঙ্গদ চুরি করতে চায়, শিখরিণী তার বজ্র কঠিন দেহ সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হয়ে কামনা চরিতার্থ করতে চায়। কাহিনি বজ্রকে নিয়ে এই দুই চরিত্রের দ্বিমুখী ক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে। এখন বজ্র যেন নেহাতই নিষ্ক্রিয় চরিত্র—অন্য চরিত্রগুলির ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া তার অন্য ভূমিকা নেই।

রাণী শিখরিণীর দাসী কুছ রূপসী ‘চটুলা ছলনাময়ী রতি রস চতুরা।’ কুছ রাণী শিখরিণীর আসঙ্গ লিপ্সা মেটানোর জন্য নাগর সংগ্রহের দূতী। রাণী বজ্রের দিকে তপ্ত তীব্র চক্ষু দুটি দিয়ে বজ্রকে বিদ্ধ করেছেন, কুছকে ইশারা করে বজ্রের খোঁজ নিতে বলেছেন। রাজ অন্তপুরে রাণীর কামনার নিত্য বহুৎসব। তাতে নূতন নূতন ইক্ষন চাই; সংগ্রহের দায়িত্ব কুছ বা কুছর মতো একাধিক দাসী সহচরীর। কুছ রাণীর ইঙ্গিতে বজ্রের সন্ধানে যায় কিন্তু নিজেও বজ্রের প্রতি আকৃষ্ট

হয়ে পড়ে। “বজ্রকে দেখিয়া রাণীর লিপ্সা যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কুহুও তেমনি মজিয়া ছিল।” কুহু নানাভাবে বজ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। মৌরীর ঘাটে বজ্রের দিকে ক্ষিপ্ৰ- গোপন কটাক্ষপাত করে তার চোখের সামনেই নিরংশুকা হয়ে স্নান করতে নেমেছে। চোখের সংকেতে, মঞ্জীরের ছন্দে কিংবা ইঙ্গিতে তার আহ্বান জানিয়েছে কিন্তু বজ্র সে আহ্বান বোঝেনি বা উপেক্ষা করেছে। কুহু বাধ্য হয়ে রাত্রির মত গাঢ় নীল বসনে দেহ ঢেকে অভিসার করেছে। বজ্রকে সে বলেছে “আমি কী চাই তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি?” চক্ষু দিয়ে সর্বাঙ্গ লেহন করে স্পষ্ট ভাষায় নিজের আকৃতি জানিয়েছে “আপনি আমার মধুনাগর। আমার লজ্জা নেই। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।” বজ্র তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কুহু তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিতে বলেছে। বজ্র তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে কুহু রাজ অবরোধের বাসিন্দা রাজপুরীর দাসী। কিন্তু বজ্র তখনো বোঝেনি শুধু কুহু নয় রাণীও তার ক্ষুধা চরিতার্থ করবার জন্য বজ্রকে চায়। লেখক রাণী ও কুহু দুই নারীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন রাণীর প্রকৃতি বাঘিনীর ন্যায় নিষ্ঠুর ও আত্মসর্বস্ব; কুহু সপিনীর ন্যায় ত্রুর এবং কুশলী। সে শিকারকে সম্মোহিত করে আলিঙ্গনের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে বিস্ময়ের কথা এই যে বজ্র চরিত্রে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। সে এমনই সত্যকাম যে নিজেকে গুঞ্জার প্রতি বাগদত্ত ভেবে সব আবিলতা থেকে মুক্ত রাখে। রাণীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্যই কুহু আবার বজ্রের খোঁজে যায় কিন্তু তার আগেই বজ্র হরণ হয়। বিশ্বাধর ও বটেশ্বর—যারা এ গল্পে কর্ণসুবর্ণের নাগরিক সমাজের লোক—তাদের প্রকৃতিও এতে ধরা পড়ে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে নগরজীবনের তার একটি দিক পরিস্ফুট হয়েছে। চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষে একটি সংবাদ আছে। বজ্র বিকেল বেলাটা অধিকাংশদিন হাতী ঘাটে গিয়ে বসত। সেখানে নানা লোকের কথা বজ্রের কানে আসত। বেশিরভাগ জল্পনা হত ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে। গৌড়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য রসাতলে যাচ্ছে কেউ আর পণ্য নিয়ে সমুদ্রে যেতে সাহস করে না। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শীলভদ্রও বলেছিলেন অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুই নষ্ট হয়ে গেছে। এতে দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের এই ক্ষীয়মাণ চরিত্রটি ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এই সংবাদটি কারণ সমেত চিত্রিত হয়েছে। কর্ণসুবর্ণের বরণ দত্ত ওরফে চারুদত্তের কথায় এই ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বরণ দত্ত বলেছেন পুরুষানুক্রমে তাঁরা সমুদ্র বাণিজ্য করে এসেছেন। নানা দেশে তাঁদের বাণিজ্য তরণী পণ্য নিয়ে যাত্রা করেছে। কিন্তু বর্তমানে আরব দেশের দস্যুরা সমুদ্র পথ বিপদ সংকুল করে তুলেছে। তাদের দৌরাণ্যে গৌড়বঙ্গের বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। আসলে ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য কম; লেখক সামাজিক ইতিহাসের দিকে তাই বেশি নজর দিতে

পেরেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যার কথা নীহাররঞ্জন রায়ও লিখেছেন। এই যুগে “অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুইই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।” (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১৯১) কিন্তু তিনি এর কোনো কারণ নির্দেশ করেননি। বরং জিজ্ঞাসা আকারে তাকে উপস্থিত করেছেন। “যে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর, প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি হইয়াছিল কি?” (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১৯১) নীহাররঞ্জন কারণ নির্দেশ করেননি শরদিন্দু করেছেন। তিনি স্পষ্টতই আরবদেশের সমুদ্র-দস্যুদের দৌরাত্মের কথা লিখেছেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর খলিমা উমরের আমলে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ের নিকট থানেতে এবং ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুনদের মোহনাতে অবস্থিত দেবল বন্দরে মুসলিম অভিযান হয়। আরবদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের চেষ্টা জাগে। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যেও তারা সামগ্রিক অধিকার বিস্তার করে। এর ফল “মূল ইউরোপ ভূখণ্ডেও মুসলিমরা হানা দিল এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সমস্ত সম্পর্ক ছেদনের প্রক্রিয়াকে তারা সম্পূর্ণ করল”<sup>২৯</sup> যদিও তিনি লিখেছেন আরবীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের পরেও অনেকদিন স্বাভাবিকভাবে চলেছিল। কিন্তু আরবদের উত্থান যে সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় বাণিজ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তা মনে করা যায়। কাজেই শরদিন্দুর এই বিশ্লেষণ অস্বীকার করার মতো নয়। লেখক এই সামাজিক ইতিহাসের ঘটনাকে মূল কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। বরুণ দত্ত ওরফে চারুদত্তের পুরুষানুক্রমিক বাণিজ্য এভাবে বিনষ্টির দিকে চলে যায়। বরুণ দত্তকে এখানে বণিক সমাজের মুখপাত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ শুধু তার একার সমস্যা নয় সমস্ত বণিক শ্রেণির সমস্যা। সমুদ্র বাণিজ্যে যাবার জন্য বণিকেরা তাদের তরণীগুলিকে একসঙ্গে সমুদ্রে পাঠানোর চেষ্টা করে। জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নৌকাগুলিতে সৈন্য পাঠায়। কিন্তু বাঙালি সৈন্য সমুদ্র যুদ্ধে অভ্যস্ত নয়, তারা এ কাজ করতে চায় না। এই সৈন্য সংগ্রহের প্রয়োজনের সঙ্গে বটেশ্বর বিশ্বাধরের অঙ্গদ চুরির ইচ্ছাকে মিলিয়ে বজ্রকে কৌশলে ভুরিবসুর বাণিজ্য-তরীতে তোলা হয়েছে। সেখান থেকে বজ্র নিজের শক্তিতে নাবিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়েছে। ভাগীরথীতে সাঁতার দিয়ে সে যে ঘাটে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে তার পরবর্তী ভূমিকার আরম্ভ। সেখানে ইতিহাসের ভূমিকা সামান্য কল্পনার ভূমিকা অনন্য।

‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে’ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। কোনো রাজা এক সপ্তাহ কেউ একমাস কেউ বা আরো কম দিনের জন্য রাজত্ব করেছেন। এই অনিশ্চয়তার পিছনে ছিল পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ। কিন্তু সেখানে এই রাজাদের নাম বা শাসনকালের কথা নেই। এই মাৎস্যন্যায় পর্বের অস্থির ইতিহাসের অন্ধকার

অতীতে কল্পনাকে প্রেরণ করে সম্ভাব্য ইতিহাসের গল্প গড়ে তুলেছেন। বজ্র কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, তার জন্মের মূলে কালিদাসের দুঃখান্ত শকুন্তলার মিলন কথার রেশ আছে বলে মনে হয়। তার রাজ্য লাভের পিছনে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসের ছায়া আছে। কোদণ্ড মিশ্র অপসারিত হবার পর থেকেই ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন। কোকবর্মা প্রথম ষড়যন্ত্রের অংশীদার নয় অনেক ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টার একটি চরিত্র মাত্র। বজ্রকে পাওয়ায় এই ষড়যন্ত্র একটা সাফল্যের মুখ দেখেছে। কোদণ্ড মিশ্র নিজেকে বলেছেন ‘কৌটিল্যের শিষ্য’। কাজেই চাণক্যের কথা স্পষ্টত লেখকের ভাবনায় ছিল। কিন্তু যা ছিল না তা হল চন্দ্রগুপ্তের মত বজ্রের প্রস্তুতি বা শিক্ষা। কোকবর্মা বজ্রের প্রতি “সামর্থ্য ঈর্ষা বন্ধিম দৃষ্টি নিক্ষেপ” করে গেছে। বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের অন্তর হিশেবে কেবল ব্যবহৃত হবার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। তার এতে কোনো মতামত নেই। ষড়যন্ত্র ও রাজপুরী দখল করবার চেষ্টা বাইরের দিক থেকে যখন চলছে, তখন লেখক রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-জর্জর প্রকৃতি শিথিল-সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা দু-তিনটি পরিচ্ছেদে বলে দিয়েছেন। রাণী শিখরিণীর ভোগে কোনো ক্লাস্তি নেই। দুর্বল অগ্নিবর্মার দুর্মদ ভোগলালসার তৃপ্তি নেই। রাজপুরী অন্তঃসারহীন।

উপন্যাসে জয়নাগের কথা বজ্র তার কর্ণসুবর্ণ যাত্রা পথেই শুনে এসেছে। জয়নাগ অবশ্য ঐতিহাসিক পুরুষ। জয়নাগকে ইতিহাসে মহা রাজাধিরাজ বলা হয়েছে। কর্ণসুবর্ণের জয় স্কন্ধাবার থেকে তিনি কিছু ভূমিদান করেছিলেন। বীরভূম মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তাঁর নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া গেছে (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১/৪৪৩) পিতৃ রাজ্য পুনরধিকারের একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবেন ... কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ত্ত হয়।” (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৪৩-৪৪) ইতিহাসের এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে শরদিন্দু জয়নাগের কর্ণসুবর্ণ দখলেই কার্যত উপন্যাসের পরিণতি ঘটিয়েছেন।

কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কোকবর্মা বজ্রকে রাজ্য দখলে সাহায্য করেছেন। বজ্র একদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণের রাজসিংহাসনে বসেছে। অর্জুন সেন অগ্নিবর্মার দেহ প্রদীপে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছেন কোকবর্মা রাণী শিখরিণীকে নিয়ে রাজপুরী ছেড়ে গেছে। মাত্র দুশো পণ্য যোদ্ধা পুরদ্বার রক্ষা করছে। বজ্র এই সৈন্যদের নিয়ে রাজপুরী রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু জয়নাগের বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ নিষ্ফল। তাছাড়া কোদণ্ড মিশ্রের এই রাজা রাজা খেলা বজ্রের পছন্দ নয়, তার গ্রামের জীবনেই ফিরে যাবার ইচ্ছা। বজ্র প্রাসাদ শিখর থেকে কোকবর্মাকে শরাঘাতে হত্যা করেছে কিন্তু রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি। জয়নাগের সৈন্য দল প্রাসাদে প্রবেশ করেছে বজ্র কুঙ্কে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে গেছে। এরপর কাহিনীর উপসংহার মাত্র বাকি। বজ্র গ্রামে ফিরে গেছে। কিন্তু গ্রামগুলি সৈন্যদের আক্রমণে বিধ্বস্ত। লোকজন পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বজ্রের পরিবার

পলাশবনে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পেয়েছে। মানবদেবের সঙ্গে বজ্রের মিলন হয়েছে।

গৌড়ের মাৎস্যন্যায় পর্বের কাহিনি এই উপন্যাসের বিষয়। মাৎস্যন্যায় পর্বের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় লেখক তারই উপর রক্তমাংসের আবরণ দিয়ে কাহিনি গড়ে তুলেছেন। ইতিহাসের তথ্যগত বিচ্যুতি ঘটাননি, গুণগত রূপকে পরিষ্ফুট করেছেন। আগেই বলা হয়েছে সামাজিক ইতিহাসের প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে কাহিনির আকার দিয়েছেন।

বজ্র এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার জীবনকে অবলম্বন করেই এ কাহিনি গড়া হয়েছে। তার জীবনভিজ্ঞতাই এ উপন্যাসের বিষয়। কিন্তু কাহিনিকে সে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেনি। তার জন্ম থেকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত সবটাই আকস্মিকভাবে তার জীবনে এসে পড়েছে। মানবদেব এবং রঙ্গনার বিবাহ আকস্মিক, তার কর্ণসুবর্ণের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া আকস্মিক—রাজা হওয়াও আকস্মিক। ভালো উপন্যাসে জীবনের উপস্থাপনা যে ভাবে হয়—তা এখানে হয়নি। সবটাই ‘হলেও হতে পারত’—ধরণের বিন্যাস। যেভাবে বিশ্বাধর বটেশ্বরের ছলনায় বজ্র ভুরিবসুর জাহাজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা আকস্মিক নয়—কিন্তু নাবিকদের সমবেত আক্রমণের মুখে বজ্র যেভাবে সবাইকে ধরাশায়ী করে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়েছে—তা একালের জনপ্রিয় সিনেমার নায়কের মতো। আবার ভাগীরথীর স্রোতের টান কাটিয়ে কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে পৌঁছানো সেই আকস্মিকতার চূড়ান্ত। কাহিনিতে বজ্র চরিত্রটি নিতান্তই টাইপ শ্রেণির। শবরের আতিথ্য তাকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু নগরের কোনো প্রভাব তার উপরে পড়েনি। রাণী শিখরিণীর রূপ দেখে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কুহুর কামনা তাকে স্পর্শ করেনি, তবে তার মধ্যে সে একটি মমতাময়ী রূপ লক্ষ করেছে। এ উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রগুলিও একমুখী ও টাইপধর্মী। শিখরিণীর ভোগ মুখিনতা, বিশ্বাধরের কৌতুক প্রবণতা থেকে অঙ্গদচুরির ফন্দি, বটেশ্বরের শৌণ্ডিক প্রকৃতি, কোদণ্ড মিশ্রের কুড়ি বছর ধরে প্রতিশোধ নেবার বাসনা, কোকবর্মার শিখরিণীকে পাওয়ার লোভ—সেই একমুখী চরিত্র প্রবণতাকেই প্রকট করে। স্বল্প পরিসরে বরং চাতক ঠাকুরের চরিত্রটি ভালো হয়েছে। গ্রামের অন্য মানুষগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট এবং গ্রামের বর্ণনার মধ্যেও কোনো বিশেষত্ব নেই। উপন্যাসের কাহিনিও মৌরীনদীর স্রোতের মতো একমুখী গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। মৌরী যেমন ভাগীরথীতে পড়েছে কাহিনিও তেমনি বেতসগ্রামে শুরু হয়ে কর্ণসুবর্ণে গিয়ে পৌঁছেছে। গ্রাম অরণ্য নগর এই তিন পর্যায়ে কাহিনিতে বজ্রের অভিজ্ঞতা দেখানো হয়েছে। তার বিন্যাসে কোনো অভিনবত্ব নেই। লেখক উপন্যাসের নাম রেখেছেন ‘গৌড়মল্লার’। ‘মল্লার’ বর্ষার ভাবযুক্ত রাত্রিকালীন রাগিনী। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতাব্দী ব্যাপী যে অন্ধকার বাংলায় সমাজ রাজনীতি ও

জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে—‘মল্লার’ রাগিনী তারই দ্যোতনা করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মানদেব গৌড়ের ভাগ্য নির্ধারণে কৃতি দেখাতে পারেননি। ভাস্করবর্মা ও দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেননি। ভাস্করবর্মার পর জয়নাগ কতদিন রাজত্ব করেছিলেন জানা যায় না। কিন্তু লুটেরা সৈন্যদের রাজনৈতিক কারণেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেননি। ফলে সাধারণ বাঙালির জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। হর্ষবর্ধন মারা গেছেন, ভাস্করবর্মা মারা গেছেন। তাঁদের হাতে শশাঙ্কের রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল। ভাস্করবর্মার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। হর্ষবর্ধনের রাজ্যও তাঁর মন্ত্রী দখল করেছেন (R.C. Majumdar, usurpation of his kingdom by his minister, p. 80)। এর মধ্যে তিব্বতের রাজা শ্রোং-সান-গাম্পো, চীনের ওয়াং হিউসেন-সে পূর্বভারত আক্রমণ করেন এবং রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রকৃত পক্ষে বাংলার ভাগ্যে শান্তি শৃঙ্খলা এবং স্থায়ী রাজবংশের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি। সেদিক থেকে ‘গৌড়মল্লার’ নামটির সার্থকতা আছে।

‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাস হুগ আক্রমণের পটভূমি, ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে শশাঙ্কের পর গৌড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গৌড়শক্তির বিনাশ দেখানো হয়েছে। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসেও আসন্ন বিদেশি তুর্কী আক্রমণের ছায়া লক্ষ করা যায়। লেখক এই উপন্যাসের শুরুতেই এই অন্ধকারের কথা তুলেছেন :

“৮৯৯ শকাব্দে সাবক্তগীণ আসিয়া লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। ৯২০ শকাব্দে আসিলেন মামুদ গজনী। ৯৪৬ হইতে ৯৪৮ শকাব্দে মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইল। ১১১৫ শকাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিলেন। মহারাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।”<sup>৩০</sup>

ভারত ইতিহাসের এই পটভূমিকায় লেখক ভারতের রাজন্যবর্গের অন্তর্কলহ, অনৈক্য এবং আত্মভ্রমিতার কাহিনি রচনা করে দেখাতে চেয়েছেন—বিদেশি শক্তির কাছে ভারতবর্ষের পরাধীন হবার প্রকৃত কারণ কী ছিল। তখন সারা ভারতে স্কন্দগুপ্তের মতো কোন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন না যিনি এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন। উত্তর ভারতের রাজারা ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। পূর্ব এবং মধ্য ভারতের রাজন্যবর্গের বিরোধ এবং অনৈক্যের একটি ইতিহাস সম্মত পটভূমিকা রচনা করে তিনি তুর্কী আক্রমণের কাছে পদানত বঙ্গদেশের আগতপ্রায় অন্ধকার যুগের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

এ কাহিনি লেখা হয়েছে নয়পাল ও চেদিরাজ কর্ণের বিরোধকে অবলম্বন করে। গৌড়ের পাল সম্রাটদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ ও কলচুরি রাজাগণের দীর্ঘ কালের শত্রুতা চলে আসছিল। মহীপালকে এই পরাক্রমশালী রাজাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে রাজ্য রক্ষা করতে

হয়েছিল। মহীপালের পুত্র নয়পাল ১০৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে তাঁকে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। শরদিন্দু তাঁর কাহিনীতে এই বিরোধকেই অবলম্বন করেছেন। এই বিরোধ এবং বিরোধ শেষে মিত্রতা এই উপন্যাসের কাহিনী। উপন্যাসের শুরু হয়েছে ‘শকাব্দের দশম শতকে’ ভারতের ভাগ্যাকাশে সূর্যাস্তের কথা দিয়ে। শকাব্দের দশম শতক সবজ্ঞগীণ লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তখন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে রাজত্ব করতেন জয়পাল। তিনি রহিরাগত তুর্কী মুসলমান শক্তিকে বাধা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু বারবার পরাজিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে তখন একাধিক আঞ্চলিক রাজশক্তি রাজত্ব করছিল। তাদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করছেন। প্রতিহার রাজারা ছিলেন মুসলমানদের শত্রু কিন্তু রাষ্ট্রকূটেরা ছিলেন মুসলমানদের সহযোগী। জয়পালের পুত্র অনঙ্গপাল বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। পৃথ্বীরাজ চৌহান তরাই এর যুদ্ধে পরাজিত হলে কনৌজের জয়চন্দ্র আনন্দোৎসব করেছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধই ছিল এই রাজাদের রাজকার্য—সেই জন্যই রাজ্যের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হত। প্রজা সাধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন তা ঐতিহাসিকের কথা “On account of their mutual Jealousies, rivalries and conflicts the nobles brought ruin to their country.”<sup>১১</sup> পশ্চিম ভারতে যখন তুর্কী মুসলমানরা অধিকার বিস্তার তখন পূর্ব ভারতের বা মধ্য, দক্ষিণ-অন্যান্য প্রান্তের রাজারা কেউ সে বিষয়ে সতর্ক হতে পারেননি। উপন্যাসে দেখি এই অগণিত নিশ্চিত্ত রাজন্যবর্গের অনৈক্য এবং বহিরাগত শক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতার অভাব পীড়িত করেছে অতীশ দীপঙ্করকে। তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্ভিগ্ন হয়েছেন। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি দীপঙ্করের উদ্ভিগ্নতা, বিজাতীয় বিদেশী শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করার উপায় চিন্তা, রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার মত অস্ত্র সন্ধান করবার চেষ্টার কথা দিয়ে গড়ে।

দীপঙ্কর সম্পর্কে শরদিন্দু ইতিহাসের তথ্যের প্রায় কোনো পরিবর্তন ঘটাননি। ৯৮০/৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিক্রমণিপুর মণ্ডলে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা বিহারে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি সুবর্ণ দ্বীপে (জাভা) বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির কাছে বারো বছর শাস্ত্র চর্চা করেন। তারপর সিংহল হয়ে মগধে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ৪৩/৪৪ বছর। সেটা ১০২৩/২৫ খ্রিস্টাব্দ। মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দীপঙ্কর<sup>১২</sup> -কে বিক্রমশীল মহাবিহারের মহাচার্য নিযুক্ত করেন। তাঁর ৪৩ বছরে তিনি মগধে

ফেরেন। ৯৮২ খ্রিস্টাব্দকে তাঁর জন্ম ধরলে (রমেশচন্দ্র মজুমদার ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মের সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব হয়) তিনি ১০২৩-১০২৫ খ্রি. মহীপাল কর্তৃক মহাবিহারে মহাচার্য হন। ১৫ বছর তিনি বিক্রমশীল বিহারে কাটিয়েছেন। অনুমিত হয় তিনি ১০৩৮ খ্রি. ৫৮ বছর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেন। সেদিক থেকে দেখলে তিনি মহীপালের রাজ্যকাল মাত্র এদেশে কাটান। ১০৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মহীপালের পুত্র নয়পাল রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার তিব্বতি সূত্র ধরে বলেন তিনি ১৫ বছর এই বিহারে ছিলেন। অলকা চট্টোপাধ্যায় তিব্বতি সূত্র ব্যবহার করে ইংরেজিতে ভারত তিব্বত প্রসঙ্গ নিয়ে একটি বই লিখেছেন। এই বই এর সারাংশ সংকলন করে বাংলায় অতীত দীপঙ্কর সম্বন্ধে একটি বই লেখেন। সেই বইতেও তিব্বতি সূত্র অনুসরণ করে বলা হয়েছে তিনি ১৫ বছর মগধে কাটান। এক্ষেত্রে তিনি ৯৮২ খ্রিস্টাব্দকে দীপঙ্করের জন্ম সাল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাহলে দাঁড়ায় তিনি ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান। উপন্যাসে পাই কাহিনি আরম্ভের সময় দীপঙ্করের বয়স ৬০ বছর, তিনি ১৮ বছর বিক্রমশীল বিহারে মহাচার্য পদে অধিষ্ঠিত। শরদিন্দু নিশ্চয় অন্য কোনো ইতিহাসের সূত্র ব্যবহার করে থাকবেন। তবে একটা কথা বলা দরকার। রমেশচন্দ্র মজুমদার তিব্বতি ঐতিহ্য অনুসরণ করে বলেন দীপঙ্কর ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ৭৩ বছর পরমায়ুর কথা অনেকেই স্বীকার করেন। ৯৮০ সালকে জন্ম সন ধরলে তিনি ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। কিন্তু ইতিহাসের বইগুলিতে যেভাবে তার জীবৎকালের ঘটনাগুলিকে সাজানো হয়েছে তাতে মোট ৭১ বছরের খবর পাওয়া যায়। যথা—

জন্ম : ৯৮০/৯৮২

- ১৯ বছর বয়সে ওদন্ত পুরীর আচার্য শীল রক্ষিতের কাছে দীক্ষা
- ১২ বছর তীর্থঙ্কর থাকার পর ৩১ বছরে সুবর্ণ দ্বীপে ধর্মকীর্তির কাছে পড়বার জন্য যান
- ১২ বছর অধ্যয়ন করে ফিরে আসেন
- ১৫ বছর ভারতে বাস
- ১৩ বছর তিব্বতে কাটান; সেখানেই মৃত্যু

মোট ৭১ বছর বছর তিব্বতে কাটান :

যদি ধরা যায় আরও দুবছর তিনি ভারতে থেকে গেছেন তাহলে তাঁর বয়সের একটা বিশেষ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তিনি ৫৮ বছরে নয়—৬০ বছরে তিব্বত যান। শরদিন্দু সেই বিশেষ ধরেছেন। ৯৮২ খ্রিস্টাব্দকে তাঁর জন্ম সন ধরলে ১০৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ তিনি তিব্বতে যান। তাঁর

মৃত্যু হয় ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

এইভাবে দেখলে তিনি দুবছর বা তিন বছর নয়পালের রাজ্যকালে মগধে ছিলেন। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রার কাল হিসেবে ১০৩৮—১০৪২ পর্যন্ত পাঁচ বছরের কাল সীমা ধার্য করেছেন। নানা কারণে রমেশচন্দ্র মজুমদার কলচুরি রাজ গাঙ্গেয় দেবের মহীপালের বিরোধ ১০২৬ এর ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন সময় শুরু হয়েছিল বলে মনে করেন। কারণ ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দে বেনারসের অধিকার মহীপালের হাত থেকে কলচুরিরাজের হাতে চলে যায়।

ঐতিহাসিকদের স্বীকৃত ধারণা হ'ল গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন যদিও কেউ কেউ ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্যভার গ্রহণ হয়েছিল বলে মনে করেন। ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে নয়পাল বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এর আগে থেকেই চলছিল। গাঙ্গেয়দেব সম্ভবত পাল রাজাদের পরাজিত করেছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের হাতে পরাজিত হন। শরদিন্দু এই যুদ্ধের কথা প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন। উপন্যাসে পাই 'লক্ষ্মীকর্ণের পিতা গাঙ্গেয়দেব এবং নয়পালের পিতা মহীপাল অক্লান্তভাবে সারা জীবন পরস্পর যুদ্ধ করেছেন। লক্ষ্মীকর্ণ মধ্য বয়সে রাজা হয়ে এই যুদ্ধ ব্রত বজায় রেখেছিলেন। অন্যপক্ষে উপন্যাসের বর্ণনানুসারে যুদ্ধের প্রতি নয়পালের বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। তিনি শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ মগধ আক্রমণ করলে তিনি লক্ষ্মীকর্ণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু ইতিহাস পাই কর্ণ প্রথমে নয়পালকে পরাজিত করেন।<sup>১০</sup> (R.C. Majumdar, This is the generally accepted view thong, p. 145) লক্ষ্মীকর্ণের যে অনুশাসন বীরভূমের পাইকরে পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। উপন্যাসে কিন্তু যুদ্ধের এই বিবরণ পাওয়া যায় না। শরদিন্দু লক্ষ্মীকর্ণকে কিঞ্চিৎ স্থূল বুদ্ধির মানুষ হিসেবে এঁকেছেন। যদিও তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাঁকে 'ধূর্ত ও দুষ্টবুদ্ধির লোক' থেকে একটু উদ্ধার করি :

কর্ণ মগধ আক্রমণ করিয়া নয় পালকে পরাজিত করেন। তিনি পাল রাজধানী অধিকার করিতে পানের নাই, কিন্তু অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া মন্দিরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন। প্রসিদ্ধ আচার্য অতীশ অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন মগধে বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে কোন প্রকারে এই যুদ্ধ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু পরে যখন নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করিয়া কলচুরি সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে ছিলেন, তখন দীপঙ্কর কর্ণ ও তাহার সৈন্যকে আশ্রয় দেয়। তাহার চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। (R.C. Majumdar, This is the generally accepted view thong, Mr. J.C. Ghosh places it in 1039 A.D., p. 144)<sup>১৪</sup>

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৪, পৃ. ৭২) তিব্বতি সূত্র থেকেই একথা ব্যবহার করা হয়েছে। অলকা চট্টোপাধ্যায় তিব্বতি সূত্র অনুসরণ করে অতীশের সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে এই কথাই পাওয়া যায়। নয়পালের সৈন্য বাহিনী প্রথমে পরাজিত হয় কিন্তু রাজধানী দখল করতে পারেনি। পরে মগধ রাজের জয় হয়। প্রথমে নয়পালের পরাজয়ের সময় দীপঙ্কর কোনো উদ্যোগ নেননি, লক্ষ্মীকর্ণ পরাজিত ও নয়পালের হাতে তাঁর সৈন্যদল পর্যুদস্ত হলে তখন তিনি শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তিব্বতি ঐতিহ্য অনুসারে রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখেছেন নিজের স্বাস্থ্য এমনকি জীবন বিপন্ন করেও তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। (RC Majumdar, P. 145) ঔপন্যাসিক শরদিন্দু লক্ষ্মীকর্ণের জয়লাভের কথা বলেননি। বরং তিনি প্রথম থেকেই তাঁর যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে দুর্বলতা দেখেছেন। নয়পালের হাতে পরাজিত লক্ষ্মীকর্ণের ছবিই তিনি এঁকেছেন। যুদ্ধের প্রথমে লক্ষ্মীকর্ণের জয়ের কথা (it seems that at first Karna defeated Nayapala, p. 144) বলেননি। লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের রাজধানী দখল করতে পারেননি। তবে তারা বিহারের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাব পত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। এতেও দীপঙ্কর বিচলিত হয়নি। উপন্যাসে কাহিনিটি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসে পাই নয়পালের জিঘাংসু সৈন্যদের হাতে পীড়িত লক্ষ্মীকর্ণকে দীপঙ্কর আশ্রয় দেন। উপন্যাসে লক্ষ্মীকর্ণ দীপঙ্করকে বলেছেন খাদ্যের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তাঁরা বিহারে ঢুকেছেন। একদল শ্রমণ দীপঙ্করকে জানিয়েছেন সৈন্যরা অনকোষ্ট লুণ্ঠন করেছে। একথা ইতিহাস এবং উপন্যাস দুক্ষেত্রেই আছে। ইতিহাসে অতীশ কর্ণের সৈন্যদের রক্ষা করে তাদের অন্যত্র পাঠিয়েছেন। কর্ণ অতীব শ্রদ্ধায় অতীশের ভক্তে পরিণত হয়েছেন। অতীশকে নিজ রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। “অতীশকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করে তিনি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন”<sup>৩৬</sup> অতীশ দীপঙ্কর কর্ণের রাজধানী ত্রিপুরী গিয়েছিলেন—এরকম একটা ইঙ্গিত আছে। এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তিব্বতি বিবরণে একটি কথা আছে। দু-পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে অতীশকে অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। “Unmindful of his health even at the risk of his life Atisha again and again crossed the rivers that lay between the two kingdoms.”<sup>৩৭</sup> বছবার উভয় রাজ্যের মধ্যকার নদী পারাপার করা, নিজের স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে বহু শ্রম স্বীকার করে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা এই কথার মধ্যে যে টুকু বোঝা যায়—তাতে অতীশ দীপঙ্করের পক্ষে কলচুরি রাজ্যে যাওয়া অসম্ভব নয়। উপন্যাসে লক্ষ্মীকর্ণ জোর করে বিহার ভূমিতে অধিষ্ঠান করেছেন। তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা নেই তিনি ‘ব্যাপ্ত-চক্ষু’ মেলে দীপঙ্করকে দেখেছেন। উপন্যাসে তিব্বত থেকে আগত শ্রমণেরা অগ্নিকন্দুক ফাটিয়ে কর্ণের সৈন্যদের

ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছেন। লক্ষ্মীকর্ণ তিব্বতি শ্রমণদের পিশাচ মনে করে ভয় পেয়েছেন এবং দীপঙ্করের শরণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলচুরি রাজ কর্ণের সঙ্গে পাল রাজ নয়পালের শান্তি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিতে বিগ্রহপালের সঙ্গে যৌবনশ্রীর বিবাহের প্রস্তাব ছিল কিনা জানা যায় না—তবে শরদিন্দু উপন্যাসে এই শর্তটিকে ঢুকিয়ে রেখেছেন। এখানে একটি-দুটি প্রসঙ্গ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার চিন্তা। উপন্যাসে পাই দীপঙ্কর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বিদেশি বিজাতীয় তুর্কীদের আক্রমণ নিয়ে চিন্তিত। “তিনি বুঝিয়াছিলেন এই বিধর্মী দুবৃত্তগুলোকে সময়ে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে তাহারা সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিবে।” এরা যে তুর্কী যোদ্ধা সে কথাও বলা হয়েছে। “তুরস্কগণ নিষ্ঠুর যোদ্ধা, তাহার উপর যোর বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের ধর্মজ্ঞান নাই।” দীপঙ্কর দেখছেন দেশে শক্তিমান রাজা নেই, শত্রু বিতাড়নের উপযুক্ত অস্ত্রও নেই। এখানে একটি প্রশ্ন বিচার যোগ্য। দীপঙ্কর দুই রাজবংশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন কেন? এরকম উদ্যোগ অন্য কোনো ধর্মাচার্য নিয়েছেন কিনা বলতে পারি না। ভারতের প্রাদেশিক শক্তিগুলি তখন পারস্পরিক যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করে চলেছে। বহিঃশত্রুর সম্মুখে তাদের উদ্বেগ নেই। উপন্যাসের প্রথমে দেখি দীপঙ্কর তুর্কী আক্রমণের বিষয়ে চিন্তিত তিনি শক্তিমান রাজা শক্তিশালী অস্ত্র সন্ধান করছেন। পাল রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। নয়পাল তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন না কিন্তু কলচুরি রাজবংশের পরাক্রম তখনো অবশিষ্ট আছে। কলচুরি রাজবংশের মিত্রতা লাভ করতে পারলে মগধের পক্ষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। এটা দীপঙ্করের চিন্তায় থাকা সম্ভব। শরদিন্দু উপন্যাসে শুরুতেই বলেছেন পূর্ব ভারতে তখনো একটু আলো ছিল। দুর্মদ আততায়ীর আক্রমণের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন দীপঙ্কর একাধিক রাজশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পূর্ব ভারতকে শত্রু মুক্ত রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি শক্তিমান রাজা খুঁজছিলেন। দুই রাজবংশের সম্মিলিত রাজশক্তি সেই শক্তি। শত্রু বিতাড়নের নূতন অস্ত্র সম্মুখেও তিনি ভাবছিলেন। যদি অলৌকিক অস্ত্র থাকত তবে স্লেচ্ছদের তাড়ানো যেত। দীপঙ্করের এরকম কল্পনা বিলাসের মধ্যেই এসেছেন রত্নাকর শান্তি। তিনি তিব্বতি দূতদের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তিব্বতি দূতদের মধ্যে মুখ্য হলেন ট্‌ষল থ্রিম গ্যালবা ভারতীয় নাম বিনয় ধর। এই নাম একটু ভিন্নভাবে পাওয়া যায়। অলকা চট্টোপাধ্যায় তিব্বতি ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলে এই নামটিকে লিখেছেন ছুল্-ঠিম-জলবা। ইংরেজি ‘g’ বর্ণটি এক্ষেত্রে তিব্বতিতে গ উচ্চারিত না হয়েছে ‘জ’ উচ্চারিত হয়েছে। তবে শরদিন্দু এই নামটির ভারতীয় রূপ দিয়েছেন বিনয়ধর; অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতীয় রূপ দিয়েছেন জয়

শীল। তবে দীপঙ্করের এই ভক্ত শিষ্যটিই তাঁকে তিব্বতে নিয়ে যান। শরদিন্দু সম্ভবত রমেশচন্দ্র মজুমদারের তথ্য অনুসরণ করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন— “Tshul khrim gyalwa, also known as Vinaydhara ... proceeded to Vikramsila with the mission.”<sup>৩৭</sup> শরদিন্দু ইতিহাসের তথ্য অনুসরণ করে লিখেছেন তিব্বত রাজ লাহ-লামা-মে-শেস দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে। এখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চান-চুব রাজা হয়েছেন। তিব্বতে ধর্মের সংস্কার ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা তাঁকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চান। রাজা লাহ-লামা মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাও তাঁরা সঙ্গে এনেছেন। এই বর্ণনা ইতিহাস সম্মত। তিব্বত রাজ লাহ-লামা ইতিপূর্বে তাঁর জন্য সোনা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন দীপঙ্কর তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রাজা লাহ-লামার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে তিনি বিচলিত হন এবং তিব্বতে যেতে সম্মত হন “Dapankara was very much moved when he heard the news of the king’s death under tragic circumstances. He consented to pay a visit to tibet ...”<sup>৩৮</sup> কিন্তু উপন্যাসে এই তথ্যের সঙ্গে একটি কাল্পনিক বৃত্তান্ত যুক্ত হয়েছে। বিনয়ধর এবার উপঢৌকন হিসেবে কিছু অগ্নিকন্দুক এনেছেন। ‘বিনয়ধর পেটিকা হইতে একটি গোলক তুলিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—আর্য এর নাম অগ্নিকন্দুক। চীন দেশ থেকে কারুকর আগিয়ে আমাদের রাজা এই কন্দুক নির্মাণ করিয়েছেন। এর সাহায্যে আপনি বিধর্মী তুরস্কদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারবেন।’ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ.২৭৩) এই উপন্যাসের প্রথমে দীপঙ্কর তুরস্কদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে চিন্তিত ছিলেন। সেই চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে এই অগ্নিকন্দুকের কল্পনা এসেছে। অগ্নিকন্দুকের সম্বন্ধে অন্য তথ্যটি ঠিক। চীন দেশেই এই জিনিস প্রথম আবিষ্কৃত হয়। চীন দেশ থেকেই তা অন্যান্য দেশে যায়। ৭ম শতাব্দীতেই তাং রাজাদের আমলে চীনে এই ধরণের অগ্নিকন্দুক নির্মাণ হয়। তখনো তা সর্ব সাধারণের হাতে পৌঁছায়নি। লেখক এই কথাটি মনে রেখে গল্পে এই কন্দুকের কথা যুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত তুর্কী আক্রমণ সম্বন্ধেও এঁদের সচেতনতার খবর পাওয়া যায়। সবক্তগীণ ও তাঁর পুত্র মামুদ উত্তর পশ্চিম ভারতে জয় পালের রাজ্য আক্রমণ করে ভারতে ঢুকে পড়েছে। এ খবর বোধ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের অনেকে জানতেন। রত্নাকর শান্তিতে ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের প্রধান হিসেবে (Chief of the monastery)। শরদিন্দু ও সেকথা লিখেছেন। দীপঙ্করের তিব্বতে যাওয়ার কথা শুনে রত্নাকর বলিলেন— ‘অতীশ, তুমি যদি তিব্বতে যাও তিব্বতে ধর্মের দীপ জ্বলে উঠবে, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অগণ্য তুরস্ক সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। তিব্বতিদের মধুর বাক্যে সে কথা ভুলে যেও না।’

ইতিহাসে পাই Ratnakar discarded the idea. কিন্তু যখন তিনি বুঝেছেন দীপঙ্কর তিব্বতে যেতে ইচ্ছুক তখন তাঁকে যেতে বাধা দেন নি। তিনি তিন বছর পরে তাঁকে ফিরে আসতে বলেছেন। রত্নাকর শান্তি বলেছেন—

“Without Atish India will be in darkness. He Holds the key of many Institutions. In his absence many monasteries will be empty. The looming sign prognosticate evil for India. Numerous Turushks (Muhamadans) are invading India, and I am much concerned at heart.”<sup>১৯</sup>

এখানে যে তথ্য আছে উপন্যাসে হুবহু তারই রূপায়ণ ঘটেছে। অগণ্য আক্রমণকারী তুরস্কসেনার কথা তিব্বতি যাত্রাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। বিহারে নয়পালের সঙ্গে পরামর্শের দীপঙ্কর বলেছেন “বর্বর তুরস্কদের বিতাড়িত করতে হলে এই বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন।” (পৃ. ২৪৫) বিনয়ধর দীপঙ্করকে বলেছেন এই অগ্নিকন্দুকগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। এর চেয়ে শতগুণ ভীষণ অস্ত্র তাঁরা নির্মাণ করতে জানেন।” বিনয়ধর যে কন্দুকগুলি নিয়ে এসেছেন সেগুলির চেয়ে আরো শক্তিশালী বিস্ফোরক চীনে আবিষ্কৃত হয়েছে। উপন্যাস অনুসারে দীপঙ্কর সেই বিস্ফোরক নির্মাণের কৌশল শিখতে তিব্বতে যাবেন। দীপঙ্কর তিব্বতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য গেলেন। তিনি গুটবিদ্যা শিক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। শরদিন্দু লিখেছেন এ সম্বন্ধে “ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।” শরদিন্দু কোনো ইতিহাসের সূত্রে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কথা জেনে দীপঙ্করের এই অস্ত্র শিক্ষার কথা লিখেছেন বলে জানা যায় না। তবে একটা কথা বলা দরকার। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাস থেকে তিনি নূতন অস্ত্রের কথা বলছেন। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও নূতন অস্ত্রের কথা আছে। মনে হয় কাহিনীতে এরকম অভিনবত্ব সৃষ্টির দ্বারা বিস্ময়রসের সৃষ্টি কথা শরদিন্দুর ঈঙ্গিত।

প্রথম পরিচ্ছেদে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হ’ল আগে বলা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিল রাজ্য দুটির মধ্যে সম্প্রীতি সাধন করে শক্তি সঞ্চয় করা। দীপঙ্করের দিক থেকে তাই ছিল উদ্দেশ্য। নয়পাল তেমন শক্তিধর ছিলেন না, যুদ্ধ অপেক্ষা পাশা খেলায় তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ ছিলেন রণ দুর্মদ। তাঁর শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দীপঙ্কর তাঁকে যে সাহায্য করেছেন—তাকেও সরাসরি নস্যাৎ করতে পারেননি। ইতিহাসে দীপঙ্করের চেষ্টায় উভয় পক্ষের সন্ধির কথা আছে। দীর্ঘকাল ধরে পাল রাজাদের সঙ্গে কলচুরি রাজাদের যে যুদ্ধ চলে আসছিল এতে সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু এ সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। “The treaty was merely an interlude, and karna once move directed his arms against the

palas during the reign of Vigrahapala III (1055-1070)”<sup>৪০</sup> লক্ষ্মীকর্ণ ইতিমধ্যে পরমার এবং চান্দেলাদের পরাজিত করে মহানদীর উপত্যকা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি বিগ্রহ পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। বঙ্গ এবং গৌড়ের রাজারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন (R.C. Majumdar, p. 146) কর্ণ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম পর্যন্ত যে অগ্রসর হয়েছিলেন বীরভূমের পাইকরে প্রাপ্ত লিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

“in this second expedition, too, karna, inspite of initial success, ultimately suffered defeat. কর্ণ শেষ পর্যন্ত গৌড় জয় করে উঠতে পারেননি। এবারও সন্ধি করতে বাধ্য হয় perhaps a peace was concluded, and the alliance was cemented by the marriage of karna’s daughter with vigrahapal III.”<sup>৪১</sup>

প্রথম সন্ধি নয়পালের রাজত্ব কালে ১০৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে; দ্বিতীয় সন্ধি ও যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহের বিয়ে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দের পরে। ইতিহাসের এ দুই ঘটনাকে একটি কাহিনি প্রবাহের মধ্যে জুড়ে লেখক উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্য মোটের উপর ঠিক আছে কেবল উপন্যাসের প্রয়োজনে তার মধ্যকার কালসঙ্কেচ ঘটেছে। দ্বিতীয়ত কাহিনিতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার জন্যে ইতিহাসের তথ্যের মধ্যে রস সঞ্চারণ করতে হয়েছে। তাতে অবশ্য বিগ্রহ বা লক্ষ্মীকর্ণ কারো রাজ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। ইতিহাসে যৌবনশ্রীর বিবাহের সম্বন্ধে কোনো বিবরণ নেই। উপন্যাসিক দীপঙ্করের মুখ দিয়ে লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার সঙ্গে বিগ্রহের বিবাহের প্রস্তাব করিয়েছেন। বিগ্রহ তখন মাত্র কুড়ি বছরের যুবাশ্রী; লেখক বলেছেন “সুন্দর কান্তি যুবা, রাজবংশেও এমন সুপুরুষ দুর্লভ।” দীপঙ্কর দেশে শান্তিরক্ষা চান তাই মৈত্রীর কথা বলেন। দুই রাজবংশের মৈত্রী হলে রাষ্ট্রের কল্যাণ। লক্ষ্মীকর্ণ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং কন্যার স্বয়ম্বর সভার উদ্যোগ করবেন বলেছেন। সেই সভায় তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিগ্রহকে আমন্ত্রণ জানাবেন বলেছেন। এটা অবশ্য লক্ষ্মীকর্ণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। তিনি অচিরেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন।

ইতিহাস যেখানে নীরব, উপন্যাসিকের কল্পনা সেখানে কাহিনি নির্মাণ করে ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ করে। ইতিহাসের ক্ষীণ এবং আপাত বিচ্ছিন্ন কাঠামোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারণ করে নব প্রতিমা নির্মাণ করে। এই কাহিনি নির্মাণের ক্ষমতাসূচ্যকে বিশ্বাস্য করে গড়ে তোলবার প্রতিভা শরদিন্দুর ছিল। পাল রাজবংশের সঙ্গে কলচুরি বংশের লক্ষ্মীকর্ণের দু’বার যুদ্ধ এবং সন্ধি হয়। এইটুকু ইতিহাসের কাঠামো। তার মধ্যবর্তী তথ্য কিছুই নেই। এই মধ্যবর্তী অংশ শরদিন্দুর গড়ে

তোলা।

প্রথম সন্ধির শর্ত হিসেবে দীপঙ্কর বিগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহের কথা তুলেছিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ সে প্রস্তাবে রাজি হননি; তিনি তাঁর বংশের বহু পুরুষানুক্রমে আগত কন্যা স্বয়ম্বরের কথা বলেছিলেন। দীপঙ্কর তখন শর্ত দিয়েছিলেন স্বয়ম্বর সভায় বিগ্রহকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। লক্ষ্মীকর্ণ যৌবনশ্রীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন ঠিকই কিন্তু বিগ্রহকে আমন্ত্রণ জানাননি। কাহিনি এখানে ইতিহাস ছাড়িয়ে উপন্যাসের নিয়মে চলেছে। অনাхত বিগ্রহ বন্ধু অনঙ্গপালের সঙ্গে যুক্তি করে কৌশলে যৌবনাকে হরণ করে আনতে ত্রিপুরী রাজ্যে যাবেন ঠিক করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জুড়ে এই যাত্রার বর্ণনা। কিন্তু কেবল যাত্রার বর্ণনায় উপন্যাস হয় না, তাই যাত্রা পথে জাতবর্মা ও তাঁর স্ত্রী বীরশ্রীর কথা আনতে হয়েছে এবং কন্যাহরণ করে বিবাহ করবার উদ্যোগে জাতবর্মা ও বীরশ্রীর সম্মতি ও সহযোগিতা লাভের কথা বলা হয়েছে। আপাত বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ কাহিনি এইভাবে উপন্যাসের কাহিনির উদ্দীপনা ও কৌতূহল মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরী রাজ্যে স্বয়ম্বর উপলক্ষে প্রথম এসে পৌঁছলেন জাতবর্মা ও বীরশ্রী। স্বয়ংবর লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা যৌবনাকে নিয়ে এঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন। এইখানে যৌবনশ্রীর প্রথম বিগ্রহকে দেখেন এবং একবার দেখেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। বিদ্যাপতির উপমা ব্যবহার করে শরদিন্দু যৌবনার মনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন “মেঘমালার ভিতর দিয়া তড়িলাতার মত অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষ হৃদয়ে শেল হানিয়া দিয়া চলিয়া যায়, অন্তর্লোকে অলৌকিক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়।” রাজকুমারী যৌবনশ্রীর মনে বিগ্রহের মূর্তি এই শেল বিদ্ধ করে ইন্দ্রজাল ঘটিয়ে গেল। যৌবনশ্রীর এই চিন্তাচঞ্চল্য কাহিনিতে নায়ক নায়িকার মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে। যৌবনশ্রী বিগ্রহকে দেখা মাত্র মুগ্ধ হয়েছে; বিগ্রহ যৌবনাকে হরণ করবার উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরী এসেছে। নায়ক নায়িকার মধ্যে আর্কষণ দেখা যাচ্ছে কিন্তু মিলনের পথে বাইরের বাধা। আগেকার প্রেম কাহিনিগুলির সমস্যা ছিল এইরকম। বাইরের লোকজন, সমাজ শাসন, অভিভাবকদের নিষেধ—এই সবই ছিল সে প্রেমের মিলনের সমস্যা। আধুনিক প্রেম কাহিনিতে বাইরের লোকজন বা সমাজ শৃঙ্খলা ততো বড়ো হয় না—বাধা হয়ে ওঠে নায়ক নায়িকার ব্যক্তিত্বের মাত্রা। শরদিন্দুর ‘কুমার সপ্তবের কবি’ উপন্যাসেই কেবল নায়িকার অভিমান বড়ো হয়ে মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অন্য কোনো উপন্যাসে এরকম হয়নি। বাইরের বাধাকেই নানা উপায়ে অতিক্রম করে মিলনের পথ করে নিতে হয়েছে।

বিগ্রহ ও যৌবনার মিলনের পথে বাধা রাজা কর্ণের অহঙ্কারবোধ; অস্মিতাবোধ। নয়পালের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব

লক্ষ্মীকর্ণের অহংকার। তিনি বিগ্রহকে কন্যার পাণিগ্রহীতা হিসেবে স্বীকার করতে চান না। এই বিরাট বাধার বিপরীত দিকে সহযোগী হয়ে কাজ করেছেন বীরশ্রী ও জাতবর্মা এবং লক্ষ্মীকর্ণের মা অম্বিকাদেবী। বিগ্রহ এবং যৌবনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে। সেখানে বীরশ্রী তাদের সহায়ক। এরপর রাজপুরীর উদ্যানে ও তাদের দেখা হয়েছে। শরদিন্দু এ ক্ষেত্রে রাজপুত্র ও রাজকন্যার অনুরাগকে একালের উদ্যানকেন্দ্রিক প্রেমিক প্রেমিকার কলগুঞ্জনের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। সেকালের সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে অনুচা রাজকন্যার পক্ষে পরদেশী যুবকের সঙ্গে বৃক্ষ বাটিকায় প্রণয় সম্ভাষণের কোনো অন্তরায় রাখেননি। রাজপুরী থেকে পুরনারী বা দুই রাজকন্যার জন্য অন্তঃপুর রক্ষী দলের অন্তরায় রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। রক্ষী পরিবৃত্ত অন্তঃপুরের উদ্যানে পরপুরুষের প্রবেশ পথে কেউ বাধা দেয়নি। নায়ক নায়িকার প্রেম এই নির্বাধ পরিবেশে আবেগ মথিত হয়ে উঠেছে। এদিকে রাজা বিগ্রহকে অপমানিত করবার জন্য যে ফন্দি করেছেন তাতে অনঙ্গ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারেনি। লক্ষ্মীকর্ণের শিল্পিরা কেউ বিগ্রহের চিত্রপট দেখেনি—চর্মচক্ষে তো দেখেইনি। লক্ষ্মীকর্ণ কোন শিল্পিকে মগধে পাঠিয়ে বিগ্রহের সাক্ষাৎ পরিচয় নেবার কথাও ভাবেননি। কাজেই অগঙ্গই এখানে একমাত্র শিল্পি যে চোখ বন্ধ করেই বিগ্রহের মূর্তি গড়তে পারে। আর তারই সহযোগিতা করবার জন্য হঠাৎ চিন্তিত অনঙ্গের সম্মুখে মধ্যাহ্ন-আহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বান্ধুলি। বজ্র আঁটুনির মধ্যে বিস্ময়কর ফাঁক থেকে গেছে। কাজেই লক্ষ্মীকর্ণের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়েছে বটে, মর্কট মূর্তি-বিগ্রহ স্বয়ম্বরে বসেওছে, কিন্তু সেই বেতের কাঠামোর ভিতর থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে এসেছে বিগ্রহ, যাকে যৌবনা মালা দিয়েছে। লেখক এক্ষেত্রে জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার সঙ্গে পৃথীরাজের পরিণয় প্রসঙ্গের কথা তুলেছেন। তাঁর মতে সেকালে রাজাদের মধ্যে এই ধরনের নষ্টামি প্রচলিত ছিল। বিগ্রহপাল যৌবনাকে চুরি করে নিয়ে যাবেন ভেবেই এসেছিলেন। কিন্তু যৌবনা এ অপহরণ প্রচেষ্টাকে স্বীকার করেননি। তাই স্বয়ম্বর পর্যন্ত যেতে হয়েছে। বিগ্রহের গলায় মালা দেবার পর স্বয়ম্বর সভায় অগ্নিকন্দুক ছুঁড়ে সভাকে বিভ্রান্ত করেও বিগ্রহ কিন্তু যৌবনাকে নিয়ে যেতে পারেন নি। লম্বোদর তাকে ঘোড়ায় উঠতে দেয়নি। এটা কাহিনির দিক। শরদিন্দু এই পর্যন্ত কাহিনিতে বাইরের বাধার সঙ্গে অন্তরের বিরোধকে জুড়ে দিয়ে এই কাহিনির দ্বন্দ্ব গড়ে তুলেছেন। রাজকুমারী যৌবনার আত্মমর্যাদা এবং বিগ্রহপালের মর্যাদা সম্বন্ধে যে বোধ তাই সহজ সমাধানের রাস্তায় তাকে যেতে দেয়নি। অন্য পক্ষে ইতিহাসের দিক থেকেও তো বাধা ছিল। কারণ রাজকন্যার স্বয়ম্বর হয়েছে কিনা ইতিহাসে তার বিবরণ নেই, কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যে দ্বিতীয়বার পাল রাজ্য আক্রমণ করে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েও পরাজিত হন সে প্রমাণ আছে। সম্ব্যাকর নন্দীর

‘রামচরিত’ অনুসারে শেষ পর্যন্ত বিগ্রহপাল কর্ণকে পরাজিত করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—“Karna, inspite of initial success, ultimately suffered defeat”<sup>৪২</sup> কাজেই ইতিহাসের সত্যের কারণেই বিগ্রহপালের পক্ষে তখনই যৌবনাকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না—লম্বোদর কাহিনিতে এই নিমিত্তের ভাগী মাত্র।

রোমানের একটা বৈশিষ্ট্য হ’ল জটিলতা দানা বেধে ওঠার আগেই তাকে লঘু করে দেবার রাস্তা পাওয়া যায়। এখানে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা প্রধান রচনার পার্থক্য। বাস্তবে যা ঘটা দুষ্কর রোমানে তা অনায়াস, এজন্য রোমান রচনায় কাহিনি বাস্তবিকতা অপেক্ষা লঘু কল্পনা চারিতা অনুসরণ করে চলে। কাহিনির পরম্পরক্রম একটা থাকে কিন্তু তাতে ঘটনা বিন্যাসের যুক্তি অনেকটা লঘুচারী। শরদিন্দুর এই উপন্যাসে প্রথম জটিলতা তৈরি হয়েছিল যৌবনার আত্মমর্যাদা বোধের উচ্চারণে। আর দ্বিতীয় জটিলতা দেখা গেল রাজা লক্ষ্মীকর্ণের ক্রোধের ফলে যৌবনশ্রীর গৃহান্তরীণ হওয়ায়। লক্ষ্মীকর্ণ মাবের কৌশলটি বুঝতে পারলেন (এতদিন পারেননি কেন? তাঁর কি গুপ্তচরেরা ঠিক খবর দিতে পারে নি?) এবং যৌবনাকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। ফলে বিফল মনোরম বিগ্রহকে একাই ফিরে যেতে হল। ইতিহাসের সঙ্গে সংস্পর্শহীন বলে অনঙ্গের অবশ্য বাঙ্গুলিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি। ইতিহাসে দেখতে পাই বিগ্রহপালের রাজত্বকালে লক্ষ্মীকর্ণ আবার পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। বিগ্রহপাল (তৃতীয়) ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার পরবর্তী কোন সময়ে এই যুদ্ধ হন। এই মধ্যবর্তী সময়ে লক্ষ্মীকর্ণ ‘পরমার’ এবং ‘চান্দেলা’ দের পরাজিত করে অনেক শক্তি সংগ্রহ করেন। কলচুরি রাজবংশের তথ্য অনুসারে বঙ্গরাজ লক্ষ্মীকর্ণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু ‘রামচরিত’ অনুসারে বিগ্রহ লক্ষ্মীকর্ণকে পরাজিত করেন। যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহের বিবাহ হয়। কাহিনিতে দ্বিতীয় যুদ্ধ নয়পালের রাজত্বকালেই ঘটেছে। এবং এই যুদ্ধ উপন্যাসে ঠিক যুদ্ধ হয়নি অনেকটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ছবি হয়েছে মাত্র।

লক্ষ্মীকর্ণ পাল রাজ নয়পাল এবং (মর্কট?) বিগ্রহপালকে শাস্তা করবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেছেন। যুদ্ধে বৃদ্ধ মা এবং ‘স্বয়ম্বর’ কন্যাকে ও নিয়ে এসেছেন। সেকালে অবশ্য এরকম ব্যাপার অসম্ভব ছিল না। রাজারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সপরিবারে যাত্রা করতেন। কেননা স্কন্ধাবারই ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত। কিন্তু যুদ্ধ কেবল দুপক্ষের শিবির সংস্থাপনের মধ্যেই আটকে রইল। আর দুপক্ষের সৈন্যই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রস্তিদের রাজাকে বলেছিলেন এখন যুদ্ধ যাত্রার সময় নয়, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ তা শোনেননি। পথশ্রমে ক্লান্ত পালরাজের সৈন্যবাহিনীকে বিশ্রামের সময় না দিয়ে তিনি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু “নৈঋত হইতে যমদূতাকৃতি

মেঘ” এবং “প্রমত্ত ঝাঞ্জাবাত” এসে তাঁর উদ্যমকে বিফল করে দিল। একথা ঠিক যে প্রাকৃতিক দুর্বোঙ্গে বহু রাজা যুদ্ধে অভিপ্রেত ফললাভ করেননি। বৃষ্টির ফলে কদমাক্ত ভূমিতে পুরুর সৈন্যরা ধনু স্থাপন করে যুদ্ধ করতে পারেনি। প্রচণ্ড তুষার ঝটিকার ফলে সুবুক্ত গীনের বিরুদ্ধে ৯৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে জয়পালের সৈন্যরা দাঁড়াতে পারেনি, ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রচণ্ড নিদাঘ ঝাঞ্জায় উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধোদ্যম হারিয়ে বসে রইল। এই প্রাকৃতিক দুর্বোঙ্গের মধ্যে এসে পৌঁছলেন বীরশ্রী, বঙ্গালদেশের রাজা জাতবর্মার স্ত্রী। তারপর উপন্যাসে যে ঘটনা ঘটল তা নিতান্ত বালকোচিত, মনোহারি এবং ‘সিনেমাটিক’। আফিম খাইয়ে সৈন্যবাসের রক্ষীদের ঘুম পাড়িয়ে যৌবনশ্রীকে অপহরণ কেবল রোমান্সের বা রূপকথার জগতেই ঘটে। এবং শেষ পর্যন্ত যেভাবে দুর্দান্ত পরাক্রমী লক্ষ্মীকর্ণ কন্যাও জামাকে নিজের স্কন্ধে তুলে তাণ্ডব নর্তন করলেন তা একবার মাত্র শরদিন্দুর ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসেই ঘটেছে। বর্মণ বংশ বঙ্গাল দেশে কিছুকাল রাজত্ব করে। ভোজবর্মার ‘বেলাব’ তাম্র শাসন থেকেই এ বংশের সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। (R.C. Majumdar, p. 197) এঁরা সিংহপুরের যাদব বংশ। সিংহপুরকে বর্তমান হুগলীর সিঙ্গুর বলে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র ‘মহাবংশ’ অনুসারে এই সিংহপুর থেকেই বিজয়সিংহ লক্ষা গিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সিংহপুরকে কলিঙ্গদেশের কোন স্থান বলে মনে করেন। কীভাবে এই কলিঙ্গদেশের যাদব বর্মণরা বঙ্গালদেশে দখল করলেন তা জানা যায় না। কিন্তু যা জানা যায় তা হল জাত বর্মাই বঙ্গালদেশে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ‘বেলাব’ অনুশাসনে বলা হয়েছে জাতবর্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। অঙ্গ কামরূপ বরেন্দ্র তিনি জয় করেছিলেন। জাতবর্মার জন্য যে গৌরব দাবি করা হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অঙ্গদেশে দখল করেন বিদ্রোহী দিব্যকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী দখল করেন। কিন্তু বহিরাগত জাতবর্মার এই যুদ্ধ জয়ের গৌরব ঐতিহাসিকেরা মেনে নেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ...he accompanied the kalchuri king karna in his expedition against Bengal. কলচুরি রাজকর্ণের একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে তিনি পূর্ব দেশীয় একটি রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন কলিঙ্গ দেশীয় জাতবর্মা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন জাতবর্মার পিতা বজ্র বর্মণ রাজেন্দ্র চোল, জয়সিংহ (২য়) বা গাঙ্গেয়দেবের যেকোনো একজন বৈদেশিক রাজাকে বাংলাদেশ আক্রমণে সহায়তা করেছিলেন। কলচুরি রাজগণের অধীনে অঙ্গ গৌড় ও বঙ্গে যুদ্ধাভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই সুযোগে বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।<sup>১০</sup> শিলালিপির প্রমাণানুসারে রাজ কর্ণ বঙ্গের এক রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন। সেটা সম্ভবত চন্দ্রবংশ। চন্দ্রবংশ ধ্বংস করে কলচুরি রাজ জাতবর্মাকে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে

থাকতে পারেন। তিনি যে অঙ্গ বরেন্দ্র কামরূপ রাজ্যজয়ের কথা বলেছেন তার অর্থ এই কলচুরি রাজবংশের সহায়তাকারী হিসেবে যুদ্ধে যোগদান ও কলচুরি রাজাদের জয়কে নিজের জয় বলে স্বীকার করা।

এখন আমাদের বিবেচ্য উপন্যাসে জাতবর্মার রূপ অঙ্কিত হয়েছে তাকে কতখানি ইতিহাস সম্মত বলা যায়? জাতবর্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রথম যুদ্ধের সময় কলচুরি-রাজকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে এসেছেন। অর্থাৎ ইতিহাসে যে কথা বলে-জাতবর্মা কলচুরি রাজকে যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলেন—সেই ভূমিকায় জাতবর্মাকে দেখতে পাই। জাতবর্মা তখন বিবাহিত, হাসিখুশী যুবা-বয়স্ক। কিন্তু দ্বিতীয় বার যুদ্ধে তিনি লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। এর বিপক্ষে ও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তবে ভোজবর্মার ‘বেলাব’ অনুশাসন অনুসারে তিনি অঙ্গদেশের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এর অর্থ পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোঝায়। শরদিন্দু পালরাজ ও কলচুরি রাজের দ্বিতীয় যুদ্ধে জাতবর্মাকে পালরাজের সহায়তা করবার কথা লিখেছেন। উপন্যাসে রাজা বজ্র বর্মাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, রাজপুত্র জাতবর্মা তখন যুবরাজ মাত্র। ইতিহাসে জাতবর্মাই বঙ্গদেশে বর্মণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। “Vajravarman, the first ancestor named in the grant, is not referred to as King.” বেলার তাম্র শাসনে যেভাবে জাতবর্মার উল্লেখ আছে তাতে রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন জাতবর্মাই এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডি.সি. গাঙ্গুলি অবশ্য লিখেছেন বজ্রবর্মাই এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শরদিন্দু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস অনুসরণ করে ছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বজ্রবর্মা কুমার জাতবর্মাকে প্রতিভূ করে একশত রণহস্তী দিয়ে কলচুরি রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। এটা ইতিহাসে নির্দিষ্ট করে পাওয়া যায় না। জাতবর্মার সঙ্গে বিগ্রহ পালের মৈত্রীর সংবাদও ইতিহাসে নেই। তবে জাতবর্মা বিগ্রহপালের রাজ্যের অংশ দখলকারী বিদ্রোহী বরেন্দ্র নেতা দিব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

‘কুমারসম্ভবের কবি’ উপন্যাসটির মর্মমূলে প্রবেশ করবার পূর্বে স্বয়ং লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মানসতার পরিচয় জানা অবশ্য কর্তব্য। তা না হ’লে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টি ভঙ্গি ও সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে। বাংলায় যখন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ঠিক সে সময়ই বাংলার বাইরে বসে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করে তুলছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিত সমালোচকগণ (কতিপয় ব্যতীত) শরদিন্দুর সাহিত্য সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখা ও তাঁর জীবনাদর্শের অনুসারী হলেও কবির হাতে ‘কেউ কেউ’<sup>৪৪</sup> শরদিন্দুর লেখা তুলে

দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। শরদিন্দুর দেওয়া চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“আমার অসুস্থ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার সেক্রেটারীরা সম্ভবত আপনার বই আমাকে দেন নাই।”<sup>৪৬</sup> উল্লেখ্য, কতিপয় সমালোচক ছাড়া আজ পর্যন্ত শরদিন্দুর মতো সাহিত্যিকের সঠিক মূল্যায়ন কেউ করেননি। এটা বাঙালি সমালোচক ও সাহিত্যিকদের অবহেলা উপেক্ষার বিষয়, না তাঁরা জানতেনই না যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন প্রবাসী বাঙালি বাংলা সাহিত্য নামক প্রদীপের নীচে বসে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যাইহোক, শরদিন্দুর মানসলোক ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে পৃথক অধ্যায়ে বিষদভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে শরদিন্দুর সাহিত্যিক মানসিকতা সম্পর্কে দু’-একটি কথা তুলে ধরা হ’ল—“আমি সাহিত্যিক, কোনও ism-এর ধার ধারিনা। Realism, Romanticism প্রভৃতি বাক্যে আমার কাছে সমান নিরর্থক। আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রসসৃষ্টি করাই আমার স্বধর্ম। কাউকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই, গল্পলেখার ব্যপদেশে Socialism, Marxism প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করারও আমার কাজ নয়। আমি জীবনকে যতটুকু বুঝেছি, জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করেছি সেইটুকুই আমার পাঠকদের পরিবেশন করেছি।

মনুষ্য জীবনের অপার বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে, মানুষের অতীত ইতিহাস আমার কাছে অনির্বচনীয় রসের ভাণ্ডার।”<sup>৪৭</sup> তিনি জানতেন রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। তাই সাহিত্যকে রসসত্য করে তুলতে যেমন সাহিত্য-সাধনা করতেন তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন নূতন নূতন। কখনো ইতিহাস, কখনো মানুষের মন, কখনো সাহিত্যের সত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতেন। এরকমই চিন্তা-প্রসূত একটি উপন্যাস হ’লো ‘কুমার সম্ভবের কবি’। কালিদাস ও তাঁর সমসাময়িক জীবনেতিহাস নিয়ে রচিত এটি। বিশেষ করে কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে এই লেখাটিতে। কালিদাসের সমসাময়িক ইতিহাসের ফ্রেমে লেখক কালিদাসকে দেখেছেন। আসলে কালিদাস সম্পর্কে লেখকের কৌতূহল আগাগোড়াই। কেননা, তিনি ‘অষ্টম সর্গ’ নামেও কালিদাস সম্পর্কিত একটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প লিখেছেন। আমরা ছোটগল্পের অধ্যায় বিশ্লেষণে তার বিষদ ব্যাখ্যা ও বিচার করেছি। প্রচলিত আছে যে—

“হায়রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।

পাণ্ডিতেরা বিতর্ক করে লহে তারিখ সাল।।”<sup>৪৮</sup>

সত্যিই এই বিতর্ক থেকেই শরদিন্দু কালিদাসকে নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। নানা মিথ বা গালগল্প, কল্পনা বা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ইতিহাসের নীরবতা ও সত্যাসত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। কালিদাসকে নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য রয়েছে তথ্যভিজ্ঞ ও পাণ্ডিত মহলে। এমনকি

তার লেখাগুলিও বিতর্কের ঝড় থেকে বাদ পরে যায়নি। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সময়ের মহাকবি। কিন্তু কালিদাস আগে, না শূদ্রক আগে সে বিতর্কও কিন্তু কম নয়। লেখক তাঁর ‘কুমারসম্ভবের কবি’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন মূর্খ নিরক্ষর গ্রামীণ কালিদাস কী করে সভাপণ্ডিত ও কবি হয়ে উঠলেন তারই অপরূপ বর্ণনা। কুমারী রাজকন্যা হৈমবতীর তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াতে পূর্বশর্ত মতো রাজকন্যা তার গালায় বর মাল্য পরিয়েছেন। বাসর রাতে রাণীর হাতে ‘ম্চ্ছকটিকম’ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কালিদাস জানতেন না বইটির নাম কি, কার লেখা? তখনও কালিদাস মূর্খ ও নিরক্ষর। তাহলে প্রশ্ন হ’ল সমস্ত বিশারদ কালিদাস সম্পর্কে সময়কাল নির্ণয় করে বলেছেন যে, শূদ্রকের পূর্বের কবি হ’ল কালিদাস। অনেকে আবার শূদ্রককে কালিদাসের পূর্বে স্থিত করতে চেয়েছেন। আর এই অবকাশে বা কালিদাস সম্পর্কিত নানা মুণির নানা মতকে হাতিয়ার করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শূদ্রককেই কিন্তু কালিদাসের পূর্বে স্থিত করেছেন। যদিও এটি বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু শরদিন্দুর মতের নিরিখেই আমরা ‘কুমারসম্ভবের কবি’ বা ‘অষ্টম সর্গ’ উপন্যাস ছোটগল্পের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করব। ইতিহাসের কাল নির্ণয় ঐতিহাসিকের কাজ। সাহিত্যিক ও ইতিহাসের পাঠক হিসেবে শরদিন্দু তাই ইতিহাস ও সাহিত্য মিলে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। স্বভাবতই ইতিহাসের নিরিখে আমরা কালিদাসের মহাকবি হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বিশদ ভাবে বিচার ও ব্যাখ্যা করব। ‘অষ্টম সর্গ’ নামক গল্পটি ইতিহাসের একটু ছোঁয়া থাকলেও সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে কালিদাসের দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র। এবং তাঁর সমকালীন জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা। পাশাপাশি সাহিত্যিক বিতণ্ডার কথাও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসটিকেও কিন্তু ইতিহাসের খানিক ছোঁয়ায় রচিত কালিদাস তাঁর সমসাময়িক জীবনালেখ্যের দলিল বললেও অত্যাুক্তি করা হবে না। ‘অষ্টম সর্গ’ ও ‘কুমারসম্ভবের কবি’ রচনা দুটি পাশাপাশি রেখে আমাদের আলোচনা করবার কারণ হ’ল ‘কুমারসম্ভবের কবি’তে কালিদাসের কাঠুরে থেকে কবি হওয়ার কথা, ঘটনাচক্রে কুন্তলরাজ কুমারী হৈমবতীর সঙ্গে বিবাহ, বিবাহের রাত্রিতেই কুন্তল রাজ্যের ত্রিসীমানা থেকে বের করে দেওয়া ও তৎপরবর্তী দুঃখময় জীবন বর্ণনা ইত্যাদি পুঙ্খানুভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে কালিদাসের বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য জীবন ও দাম্পত্য জীবনে কালিদাসের প্রতি অবিশ্বাস, সংশয়, দ্বন্দ্ব সমকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে পরিস্ফুট করা হয়েছে। বলা যায়, উপন্যাসটিতে তার জীবনের প্রথম পর্ব ও গল্পটিতে দ্বিতীয় পর্ব ক্রমপরম্পরায় বিধৃত হয়েছে।

আর একটি বিষয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন পাঠকের নজরে এনেছেন যা পরীক্ষামূলক কিছুটা আবার বিতর্কিত। উল্লেখ্য, বিষয়টি হ’ল ‘ম্চ্ছকটিকম’ নামক নাটকটি উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য

ভাবে ব্যবহার করা। এর কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত। এবার তা বিচার করা যাক। আলোচ্য উপন্যাসটি বিষয়বস্তু হ'ল—কাঠুরে কালিদাসের জগৎ বিখ্যাত কবি হ'য়ে ওঠা। আবার কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার পেছনেও একটি কাহিনি রয়েছে। কাহিনিটি এরকম—কুস্তল রাজকন্যা হৈমশ্রীর স্বয়ংবর সভা। স্বয়ংবর সভা উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হয় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আমন্ত্রণ। তবে স্বয়ংবর সভার একটি শর্তও রয়েছে। রাজকুমারী কৃত তিনটি প্রশ্নের সঠিক দিতে পারবে তারই গলায় রাজকুমারী বরমাল্য দেবে। সে হিসেবে রাজা ও রাজ্যের বাইরের রাজকুমার, সামন্ত, শ্রেষ্ঠি ও কয়েকজন নাগরিক রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে লজ্জায় মুখ ঢেকে ফিরে গেছেন। লেখকের বর্ণনায়—“উঁহু উনপঞ্চাশ। এই যে হিসেব—তেরোজন রাজকুমার, সতেরোটি সামন্ত, চৌদ্দ জন শ্রেষ্ঠিপুত্র, আর পাঁচটি নাগরিক। কত হল?”<sup>৪৮</sup> এরপরে সৌরাস্ত্রের যুবরাজের পালা। যুবরাজ মকরবর্মা। সে এক আশ্চর্য কাহিনি। যুবরাজ মকরবর্মা কুস্তল রাজসভার দিকে রহনা দিয়েছেন। ঘুরপথে তার রাজমন্ত্রী কর্মচারীরা রহনা দিয়েছেন। কিছুটা বেশী সময় লাগবে বলে যুবরাজ সোজা পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছেন। পথে ক্লান্তি অনুভব করে জঙ্গলে মধ্যেখানে একটি জলাশয় দেখে জল পান কিংবা স্নান করবেন বলে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইতস্তত এদিক ওদিক দেখে ঘোড়া থেকে নামতেই দেখতে পান একটি সুন্দরকান্তি বছর কুড়ির যুবক যে গাছের শাখায় বসে আছে তারই মূলে কুঠারাঘাত করছে। যুবকটির মুখে শিশুর সরলতা, মুখের হাসি নব-বিস্ময় ও কৌতুকভরা, মনে হয় যেন কোনো দৈব শিশু। সাংসারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বিন্দুমাত্র আছে বলে অনুমান হয় না। যুবরাজ বিস্ময় ভরে দেখে তাকে প্রশ্ন করে তুই কে রে? সরল ভাবে হাসি মুখে বলে, আমি কালিদাস। যুবরাজ পুনরায় প্রশ্ন করে কুস্তল রাজধানী এখান থেকে কতদূর জানিস? কালিদাস বলে হেঁটে গেলে একদিন লাগবে। কালিদাস আবার তার বেশভূষা দেখে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? যুবরাজ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তার দিকে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গের সুরে বলে—আমি সৌরাস্ত্রের যুবরাজ মকর বর্মা। কালিদাস গ্রামীণ। সে ভাবতেই পারেনি রাজপুত্র দেখবে। কালিদাসের কৌতূহল বেড়ে গেল। মন্ত্রির কোটাল সব পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বলেও যুবরাজ তাকে জানায়। কালিদাসের ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। বলে তুমি কি স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছ। যুবরাজ ইঙ্গিতে জানালেন হ্যাঁ। তারপর একে একে শিরস্ৰাণ, রাজপোষাক খুলে ঘোড়ার পিঠে রেখে নাইতে নামতেই কালিদাস এক এক করে শিরস্ৰাণ, জুতা জোড়া এবং রাজবেশ পরে ফেলেছে। ওদিকে যুবরাজ আপন মনে স্নান করছিল। সজ্জিত হয়ে কালিদাস পুনরায় শাখাটি কাটতে শুরু করে দিয়েছে। ঘোড়াটি শব্দ শুনে অস্থির হয়ে পড়ে। মুহূর্তে অনেক ব্যাপার ঘটল। শাখাটি ভেঙে কালিদাস ঘোড়ার পিঠে পড়াতেই ভয়ে বন্ধা

বাঁধন ছিঁড়ে ঘোড়াটি দৌড়াতে শুরু করে দিল। এমনি কালিদাস ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে বনে নিখর হয়ে পড়ে রইল। ঘোড়া ছুটছে দেখে উৎকর্ষ হয়ে যুবরাজ ব্যাপার বুঝতে পেরে জল থেকে উঠে এসে চিৎকার করেও লাভ করতে পারল না। নির্জন বন মধ্যে কে শোনে। ঘোড়া দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। নগর পার হয়ে হুঁশ করে দোকানের উপর দিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক দৃষ্টি করে ঘোড়াটি গিয়ে পৌঁছাল কুন্তলরাজের প্রাসাদ দ্বারের সামনে। এমনি দু'জন বলবান রক্ষী ঘোড়াটিকে ধরায় প্রবীণ মন্ত্রী এসে বলে আসুন! মহারাজ আসুন! শুভাগতম! শুভাগতম! আপনি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ। কালিদাস ব্যাপার বুঝে নিরন্তর। সে ভেবে পাচ্ছে না যে সে কী বলবে। মহামন্ত্রী কালিদাসকে রাজকুমারী হৈমবতীর ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে রাজকুমারী সুসজ্জিত ঘরে সখীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সহাস্যালাপ করছিলেন। এমন সময় মহামন্ত্রী কালিদাসকে নিয়ে হাজির। তাকে দেখে সকলে বিস্মিত। রাজকুমারীও বিস্মৃত। এত সৌন্দর্য! এত রূপবাণ যুবরাজ সে কখনো দেখেনি। যাইহোক, মহামন্ত্রী রাজকুমারীকে সচেতন করে দিয়ে বললেন— সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকর বর্মা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করেন। তখন রাজকুমারী বিস্ময়ের ঘোর থেকে মুক্ত হয়ে একে একে তিনটি প্রশ্ন করলেন। তবে এই পর্বে হাসির অবতারণা করতেও লেখক ভুলে যান নি। ‘পদদ্বন্দ্ব’ শব্দ নিয়ে কালিদাসের কৌতূহল অভাবনীয়। কারণ সে গ্রামীণ এত অর্থ বুঝবে কী করে। যাইহোক রাজকুমারীর তিনটি প্রশ্ন যথাক্রমে—

১. জগতে সবচেয়ে শক্তিমান কী?
২. দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে? এবং
৩. পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট কি?

এই তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াতে কিন্তু রাজকুমারী আর্থ নীতি-রীতি মেনেই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মনে করে কালিদাসের গলায় বরমাল্য দেন। সে যে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ নয়, সে যে কালিদাস। মূর্খ, নিরক্ষর, গ্রামীণ তা রাজকুমারী জানেন না। তা দু-একবার কালিদাসের কথায় ও আচরণে প্রমাণিত হলেও কিন্তু রাজকুমারী পরিহাস বলে মনে ভেবেছেন। বলেন সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ বুঝি পরিহাস প্রিয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সুকৌশলে কালিদাসের আচরণে অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। কারণ চরিত্রটির বাস্তবতা রক্ষিত হবে না। উঠ প্রসঙ্গে, রাজপুরীর প্রহর বাজানোর সময় এবং যখন রাজকুমারী শয়ন ঘরে কালিদাসকে নিয়ে তখন কালিদাসের ব্যবহার চরমে ওঠে। শুধুমাত্র কালিদাস যখন রাজকুমারীকে বলে—“ওহো—বুঝেছি, রাত দুপুর হয়েছে। এবার চল, ভেতরে যাই।”<sup>৪৯</sup> শয়ন ঘরের বর্ণনায় কাহিনি চরমে ওঠে। কুলুঙ্গির মধ্যে থরে থরে সাজানো পুথি দেখে কালিদাস বিস্মিত হয়। ভাবে এত পুথি! তার মন আনন্দে ভরে ওঠে। কারণ ভালো জিনিস

দেখলে তার স্বাদ হয় কিছু একটা করতে। কালিদাস ব্যগ্রভরে সকৌতুকে বললে—‘তুমি সব পড়েছ’? হৈমশ্রী তার কথায় সায় দিলেন। কালিদাসের মুখে ল্লান হয়ে গেল। উপন্যাসে উল্লেখ্য শূদ্রকের ‘ম্চ্ছকটিকম্’<sup>১০</sup> নামে যে পুথিটি হাতে নিয়েছিল সেটি রাখতে রাখতে বিষণ্ণ মুখে বলল—  
 “আমি একটিও পড়িনি। যদি পড়তে পারতাম, আজকের চাঁদ কিসের মত সুন্দর নিশ্চয় বলতে পারতাম।”<sup>১১</sup> কুমারী হৈমশ্রী বিবর্ণ মুখে শুষ্ক হৃদয়ে বলে উঠল পরিহাস করবেন না আর্যপুত্র! আপনি তো সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ। কালিদাস কৌতুক সুরে বললে—“কিন্তু আমি তো রাজপুত্র নই! হৈমশ্রীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—রাজপুত্র নয়! তবে— কে আপনি? কালিদাস বলিলেন—আমি কালিদাস—বনের মধ্যে কাঠ কাটছিলাম, এমন সময়— হৈমশ্রী বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিলেন— কাঠ কাটছিলেন! কাঠুরে! তবে তুমি সত্যিই বর্ণ পরিচয়হীন মূর্খ?”<sup>১২</sup>

আর এখানেই উপন্যাসের চরমতম মুহূর্ত। হৈমশ্রী যেন এক মুহূর্তে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যেন মাকাল ফল। বাইরে সুদৃশ্য, ভেতরে ফাঁপা। কালিদাস যেন রাজকুমারী হৈমশ্রীর কাছে তাই। কিন্তু কী হবে! রাজকুমারী কিন্তু ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না।

এমন সময় মকর বর্মার প্রবেশ। শূলে দেব! শূলে দেব! চিৎকার করতে করতে সভায় প্রবেশ। কুস্তল রাজসভায় প্রবেশ করে মহারাজের সামনে চিৎকার করে বলেন—আমিই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকর বর্মা। চোরটা আমার ঘোড়া ও রাজমুকুট পোষাক নিয়ে পালিয়েছে। চুরি করেছে। যুবরাজ নিজের দেশের নামাক্ষিত অঙ্গুরীয় দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে তিনিই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ। কোনো রকম বুঝিয়ে বাঁকে রাতে খাওয়া ও শোয়ার উত্তম বন্দোবস্ত করা হ’ল। কারণ অপরাধী তাঁদের জামাতা। অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছে। এখন কি হবে? মহারাজ কোনো উপায় না পেয়ে মহামন্ত্রীর সঙ্গে গোপন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হয় কালিদাসকে রাজ্যের ত্রিসীমা থেকে বের করে দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গভীর রাতে তাকে রাজ্যের ত্রিসীমার বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের কাহিনি হল কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি ও পুনর্মিলন অংশ।

এরই মাঝখানে সখীদের কৌতূহল, নাচ, গান, রঙ্গ তামাসা, সর্বোপরি রাজকুমারীর সখি মালিনীর কৌতুকহাস্য, সহজ সরল প্রীতিপূর্ণ আচরণ, কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। কবি কালিদাসকে রাজপুরীতে রাণী ভানুমতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাব্যপাঠ, রাজসভায় প্রকাশে কাব্য পাঠ, কালিদাস থেকে মহাকবি কালিদাস হয়ে ওঠা, পরিশেষে বিবাহিত পত্নী হৈমশ্রীর সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরহান্তে মিলন। এই পুনর্মিলন যার জন্য সম্ভব হয়েছে সে কবির মনের মালিনী। মালিনীর প্রসঙ্গে কিন্তু ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের সুগোপা ও কুছ (যদিও কুছ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র),

‘গৌড়মল্লারে’ বাঙ্গুলির চরিত্র মনে এসে যায়। তবে বাঙ্গুলি, মালিনী আর সুগোপা সত্যিই অনবদ্য সৃষ্টি। এই তিনটি নারী চরিত্র অঙ্কনে শরদিন্দু (তথাকথিত রাজকুমারীদের সখি কিংবা ফুলচয়নিকারা) দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই তিনটি নারী যেন আমাদের আকর্ষণ করে শরদিন্দুর উপন্যাস পাঠে। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য ছোটগল্প উপন্যাসেও এরকম বহু চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই—যারা সত্যিই শরদিন্দুর সহানুভূতি কুড়িয়েছে পাঠকের হৃদয় জয় করেছে।

যাইহোক, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ এই উপন্যাসটিকে হয়তো শরদিন্দুর অন্যান্য প্রধান উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট জায়গা দখল করবে এটাই প্রত্যাশিত। উপন্যাসটির মধ্যে আমরা কালিদাসের জীবনকে দু’টি পর্বে ভাগ করেছিলাম। পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পর্ব নিয়ে আলোচনার পর আমরা বলতে পারি, প্রথম পর্বটি কালিদাসের মহাকবি হয়ে ওঠার প্রারম্ভিক পর্ব বা প্রস্তুতি পর্ব। লেখক জানেন কালিদাসকে নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানান কথা ও গালগল্প প্রচলিত। তাই তিনি এভাবেই কালিদাসকে চিত্রিত করেছেন। এতে পাঠকেরও চিত্তশুদ্ধি কালিদাসেরও কবিত্ব প্রাপ্তি। কী অপূর্ব সুন্দর মোহনীয় করে শরদিন্দু দেখালেন কালিদাসের ভবিতব্যে জীবন নাট্যকে সম্ভাব্য অবিশ্বাস্য ঘটনাকে এক ধাক্কায় কবি কল্পনায় বিশ্বাস্য ও সম্ভাব্য করে তুললেন—এখানেই শরদিন্দুর কবিত্বের ও লেখার গুণ।

পুনরায় আমরা ফিরে যাই ‘ম্চ্ছকটিকম্’ লেখক কেন উল্লেখ করলেন তার কারণ সম্বন্ধে। কারণ হিশেবে আমাদের মনে হয়। এক. শরদিন্দু ‘ম্চ্ছকটিকম্’ এর লেখকে কালিদাসের আগে স্থাপন করতে চেয়েছেন কারণ তিনি জানেন শূদ্রক ও কালিদাসের সময়কাল নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই তিনি সংশয়ের সুযোগ গ্রহণ করে এক অপূর্ব উপন্যাস আমাদের উপহার দিলেন। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন আর শূদ্রক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এখানেই যত গোল। লেখকের পক্ষপাতও কিন্তু শূদ্রকের দিকে। কারণ তিনি দেখাচ্ছেন কালিদাস তখনও নিরক্ষর, মূর্খ—বই লিখবে কী প্রকারে। ‘ম্চ্ছকটিকম্’ লেখাটিও পড়তে জানে না। এছাড়াও শূদ্রক যদি কালিদাসের পরের নাট্যকার হন তবে শরদিন্দু কেন কালিদাস পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস বা অশ্বঘোষের নাটকের নাম উল্লেখ করলেন না। শূদ্রকের ‘ম্চ্ছকটিকম্’ নাটকটির ব্যবহার কেন করলেন। সেদিক থেকে আমাদের মনে হয় শরদিন্দু শূদ্রককেই কালিদাসের আগে স্থান দিতে চেয়েছেন। যদিও এটা বিতর্কের বিষয়। প্রাচীনকালের কবিদের জন্ম সাল নিয়ে মতান্তর, মনান্তর ও মতানৈক্য রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দক্ষ আখ্যান নির্মাতা। কেননা, দশ বছর পরে থাকা কাহিনিকেও তিনি একই ধাঁচে, একই রসের আবেদনে রসময় ও রসোস্তীর্ণ করে তোলেন;

উদাহরণ—‘কালের মন্দির’। যাইহোক, সূক্ষ্ম চিন্তানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আখ্যানগুলিতে। আমাদের বক্তব্য হ’ল লেখক পূর্বেই জানিয়েছেন যে, কুন্তল রাজসভায় রাজকুমারী হৈমশ্রীর সয়ংবর সভা হবে। সেখানে চণ্ডাল, পামর, নীচ অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশ নিতে পারবে। পূর্বসূত্র বিশেষে আমরা বলতে পারি—

ক. কালিদাস নিরক্ষর গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষ।

খ. ‘মৃচ্ছকটিকম্’ নাটকটিতেও কিন্তু নাট্যকার শূদ্রক সাধারণ নিম্নবিত্ত উচ্ছৃঙ্খলিত মানুসদের নিয়ে লেখা। অর্থাৎ সেই পটভূমিকে লক্ষ্য রেখেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত নাটকটির নাম উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের মূল কথাবস্তু সঙ্গে বা ফোকলাইসড চরিত্রকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে ‘মৃচ্ছকটিকম্’ নাটকটির ব্যবহার তাঁর কাছে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। যাইহোক, সাহিত্যিক বিতর্ক হয়তো শরদিন্দুর অভিপ্রেত ছিল না। সাহিত্যকে সম্ভাবনাময় করে গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি ও সাহিত্য তাঁর অজানা ছিল না। সেহেতু এ ধরণের প্রশ্ন ওঠাও অহেতুক নয়।

রাজবাড়ীর গণ্ডী পেড়িয়ে কালিদাসের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। হয়তো রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও মহিমাশ্রিত জীবন-যাপন তাঁর মহাকবি হয়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই নাগরিক জীবন ও বিলাসবৈভব পরিত্যাগ্য। কুন্তল রাজ বিক্রমাদিত্যও কিন্তু বারবার আমাদের স্মরণ করাতে চেয়েছেন যে, রাজসভায় বসে বসে কবিতা কাব্য উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট হচ্ছে না। তাই তিনি উপস্থিত কবিদের মাঝে মাঝে ভৎসনা করছেন আবার কখনো কখনো কবিদের হাত থেকে পরিদ্রাণ লাভের জন্য অন্তঃপুরে চলে যাচ্ছেন। এতে প্রমাণিত হয়, রাজাধিরাজ সত্যিই রসিক মানুষ। সাহিত্যিক জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট। সাহিত্য বিচার সম্পর্কেও দক্ষ। তাই তিনিও মনে মনে একজন উন্নত প্রতিভাশালী কবি খুঁজছিলেন। কারণ তিনি কবিদের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। কবিরাতো প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো সৃষ্টিশীল। কিন্তু রাজসভার উপস্থিত কবিবর্গ শুধু তো একঘেঁয়েমি ভাবে রাজসম্মতিতেই আবদ্ধ। তাই মহারাজের কাব্যরসপিপাসার ঘাটতি তাঁকে অশ্বস্তিতে ফেলে। অবশেষে কালিদাসকে পেয়ে কালিদাসের স্বরচিত কাব্যপাঠ শুনে মুগ্ধ হন ও তাকে রাজসভা কবি রূপে মর্যাদা দেন। শরদিন্দুর লক্ষ্য হ’ল প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে কবিদের সমাদর ও মর্যাদা ছিল তার পরিচয় দান করা। মূল কথা হ’ল সুখে কাব্য কবিতা হয় না—কাব্য তৈরি হয় দুঃখে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কালিদাসের জবানীতে তা উল্লেখ করেছেন—“অল্পচিন্তা চমৎকরা কাতরে কবিতা কুতঃ।”<sup>১০</sup>

এই উপন্যাসটির শেষপর্বে লেখক নব দম্পতির বিচ্ছিন্ন জীবনের করুণরূপ ও যন্ত্রণার

চিত্র ঐক্যেছেন। অবশ্য বিচ্ছিন্নতার কারণও বিদ্যমান। রাজকুমারী বিপুল ঐশ্বর্য, বিলাসী জীবন, সখীদাসী পরিবৃত রাজ সুখ, বিদূষী, সাহিত্যানুরাগী বিশেষ করে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মতোই— কথায় বলে বাপকে বেটি, ইত্যাদি উচ্চমাগীয় জীবন তাকে অহঙ্কারী ও অন্ধ করে তুলেছিলো। ফলত মূর্খ কালিদাসকে সে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। তার বেঁধেছে। কোথায় সে আর কোথায় কালিদাস। মূর্খ নিরক্ষর গ্রামীণ! তাকে স্পর্শ করবার সাহস পায় কী করে। ঐশ্বরের দাস্তিকতা ও বিদূষীপণায় সে কালিদাসকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কালিদাসের সুন্দর গৌরবাস্তি সহজ সরল রূপ ও মন তার মন থেকে মুছে যায়নি। এমনকি তার পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যও মনে মনে তাকে খুঁজেছে—কিন্তু পায়নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তার বিয়ের। সে যোগিনীরূপ ধরেছে। পিতার মনেও শাস্তি নেই। আবার রাজকুমারী মনের দুঃখে পুনরায় বিয়েও করবে না। কারণ প্রথমত, সে বিবাহিতা, দ্বিতীয়ত; তার বিবাহের সম্ভবনাও কম তদুপরি প্রজা থেকে শুরু করে রাজপুরবাসীগণ কী তাকে ধীক্কার দেবে না! চিন্তায় উদ্ভিগ্নতায় সে দিন কাটাত। বই পড়তো। একদিন কালিদাস নামাঙ্কিত ‘মেঘদূতম’ নামক একটি পুস্তক হাতে পেয়ে পড়লেন। বিষয় কী অপূর্ব! খুব চমৎকার তার মর্মোপলব্ধি। কিন্তু ভাবছেন কোন কালিদাস? সে কী! না সে কী করে হবে! সে তো মূর্খ। আশার চিহ্ন দেখা গেলেও পরক্ষণেই তা মুছে যায়। পিতা পূর্বেই ঐ বইটি আত্মস্থ করেছে। মেয়ের করুণ দশা দেখে বলে যক্ষের বিরহে যক্ষিণী কি মর্মান্বিত। পিতা পুত্রীতে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা দুর্লভ বিষয় নয়। উল্লেখ্য, গ্রন্থটির বিষয় পরোক্ষ যে হৈমশ্রীকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে তা লেখক সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন।

আসলে লেখকের বক্তব্য এখানে সহজেই অনুমেয় যে, প্রথমত, প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতেও পতি-পত্নীর সম্পর্ক খুবই শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত; পতি পরমশ্রদ্ধার। তৃতীয়ত; একবার স্বামী গ্রহণে অধিকার। চতুর্থত; সেকালে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর মূল্য কম ছিলো ইত্যাদি বিষয় কালিদাস ও হৈমশ্রীর বিয়ের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। সে জন্যই হয়তো উপন্যাসের সমাপ্তিতে দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরহের পরেও লেখক তাদের মধুর মিলন দেখিয়েছেন। ঐশ্বর্য, মর্যাদা, রাজভোগ, বিলাসবৈভব, বিদূষীপণা ও বংশগৌরব নদীর তীরে গিয়ে ঠেকেছে যেখানে কালিদাস পর্নকুটিরে থাকেন। অর্থাৎ ধন সম্পত্তি অহঙ্কার মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রকৃত প্রেমধর্মই মানুষকে পরম তৃপ্তি দেয়। প্রেমই জীবন, অপ্রেমই মৃত্যু। তাই উপন্যাসেও হর-পার্বতীর প্রেম, রতির স্বামীর প্রতি ভালোবাসা সাংকেতিকরূপ পেয়েছে।

এই উপন্যাসে লেখক দাম্পত্য সম্পর্কের তুল্যমূল্য বিচার করেছেন। বলা যায়, হর-পার্বতীর বিবাহ। পতির নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগও কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কের গভীর প্রেমকেই

দ্যোতিত করে। মদনভঙ্গের পর রতির বিলাপ আমাদের সহানুভূতির উদ্বেক করে। অপরাপরপক্ষে কালিদাস-হৈমশ্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক আমাদের ভাবায়, দুঃখ দেয় পরিশেষে প্রশান্তি ও মিলন আমাদের তৃপ্তি দেয়। যাইহোক, তিন জোড়া দাম্পত্য সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে কালিদাস-হৈমশ্রীর মধ্যে শরদিন্দু আসলে ভারতীয় তথা বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কের সম্ভাব্যসূত্র খুঁজতে চেয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন, উচ্চ-নীচ ভাব-ভাবনীয় ফল যে বিষময় তারও সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় আমাদের ভাবায় ও সচেতন করে তোলে। আসলে শরদিন্দুর মানসিক ভাবনার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি সকলস্তরের মানুষকে ভালোবাসেন। তার পরিচয় কিন্তু আমরা আলোচ্য উপন্যাসটিসহ প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই পাই।

এই উপন্যাসটিতে ইতিহাস চেতনার পরিচয় যৎসামান্য। কালিদাসের আমলে স্থাপিত এই কাহিনি। কালিদাস নিঃসন্দেহে ইতিহাসের চরিত্র। তবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে আমরা যা বুঝি, সে অর্থে কালিদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন। বিক্রমাদিত্য ইতিহাসের চরিত্র, সৌরাস্ত্রের রাজকুমার ইতিহাসের ব্যক্তি। হুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ হুণেদের বর্বরতা ও উৎপীড়নও ঐতিহাসিক ঘটনা। তদুপরি, এসব চরিত্র, ঘটনা নামমাত্র। অনৈতিহাসিক গালগল্প ইতিহাসের তুচ্ছ উপাদানগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। আর তাতেই উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠেছে। কারণ ইতিহাসের বাগাডম্বর নেই, যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, নৈরাজ্য, ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠরাস, নারীহরণ—এক কথায় যা যা না থাকলে ইতিহাস মনে হয় না—এই উপন্যাসটি তাই-ই। অভূতপূর্ব অপূর্ব কাহিনির সন্নিবেশে উপন্যাসটি ঋজু ও একরৈখিক দৃঢ় পিনদ্ধ হয়ে উঠেছে। এককথায় সত্যিকারের রস সাহিত্য। এই রকম কাহিনি রচনার দিকেই কিন্তু শরদিন্দুর মানসিক ঝোঁক। কারণ তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেন—রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। এই উপন্যাসটিকে সঠিক মূল্যায়ন করে দেখলে যে কোন রসজ্ঞ সমালোচকই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন বলে আমরা মনে করি। উপন্যাসটি পাঠে আমাদের মনে প্রশান্তির ছোঁয়ায় ভরে ওঠে। ক্লান্ত নয়! ক্লান্ত নয়—এক অদ্ভুত মোহাবেশ আমাদের তাড়া করে। ভুলে যাই মর্মর পৃথিবীর বিষয় আশয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ—শুধুই মনে হয় প্রেম যুগে যুগে। তাই পরিশেষে মিলনোৎকর্ষায় কালিদাস কৌতুকে বলে—“না, না, তুমি রাজার মেয়ে।”<sup>৪৪</sup> পরক্ষণে ভেদাভেদ ভুলে রাজকুমারী বলে—“যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।”<sup>৪৫</sup> লেখকের উদ্দিষ্ট ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক খুব মধুর ও একই সঙ্গে তিক্ততার। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি কিংবা উঁচু-নীচু তফাৎ এই মধুর সম্পর্ক ভেঙে দেয়। ফাঁটল ধরায় পরম প্রেমের সম্পর্কের সুখা সৌধকেও। হিতাহিতজ্ঞান শূন্য করে তোলে ঐশ্বর্যের অহঙ্কার তদুপরি যুগে যুগে দাম্পত্যের প্রীতির সম্পর্ক আমাদেরকে পরম শান্তি ও

তৃপ্তি দেয়। বেঁচে থাকবার রসদ যোগায়। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমাজ ও সাহিত্যে ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবের কবি’ নামক উপন্যাসটি তার প্রমাণ। ভারতীয় সমাজ গড়নে বিয়ের পর স্ত্রীরা স্বামীর বাড়িতেই কাটাবেন এটাই রেওয়াজ। স্বামী-স্ত্রী এক পরিবারে না থাকলে ভারতীয় সমাজ তা মেনে নেয় না। ভারতীয় সমাজে উভয় পরিবারই সমান দোষী। কোনো কারণেই হোক আর অজ্ঞাত কারণেই হোক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ফাটল ধরায় তার পরিবারেরই কোনো কোনো দুষ্টলোক। নষ্টামি যাদের রক্তে মজ্জায়। আর দুই পরিবারের ঐশ্বর্যের ও বংশগরিমার বহরও কিন্তু সমানভাবে দোষী; বলা যায় স্বামী-স্ত্রীর অহমিকা, পারস্পরিক অশ্রদ্ধাও আর একটি কারণ বলে মনে হয় এক্ষেত্রে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনচিত্রকে এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন—তা এককথায় জীবননিষ্ঠ ও জীবন ঘনিষ্ঠ।

আর একটি দিকের কথা আলোচনা না করলে শরদিন্দুর লেখাগুলির সম্পূর্ণতা ধরা পড়ে না। তা হ’ল হাসির উচ্ছ্বাস। হাস্যরসের আবেদনে তাঁর উপন্যাস বলুন আর ছোটগল্প বলুন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক নিদর্শন হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু ব্যক্তিগতভাবেও সদাহাস্যময় সুরসিক মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠুরতা, হতাশা, ক্ষোভ, জিঘাংসা তাঁর কাম্য নয়। প্রেমপূর্ণ রসপূর্ণ আনন্দময় জীবনই তাঁর কাম্য। কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, তুঙ্গভদ্রার তীরে এমনকি আলোচ্য উপন্যাসটিও তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর কথাসাহিত্যে হাসির উপাদান নিয়েও একটি স্বতন্ত্র গবেষণাও হতে পারে। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাগণ যদি একাজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন তাহলে আমরা অন্য এক শরদিন্দুকে পাবো। আলোচ্য উপন্যাস থেকে একটি উদাহরণ চয়ন করে দেখাবো যে তাঁর লেখায় হাসির কি জোর। কি অনাবিল হাসি! এক ধাক্কায় যেন আমরা হাসির রাজ্যে পৌঁছে যাই। যেমন—রাজকুমারী ও কালিদাসের কথোপকথনে—

“কালিদাসের মুখে আর কথা রহিল না। হৈমশ্রীর দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে উঠিয়া কবির বাম স্কন্ধের উপর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে! শিখার পরপারে দিগন্তের অন্তচ্ছটা ক্রমশ মেদুর হইয়া আসিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া কালিদাস সহসা নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন; হৈমশ্রীও তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এক শ্রেণী উষ্ট্র শিখার কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে।

হৈমশ্রী কালিদাসের পানে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, নিরীহ ভাবে প্রশ্ন করিলেন—‘ও কী আর্ঘ্যপুত্র?’

কালিদাসের মুখেও একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি গভীর হইয়া বলিলেন—

‘ওর নাম উষ্ট।’

হৈমশ্রী হাসি চাপিয়া বলিলেন—‘কী—কী নাম বললেন আর্ঘ্যপুত্র?’

কালিদাস তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করিলেন—‘না না, উষ্ট নয়, উষ্ট

নয়-উট্ট!’ উভয়ে একসঙ্গে কলহাস্য করিয়া উঠিলেন।’<sup>১৬</sup>

বসন্ত পূর্ণিমার এক তিথিতে স্বয়ংবর সভায় যে কাহিনি শুরু হয়েছিলো আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিপ্রা নদীর তীরে পর্ণকুটিরে তা শেষ হয়। বসন্ত পূর্ণিমা মিলনের তিনি। উজ্জ্বল জীবনের প্রতীক। হাসিও উজ্জ্বল। উভয়ে যেন পরস্পর ভাব-ব্যঞ্জনার দ্যোতক। যে অন্ধকার কালিদাস-হৈমশ্রীর জীবনে করাল ছায়া ফেলেছিলো পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকে যেন তা দীপ্তিময় হয়ে উঠলো পুনর্বার। এই পুনর্মিলন যেন চিরকালের—শ্বশত দীপ্তিময় মিলন। তাই অনাবিল হাসির ছোঁয়ায় দু’টি বহু প্রতীক্ষিত জীবন কাছাকাছি এসে গেলো। আবার হাসি-ই মানুষের জীবন-দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। হাসি যেন মহৌষধি। তাই যে কারণে রাজকুমারীর সন্দেহ হয়েছিলো কালিদাস মূর্খ ঠিক সেই কথায় পুনরায় স্মৃতিপটে নিয়ে এসে পরস্পর কাছাকাছি এসেছে। অর্থাৎ কালিদাসেরই জয় হয়েছে। তাই সদা রসিক কালিদাস যেন শুধু কুন্তলরাজ কন্যা হৈমশ্রীর হৃদয় জয় করেন নি; চিরকালের মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। আর এখানেই ‘কুমার সম্ভবের কবি’ উপন্যাসটির চরম সার্থকতা। বলা যায়, হরের প্রেম যেমন কৈলাশ থেকে আমাদের আম বাগানে এসেছে তেমনি কালিদাসের প্রেম (রাজকুমারী হৈমশ্রী) রাজপ্রসাদের সীমানা পেড়িয়ে নদীর তীরে পর্ণকুটিরে নেমে এসেছে।

সুতরাং সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, প্রেম কখনো ধনী ধন ও মানীর মান দেখে হয় না। প্রেম হয় দু’টি হৃদয়ের পরস্পর মিলনের সদিচ্ছার ওপর। সেখানে বিষয়-আশয় তুচ্ছ। কথায় বলে—যদি বা মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। অর্থাৎ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসটিতে এই দর্শন ভাবনারই পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন—যা শুধু এ কালের নয়—চিরকালের।

উপন্যাস মানুষের জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে। মানুষের জীবনকে নিয়ে যেহেতু উপন্যাসের কারবার সেহেতু মানুষের অন্তঃচেতনার অনন্যসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের জীবন চলে মূলত দু’টি খাতে। একটি সদর্থক খাত অন্যটি নওর্থক। বলা যায়, বিপ্রতীপতাই মানুষের ধর্ম। একই সঙ্গে একজন মানুষ শুভবুদ্ধি ও অশুভবুদ্ধি লালন করে; বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব দোলাচলতায় জীবনকে সঠিক পথে চালাতে অসক্ষম হয়ে ওঠে। এমনকি পরিণতিতে মৃত্যুও ঘটে। স্নেহে-অস্নেহে, প্রেম-প্রতারণায়, শ্রদ্ধা-

অশ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতা-কৃতঘ্নতায় মানুষের জীবন প্রবাহিত হয়। উপরোক্ত প্রবৃত্তিগুলি মানবীয় হোক আর অমানবিক হোক—তা কিন্তু অনিত্য। শেষ নেই। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত সমানতালে বয়ে চলেছে। তবে প্রাচীন মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিকযুগে মানুষ আরও বেশী প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে উঠেছে। মূল্যবোধের অভাব সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে। আধুনিক প্রযুক্তির দিনে মানুষকে আরও বেশী বেশী করে প্রতারিত ও চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এক মিনিটে সারা বিশ্বে একসঙ্গে কত মানুষ যে প্রতারণা চক্রের শিকার হচ্ছে তার ইয়াক্তা নেই। মানুষের মন বিচিত্র, মানুষের প্রবৃত্তিও বিচিত্র। তবে আধুনিক যুগ বলুন আর উত্তর আধুনিক যুগ বলুন যড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ধরণটা কিন্তু পাল্টে গেছে। সাধু সেজে অসাধু কাজ। হিংসা, লোভ, বর্বরতা, ক্ষমতা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় রক্তের সম্পর্কের কথা। এমনকি পরিবারের পিতা-মাতা, দাদা-ভাই প্রমুখ পারিবারিক সম্পর্কের কথা। হিংসা, লোভ, বর্বরতা ইত্যাদি যেখানে পরিবারে নেমে এসেছে সেখানে বহিরাগত কুটচক্র, যড়যন্ত্র, ক্ষমতা বিস্তার, জিঘাংসা অবশ্যস্তাবীরূপে স্বীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করবে—সেটাই প্রত্যাশিত। বলতে দ্বিধা নেই যে, এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদানের সমন্বয়ে রচিত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সচেতন ভাবে ইতিহাসের মানুষগুলিকে বর্তমানের পটভূমিকায় স্থিত করে তাদের জীবনের কত ঘাত-প্রতিঘাত, কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের মহিমময় কাহিনি, কত গণহত্যা-রক্তপাত, বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বন্দ্বিকতা, দ্বন্দ্বমথিত প্রেম, কৌতুক-কৌতূহল ও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের ইতিবৃত্ত বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করেছেন।

ইতিহাসের উপাদান কীভাবে উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে, কীভাবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করবার পূর্বে আলোচনা করা জরুরি যে, কোন সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসটিতে সন্নিবেশিত করেছেন তার পর্যালোচনা করা। প্রসঙ্গত, এই অধ্যায়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘কালের মন্দির’, ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ ও ‘কুমারসম্ভবের কবি’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতেও ইতিহাসের উপাদান কী উপায়ে ব্যবহৃত পুনর্নির্মিত করা হয়েছে সে বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির আলোচনাতেও আমরা সেই ইতিহাসের ব্যবহার ও পুনর্নির্মাণের কাজটি কীভাবে লেখক করেছেন সেই দিকে নজর দেব। ইতিহাসের উপাদান ও ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য সম্পর্কে লেখকের মস্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

“এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell -এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাছলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell-এর গ্রন্থখানি

৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনাকাল খৃ ১৪৩০-এর আশে পাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।

অনেকের ধারণা পোর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খৃ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, সুলতান ইলতুমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবরশাহ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কল্পনা নয়। তবে বাবরশাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয় নাই।

দেশ-মান সম্বন্ধে সেকালে নানা মুনির নানামত দেখা যায়। চাণক্য এক কথা বলেন, অমরসিংহ অন্য কথা। আমি মোটামুটি ৬ ফুটে ১ দণ্ড, ২০ গজে ১ রজ্জু এবং ২ মাইলে ১ ক্রোশ ধরিয়াছি।”<sup>৫৭</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে, তাঁর রচিত উপন্যাসটিতে ইতিহাসের উপাদান ও চরিত্র থাকলেও কাহিনীটি মৌলিক। বাস্তবিকই উপন্যাসটি পাঠে আমরাও তা অনুধাবন করেছি। শুধু তাই নয়, তাঁর রচিত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ইতিহাস এখানে কখনো কখনো নামমাত্র ব্যবহৃত হলেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ইতিহাস প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও ইতিহাস লেখেন নি; লিখেছেন উপন্যাস। উপন্যাসের আকারে প্রকরণে (Technique) যদি না লিখতেন তাহলে হয়তো এই বইগুলি খাঁটি ইতিহাসের অসামান্য প্রামাণিক দলিল হয়ে যেত। যেভাবে ইতিহাসকে তিনি ইতিহাসের সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও যাচাই করে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর ঐতিহাসিক মননশীলতার ছাপ বর্তমান। বইগুলিও ইতিহাসের সংঘটনায় (Phenomenon) প্রোজ্জ্বল। ইতিহাসের বাতাবরণ, স্থান-কাল-পাত্র, চরিত্র, সমাজ, রীতিনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, রাজদণ্ডনীতি সমস্তই যেন ঐতিহাসিক যুগের। দূর-দূরান্তরের, অতীত স্মৃতির পূর্ণ স্বচ্ছ ছবি যেন ধরা পড়ে তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলিতে। চকিতে অতীত যুগচিত্র হঠাৎ আলোর বলকানি দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। মোহ ধরায়, মায়াময় পরিবেশে নিয়ে যায়। এক নিমেষে যেন আমরা হাজির হই শত সহস্র সহস্র বছর পূর্বের মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যন্তর ও অধিমানসিক মনভূমিতে। লেখক তাই ইতিহাসের মায়াকে ছাড়তে পারেননি। তবুও তিনি বার বার আমাদের স্মরণ করতে চান— “আমার কাহিনী Fictionised

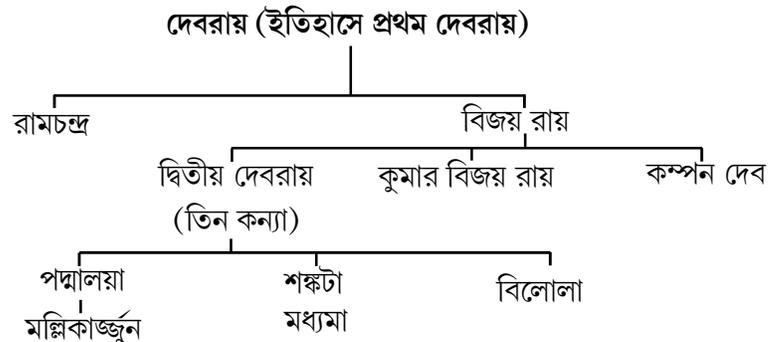
history নয়, Historical fiction.”<sup>৬৮</sup> লেখকের এই পূর্বধারণার (Assumption) সূত্রে আমরা এই উপন্যাসটিকে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাসের নিরিখে বিচার ও বিশ্লেষণ করবো।

উপন্যাসের প্রথমপর্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক ঐতিহাসিক সত্যতার কথা জানিয়েছেন—

“সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুদ্ধ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাদের জীবন কথা অতি বিচিত্র। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলক দুই ভ্রাতার অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাদের জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গুণী ও কর্মকুশল হিন্দু পাইলেই মুসলমান রাজারা তাঁহাদের বলপূর্বক মুসলমান করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু হরিহর ও বুদ্ধ বেশিদিন মুসলমান রহিলেন না। তাহারা পলাইয়া আসিয়া শৃঙ্গেরি শঙ্কর মঠের এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসীর নাম বিদ্যারণ্য, তিনি তাঁহাদের হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করিলেন। তারপর দুই ভাই মিলিয়া গুরুর সাহায্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয়।”<sup>৬৯</sup>

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যখন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় কৃষ্ণা নদীর উত্তর দিকে শক্তিশালী একজন মুসলমান দিল্লীর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এক স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্যের প্রবর্তন করেছিলেন। রাজ্যটির নাম হল ‘বহমনী রাজ্য’। পরবর্তীকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে প্রায়শই বিবাদ-সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। বহমনী রাজ্যের প্রবণতা হল কৃষ্ণার দক্ষিণতীরস্থ ভূভাগে সাম্রাজ্য বিস্তার। আবার পক্ষান্তরে বিজয়নগরের প্রতিজ্ঞা হল কৃষ্ণার দক্ষিণে যখন মুসলমানদের কোনো দিনও ঢুকতে দেবে না।

যাইহোক, রাজ্য প্রতিষ্ঠার আনুমানিক একশতবর্ষ পরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যিনি রাজা হলেন তাঁর নাম দেবরায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইনিই প্রথম দেব রায় নামে পরিচিত। অসাধারণ রাজ্য শাসক, প্রশাসনিক দক্ষতা ও রণনৈপুণ্যে ছিল তাঁর। তাঁর রাজত্বকালের পঞ্চাশ বছরে মুসলমান প্রবেশ করতে পারে নি। উপন্যাসে প্রাপ্ত তাঁর বংশতালিকা নিম্নে সরণীর সাহায্যে দেখানো হ’ল—



এছাড়াও অনেগুন্দি দুর্গ, পারসিক দূত, আহমেদ শাহ, বিদ্যারণ্য, সঙ্গম বংশ প্রভৃতি ঐতিহাসিক অনুসঙ্গ। উপরোক্ত রাজ পরিবারকে নিয়েই কিন্তু শরদিন্দুর এই উপন্যাসের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আমরা এই সঙ্গম বংশ সম্পর্কে যা জানতে পারি তা নিম্নরূপ— দিল্লীর সুলতানী যুগে বিশেষ করে মহম্মদ-বিন-তুঘ লকরে রাজত্বের শেষ দিকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। চরম নৈরাজ্য ও শান্তিভঙ্গের কারণে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা হয় পূর্বভারতের বাংলাদেশে। ঠিক একই সময়ে বিজয়নগর ও বহমনী নামে দু’টি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয় দক্ষিণ ভারতে। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময়সীমা আনুমানিক তিন’শো বছরেরও বেশি।

বিজয়নগর সম্পর্কে জানতে মূলতঃ তিন ধরনের উপাদানের ওপর আশ্রয় নিতে হয়। যেমন—ক. ‘রাজকলা নির্ণয়’ ও ‘বিদ্যারণ্য কলাজ্ঞান’, ‘মাদুরাবিজয়ম্’ (গঙ্গাদেবী), ‘গঙ্গাদাস প্রলাপ বিলাসম্’ (গঙ্গাধর রচিত নাটক)। খ. বিদেশী পর্যটক। যেমন—ইবন বতুতা (আফ্রিকা), নিকোলাকন্টি (ইতালীয়), আবদুর রজ্জাক (পারসিক), ডোমিনগোস পায়োজ (পর্তুগীজ) এবং ফেরিস্তা ও তাবাতাবা (মুসলমান) প্রমুখ। গ. প্রথম হরিহরের বাগেশ্বরী তাম্রশাসন, দ্বিতীয় দেবরায়ের শ্রীরঙ্গমপট্ট, রাজা ইমাদী নরসিংহের দেবলশ্রী পট্ট ইত্যাদি।

এছাড়াও Robert Sewell মনে করেন—১. এই সব কাহিনি ও জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে মোটামুটি বলা যায় যে, সঙ্গম নামে জনৈক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুদ্ধই ছিলেন প্রধান। বলা হয় যে, মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মাধববিদ্যারণ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর ভাই বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য তাঁদের একটি হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।<sup>১০</sup> এছাড়াও আরও বহু প্রচলিত কিংবদন্তী পাওয়া যায়। ইতিহাস কৌতূহলী পাঠক পাঠিকাগণ ইতিহাসের পাতায় তা বিস্তারিত জানতে পারবেন। কারণ আমাদের বিষয় ইতিহাস বর্ণনা করা নয় ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যাখ্যা করা। যাইহোক, এবারে আমরা সঙ্গম বংশের বংশতালিকা পরিচয় উল্লেখ করবার পূর্বে বিজয়নগর রাজ্যে তিন শতাধিক সময় পর্বে যে চারটি (১৩৩৬-১৬২৭) রাজবংশ রাজত্ব কয়েম করেছিলেন তার পরিচয় তুলে ধরবো—

১. সঙ্গম বংশ (১৩৩৬-১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)
২. সালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ)
৩. তুলুভ বংশ (১৫০৫-১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ)
৪. আরবিডু বংশ (১৫৭০-১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ)।<sup>১১</sup>

হরিহর ও বুদ্ধ ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের পিতা সঙ্গম এর নামানুসারে তাঁদের বংশের নাম হয় ‘সঙ্গম বংশ’।



লক্ষণীয় ঔপন্যাসিক বিজয়নগরে স্থিত দু’জন ভাষ্যকরের মধ্যে যেমন সায়নাচার্য কথা যেমন উল্লেখ করেননি ঠিক তেমনি আরো অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে উপন্যাসে স্থান দেন নি। কিন্তু ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ছব্ব বর্ণনা দেন নি। কিছুটা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে ইতিহাস উপন্যাস পাঠকের সামনে তুলে আনতে চেয়েছেন। সর্বোপরি ইতিহাসের উপাদান থাকা সত্ত্বেও লেখক আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনিকে মৌলিক বলে দাবী করেছেন। ইতিহাস প্রসঙ্গ অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তবুও লেখকের মনোগত কল্পনা ইতিহাসকে ছাপিয়ে গেছে। বলা যায়, ইতিহাস আর কবি কল্পনার পারস্পরিক সংমিশ্রণে একটি অপূর্ব ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। লক্ষণীয় ইতিহাস কাহিনির প্রসারক আর কল্পিত কাহিনি উপন্যাসের সম্পূরক। স্পষ্টত, ইতিহাসের নিরিখে বিজয়নগরস্থিত মানুষগুলির সামগ্রিক জীবনের অনুপুঙ্খ জীবনচর্চা ও চর্যার বৈচিত্র্যময় ছবি অঙ্কিত হয়েছে। ‘তুঙ্গ ভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির অন্তর্ভরণে অন্ততঃ আমাদের চোখে তাহ-ই ধরা পড়ে।

‘জীবন এত জটিল কেন?’<sup>৬২</sup> আলোচ্য উপন্যাসটির মূল সুর হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে উল্লিখিত প্রশ্নটির যথাযথ উত্তরে। এককথায় এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসটিতে অঙ্কিত কাহিনি, চরিত্র ও ঘটনাবলীর মনোজগতের অন্তস্থলে ঢুকে উদ্ধৃত প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করা যেতে পারে। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও একবার দার্শনিক উপলব্ধিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ‘কবি’ উপন্যাসে প্রশ্ন তুলেছিলেন—‘হায়! জীবন এত ছোট কেনে?’<sup>৬৩</sup> যদিও দু’টি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা তবু যেন কোথাও একটা গভীর সাযুজ্য চোখে পড়ে। নিতাই কবিরাজ জগৎ-জীবনের কঠিন বাস্তব রূপ দেখে, সম্পর্কের পূর্ণতা-অপূর্ণতা দেখে ও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ব গেয়ে ওঠে—

“এই খেদ আমার মনে—

ভালোবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে

হায়! জীবন এত ছোট কেনে—?

এ ভুবনে ?”

জীবন জটিল জালে আবর্ত হতে হতে একদিন ছোট হয়ে আসে। ফুরায় জীবনের সব লেন দেন। মহাকাল টেনে নিয়ে যায় দিগন্তের সীমা পেড়িয়ে। থাকে শুধু স্মৃতি। যে জীবনে স্মৃতি নেই সে জীবন অচল অসার। তাই কবিয়াল যে জীবন চক্রে আবর্তিত হতে হতে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে জীবনকে ভালো ভাবে চিনতে শিখেছে, জানতে শিখেছে ঠিক তেমনি আলোচ্য উপন্যাসের কলিঙ্গ রাজকুমারী মহারাজ ভানুদেবের সুশ্রী কন্যা ভেবেছে—‘জীবন এত জটিল কেন?’ কারণ উর্মিমুখর জীবন ঘুরপাক খেতে খেতে জটিল আবর্তে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যে গিয়ে পড়বে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। কোথায় যে এর শেষ। কারণ, মানুষ চায় এক হয় আর! সমস্তই যেন অদৃষ্টের অদৃশ্য খেলা। স্বাভাবিকভাবে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে ‘জীবন এত জটিল কেন?’। আমরা আরো একটু বিস্তারিত ভাবে উপন্যাসটির কাহিনি তুলে ধরতে চাই যে, উপন্যাসটি মূলত শুরু হয়েছে হিন্দু রাজ্য ও মুসলমান রাজ্যের পরস্পর বৈরিতা, দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, কপটতা সাম্রাজ্য বিস্তার, গুপ্তহত্যা, পররাষ্ট্র দখল এমনকি কালেভদ্রে স্বজাতীয় রাজাদের সিংহাসন দখল, আক্রমণ অনৈতিক কার্যাবলীর বিবরণ দিয়ে। লক্ষণীয়, বিজয়নগরের মহারাজা দেবরায় রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতিবেশী সমস্ত হিন্দু রাজাদের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য দূত পাঠায়। সম্মতি দিলে ভালো নচেৎ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কলিঙ্গরাজ ভানুদেব কিন্তু বিয়েতে রাজি হয়নি। তাই তার বিরুদ্ধে দেবরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ভানুদেব কন্যাকে দেবরায়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয় এবং বশ্যতা স্বীকার করে। পূর্বশর্তমত দেবরায় কিন্তু কলিঙ্গ রাজ্য গিয়ে বিয়ে করতে পারবেন না ভানুদেবকেই তার কন্যাকে বিজয়নগরে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। সেই মোতাবেক মহারাজ রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণাকে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে নৌযাত্রায় পাঠাবেন। সমস্ত ব্যবস্থা করে মাতুল চিপটিকমূর্তিকে অভিভাবক করে আরও কয়েকজনসহ দাস-দাসী যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। তারা রহনাও দেয়। বহুদিনের পথ। তিনটি নৌযান নিয়ে কৃষ্ণগর বক্ষে চেপে তারা চলেছে বিজয়নগরের দিকে। জলপথে অনেক হাস্য পরিহাস, বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে গান বাজনা, মস্করা, খাওয়া-দাওয়ায় তাদের দিন কাটে। এমন সময় মাঝ নদীতে একজন মানুষকে ভেসে আসতে দেখে। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখে। শেষে বলরাম কর্মকার জলে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। আমরা বলরামের পরিচয় পরে দেবো। নিমজ্জিত

মানুটিকে সুস্থ করে তোলার পর নৌকায় নিয়ে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে চায়। জলে নিমজ্জিত মানুষটি পরিচয় দেয় যে, তার নাম অর্জুন বর্মা। এদিকে চারিদিকে গুপ্তচরের ভয়। রাজকুমারি দ্বয়ের মামা চিপটিক মূর্তি অর্জুনকে ডেকে পাঠিয়েছে অন্য নৌকায়। সেখানে তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি স্লেচ্ছ? মুসলমান? অর্জুন গম্ভীর স্বরে বলে না আমি ক্ষত্রিয় হিন্দু। সেকালে গা শুঁকে দেখবার রীতি ছিলো। তার গা শুঁকে দেখা হয় রসুন পেঁয়াজের গন্ধ যে, তার নেই সব জলে ধুয়ে গেছে। এবার তাকে প্রশ্ন করে অর্জুন কে ছিলো? সে বলে, পাণ্ডব। পাণ্ডবের বাবার নাম কিভাবে এল? উত্তর এল দেবরাজ ইন্দ্র, সে কিন্তু ভেবেছিলো পাণ্ডু। যাইহোক, তার দিক মনোমত উত্তর না হওয়াতে তাকে বেঁধে রাখতে বলায় বলরাম এসে বলে সে তো ঠিকই বলেছে। বেঁধে রাখতে হলে তোমাকেই বেঁধে রাখা উচিত। সেদিন থেকে অর্জুনের আর কোনো সমস্যা নেই। বলরামের সঙ্গে নানান কথা বলে। বলরাম পরিচয় দেয়, সে বর্ধমানের বাঙালি। সেখানে মুসলমানদের অত্যাচারে পালিয়ে এসেছে। এমনকি তার বউটাকেও স্লেচ্ছরা ধরে নিয়ে গেছে বলে তার দুঃখ। তাই কোথায় হিন্দু রাজা রয়েছে তার আশ্রয় পেতে কলিঙ্গ দরবারে এসেছিলো। নৌকায় জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীও তারা শোনে এবং গানও ধরে। বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা উভয়েই হাস্যমস্করায় থাকে। মণিকঙ্কণা চঞ্চলা। কোনো কিছুতেই সে খারাপ পায় না। অন্য দিকে বিদ্যুন্মালা গম্ভীর প্রকৃতির। সে ভাবে চিন্তা করে। মাঝে মাঝে মন্দোদরীর সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মন দেয় আবার পরস্পরে নানান চিন্তা করে। ভাবে মেয়েরা কখনোই তো বরের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে না। এ কেমন রীতি। মেয়েরা কি পুরুষের সম্পত্তি? এ কেমন রাজনৈতিক খেলা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। ‘ঘরের মেয়েরা কি এর জন্য দায়ী? মণিকঙ্কণার কিন্তু এসবেতে মন নেই। সে ভাবে রাজার তিনটি বউ রয়েছে। তারা কেমন! রাজা কেমন। বিদ্যুন্মালা বলে তুই চতুর্থী হবে। মণিকঙ্কণা ভাবে যদি আমাকে রাজা তাঁর চরণতলে একটু স্থানও দেন তবুও আমি থাকবো। বিদ্যুন্মালা ভাবে জীবন কেন এত জটিল? পাকে পাকে গ্রস্থি! এই গ্রস্থি কবে খুলবে? ওদিকে রাজা দেব রায়ও পঁয়ত্রিশ বছরের সুদর্শন পুরুষ, তেজ বীরত্ব প্রসাশনিক দক্ষতা সবেতেই দক্ষ নিপুণ। তাঁর পিতা দুই ভাই তিন রাণী ও পুত্র মল্লিকার্জুন রয়েছে। কুমারিদের আসবার খবর পেয়ে ভাই কুমার কম্পনদেবকে পাঠিয়েছেন অতিথিদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসতে। মহারাজের আদেশ মতো সে ঘাটে যায়। প্রথমেই দেখতে পায় অপূর্ব রমণীয় কান্তি উচ্ছল যৌবনা মণিকঙ্কণাকে তারপরে তার চোখে পড়ে আরো স্নিগ্ধ, অপূর্বমাধুর্য, পেলবকমণীয় সুন্দর যৌবনে ভরপুর বিদ্যুন্মালার ওপর। দেখে তার লোভ হয়। সে কপট ধূর্ত, লোভী কামাসক্ত। এর পরিচয় শেষে আমরা উদ্ঘাটন করবো। যখন কুমারিদ্বয় ও অন্যান্য যাত্রীরা সকলে ঘাটের কাছে আসবে ঠিক ঐ সময় সহসা প্রবলবেগে ঝড়

বয়ে গেল, বিরাট প্রকাণ্ড ঝড়! মনে হয় যেন এখনকার ভাষায় হারিকেন বা টর্নেডো! সব লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। মুহূর্তে মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। জলোচ্ছ্বাস! ধূলো ইত্যাদি। নদীর জলে চিপটিক মূর্তি ও মন্দোদরী ভেসে যেতে লাগলো। চিপটিক মূর্তি মন্দোদরীর পা জড়িয়ে ধরে জলের তলে জল খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে। মন্দোদরী ওড়্রদেশের হস্তীর মতো মোটা মেয়ে মানুষ। সে কিন্তু ডুবল না। শেষে তারা দু'জনে একে বারে সকলের নজরের বাইরেই চলে গেল। তারা আর ফিরে এল না নৌকায়। অন্যকূলে ভেসে গেল—একটা তীরে পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা তুলে এনে তাদের ধরে নিয়ে গেল। সম্পর্কে মামা ভাগ্নে। যেহেতু রাজ মাতুল। কিন্তু গ্রামের লোকের ভয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে জীবন কাটাতে হলো। মন্দোদরীও বেশ মজাই পেয়েছিলো। চিপটিক মূর্তির ভাগিনীদের কথা মনে হলেও মন্দোদরী প্রেমে স্ত্রী সুখে তাকে ভুলিয়ে রাখতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত লেখকের কথায় মন্দোদরীর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চিপটিক মূর্তির এই নিদারণ দশার কারণ হ'ল—মন্দোদরীর গৃহে না ফেরার মতলবে তাকে সেখানেই থাকতে হলো সারাটা জীবন। হায়! রে চিপটিক মূর্তি। নারীর মনের কথা কে বোঝে? নৌকা ফিরে যাচ্ছে দেখেও তাকে খবর দেয় নি পাছে তুই চলে যাস। দেশের বাড়ি ফিরে গেলে যে তাকে স্বামী হিসেবে পাবে না এটা বুঝিস না। এভাবেই নারী মনস্তত্ত্বের দিকটির প্রতিও লেখকের নজর এড়ায় নি।

যাইহোক, এবার ফিরে আসা যাক, কুমারি বিদ্যুন্মালার কথায়। বিদ্যুন্মালাও ঝড়ের মধ্যে পড়ে নীদর জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় কোনো রকমে দেখতে পেয়ে অর্জুন বর্মা নদীর জলে ঝাঁপ দেয় কুমারিকে বাঁচাতে। শেষে দু'জনে ভাসতে ভাসতে নদীর মধ্যে একটি দ্বীপে গিয়ে ওঠে। কুমারি হতজ্ঞান, বাকরুদ্ধ। শুধু ভাবছে কেউ একজন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আলুথালু বেশ। পরনে শাড়ি আলগা, চুল আলুলায়িত, মুখ বিবর্ণ অর্থাৎ তার কোনো হুঁশ নেই। অর্জুনবর্মা তাকে মধ্যরাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখে। গভীর রাতে কুমারির ক্লাস্তি দূর হলে জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে ওখানে কেন তা জানতে চায়। অর্জুন সমস্ত বৃত্তান্তই বলে। শেষে কুমারি বলে তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো! আর সকলে কোথায় জানতে চায়। নৌকাগুলি কি জলে ডুবে গেছে? অর্জুন বলে সকলে ঠিক আছে, নৌকাও ডুবে নি। যাইহোক, দু'জনে নির্জনে নিভূতে নিশুথী রাতে দু'জনের ব্যবধান স্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার কথা। কুমারি এবার চোখ খুলে আকাশের পানে চায়। কত তারা। জিজ্ঞেস করে রাত কত বাকি। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর বলে আচ্ছা এবার তোমার পরিচয় দাও। অর্জুন ইতস্তত করে নিজের পরিচয় দেয় পিতার নাম রাম বর্মা। তারা যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়। তার পূর্বপুরুষ বহু শতাব্দী আগে উত্তরদেশ থেকে এসে

কৃষ্ণ নদীর তীরে বসবাস করতে শুরু করে। উত্তরদেশে যবনের আবির্ভাবে মানুষের দুঃখের অবসানের কথাও জানায় সে। দক্ষিণাত্যেও যবনের অত্যাচারে তারা বিধ্বস্ত হয়েছে। আমরা এই কাহিনি আগেও উল্লেখ করেছি। তাই সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল। অর্থাৎ মুসলমান শাসকের অত্যাচারে তারা কিন্তু ভীত ছিলো সর্বদাই। তারা যে বহমনী রাজ্যের রাজধানী গুলবর্গায় থাকে সেখানেও যবনদের, শ্লেচ্ছ মুসলমানদের ভয়ে অনেক হিন্দু মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। অনেককে তারা ধরে ধরে গো-মাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়েছে। ধর্মান্তর করেছে শাসনে ও পীড়নে। শ্লেচ্ছ মুসলমানরা খুব চতুর। প্রতিভা সম্পন্ন দক্ষ হিন্দুদের ধরে ধরে গো মাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়ে তাদের সুবিধার্থে কাজে লাগায়। একদিন তাদের কাছেও খবর এলো তাদের গো-মাংস খাইয়ে মুসলমান বানাবে। তার বাবা বয়স্ক হওয়ায় তাকে বলে বাবা তুই হিন্দু রাজ্যে চলে যা না হলে রক্ষা নেই। অর্জুন কিন্তু আসতে চায় নি। শেষে বারংবার পীড়াপীড়িতে সে বাড়ি থেকে পালায়। ঠিক ঐ সময় শ্লেচ্ছরা আসে। সে দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্লেচ্ছ তার পেছনে পেছনে দৌড়ালেও তাকে আর দেখতে পায় নি। কিন্তু তার পিতার যে কি হলো তা আর সেই মুহূর্তে সে জানতে পায়নি। পরে যদিও সে জানতে পায় তার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গেছে। পরে অনশনে তার বাবা মারা যায়। কথাগুলো শুনে রাজকুমারির হৃদয় কিন্তু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিছুটা হলেও অনুরাগের সুর কুমারির হৃদয়ে বেজে উঠেছিলো সেদিন। অর্জুনের স্পর্শের কথা সে ভাবে। আর ভাবে মহারাজ দেবরায়ের কথা। মণিকঙ্কণর সঙ্গে দেবরায় প্রসঙ্গে তার দ্বিমতেরই কথা ধরা পড়ে। কেননা দেবরায় তিন জন রাণীর স্বামী। কেউ ভাগ দেয় চায় না। দিতেও পারে না। কোনো কোনো নারী আবার স্বামীকে ভাগ বাঁটোয়ারার পক্ষে অত্যন্ত কঠোর। বিদ্যুন্মালাও তাদের দলে। হোক না রাজা মহারাজ। এতগুলো রাণী! সে মেনে নিতে পারে না। বলে শ্রীরামচন্দ্র ও তো রাজা ছিলেন। তাঁর তো শুধু সীতা ছাড়া কেউ নেই। মণি বলে তোর ত্রেতাযুগের কথা। এখনকি তা বললে হয়। মণিকঙ্কণা চঞ্চলা এগুলোতে তার নজর নেই। মহারাজকে সে পাবে না জানে কিন্তু মনে আশাও রয়েছে। শেষে যদিও তারই ভাগ্যে মহারাজ জোটে। তবে শরীর বদলায় না নাম বদলায়। নাম বদল করে তার মহারাজের সঙ্গে বিয়ে হয়। ছিলো মণিকঙ্কণা হয়ে গেলো বিদ্যুন্মালা। ছিলো বিদ্যুন্মালা হল মণিকঙ্কণা। হায়! রে নিয়তি। পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের ভাগ্যে নিয়তি কোনো না কোনো ভাবে ভর করে। পাল্টে দেয় তাদের জীবনে চলার পথ ও মত। এভাবেই মানুষকে চলতে হয় এমনকি চলতে বাধ্যও হতে হয়। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় চরিত্রদের ভাগ্যে নির্মম নিয়তির অমোঘ বাণ নেমে এসেছে এখানেও যেন তাই-ই হ'ল।

যাইহোক, সকালে কম্পনদেব ঘাটে ফিরে এসে দূরে দু'জন মানুষকে তীরে পড়ে থাকতে দেখে। ক'জন রক্ষীকে নিয়ে গিয়ে দেখে কুমারির পাশে একজন যুবক পড়ে রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়। কম্পনদেবের ডাকে সে জাগে। অর্জুন বর্মা ঘুমের ঘোরে নাম শুনতে পেয়ে জাগে। তখন সকলে রাজপ্রাসাদের দিকে চললো। সঙ্গে নেই শুধু চিপিটক মূর্তি ও মন্দোদরী। তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো সকলে। যাইহোক পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, কম্পনদেব কামার্ত লোভী পরুষ। একদিকে নারী অন্যদিকে সাম্রাজ্য। মুখে হাসি অন্তরে কটু। ছলে বলে সে এই দু'জন কুমারকে পেতে চায়। তাই ফন্দি করে। মহারাজ দেবরায়কে বলে অর্জুনবর্মার সঙ্গে বিদ্যুন্মালা রাত কাটিয়েছে। তার স্পর্শ লেগেছে। এ মেয়েকে বিয়ে না করাই শ্রেয়। যাইহোক, কন্যেযাত্রীদের থাকবার খাওয়ার সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা নিমেষে হয়ে গেলো। রাতে মহারাজ দেবরায় মন্ত্রি ধন্যায়ক লক্ষ্মণ মল্লপকে ডাকলেন। মন্ত্রণা করলেন। শেষে রাজগুরু কূর্মদেবকে রাজার প্রণাম পাঠানো হলো। তিনি এলেন। স্পর্শদোষ। বিবাহযোগ্য কন্যার পরপুরুষের স্পর্শদোষ। তাই তাকে তিন মাস ব্রত করতে হবে। পম্পপতির মন্দির প্রত্যহ উষায় পূজো দিতে হবে। আমরা আর একটা কথা এখানে একটু বলি, অর্জুন যখন ভাসতে ভাসতে আসছিলো তার হাতে দু'টো বাঁশের লাঠি ছিলো। লাঠি দুটো তার অস্ত্র স্বরূপ। এই অস্ত্রে ভর করে সে ছুটন্ত ঘোড়ার থেকেও বেশী ছোটে। যাইহোক, কুমারির একটু স্বাদ হলো। এবার অর্জুনকে ডেকে পাঠানো হ'লো অর্জুন লাঠি হাতে এসে উপস্থিত। কিন্তু মহারাজার ঘরে কোনো রকম লাঠি অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। মহারাজা এবং মহামন্ত্রি দু'জনেই অর্জুন বর্মার পরিচয় নিলেন। দু'জনেই প্রশ্ন করলেন। অর্জুন সমস্ত বৃত্তান্ত বললে। মহারাজা কিন্তু খুশিই হলেন। যাইহোক, অর্জুনকে অতিথি শালায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু তার পিছনে রাজার গুপ্তচর লাগানো হ'ল। সেটাই রাজকীয় নিয়ম। এদিকে রাজঅন্তঃপুরে রাজার বিলাস ব্যসন, খাওয়া দাওয়া রাণীদের সেবা ইত্যাদি দাসী পিঙ্গলার যত্নে সবই স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকলো। নৃত্যগীত, খাদ্যবস্তু, ভোজন প্রণালী, বিভিন্ন রন্ধন প্রণালী, রাণীদের সঙ্গে মণিকঙ্কণার পরিচয়। ছোটো রাণীর পুতুল পুতুল খেলা, রাজকার্য চলা, কম্পনদেবের গৃহ নির্মাণ, পররাষ্ট্র থেকে গুপ্তচর, এরাভ্যের গুপ্তচর পররাভ্যের খবর আদান-প্রদান, পারসিক রাজদূতের আগমণ স্বাভাবিক চললো। বিদ্যুন্মালার ব্রতও শুরু হয়ে গেছে। মণিকঙ্কণা ঘন ঘন মহারাজের কাছে থাকে। সুপারি পান সাজিয়ে দেয়। দাসী পিঙ্গলার সঙ্গে কাজ ভাগ করে নেয়। কিন্তু একজনের মনের খবর কেউ নেয় না। সে হ'ল বিদ্যুন্মালা। ব্রত উপলক্ষে অর্জুন বর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ, অর্জুনের খবর নেওয়া ইত্যাদি অর্জুন বর্মার প্রতি তার আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়ে বৈ কমে না। এই সময় রাজা অর্জুন বর্মাকে গুপ্ত কাজে ভাই কুমার বিজয় রায়ের নিকট পাঠায়। কুমার বিজয় রায় শত্রু মোকাবিলা করতে গেছে। আসলে

পিতা, পিতামহের নাম ঘুরে ফিরেই আসে কোনো কোনো রাজবংশে এটাই রাজকীয় নিয়ম। যাইহোক, এই সময়ে মহারাজা সীমান্ত দর্শনে যাবেন। বেরিয়েও গেলেন দলবল মন্ত্রি সহ। দিন যায় দিন আসে। কুমারি কিন্তু অর্জুনের সাক্ষাৎ পায় না। তবে মহারাজ অর্জুন বর্মা ও বলরামকে ভৃত্য বানিয়ে তাদের রাজবাড়িতে স্থান দিয়েছেন। অর্জুন গুণী, বলরামও গুণী। রাজা গুণী জনের কদর জানেন। অর্জুনের গুণ বংশ দণ্ডে ঘোড় দৌড় অপেক্ষাও বেশি ছোট, যুদ্ধ জানে, বীর ক্ষত্রিয়। আর বলরাম গুপ্তবিদ্যা জানে। কামান বানানো। মহারাজা এটা নূতন কি। বলরাম বলে মহারাজ এমন কামান বানাই যাতে একটি কামান একজন যোদ্ধা চালাতে পারে। মহারাজা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেন—তাই নাকি। তুমি বানাতে পারবে। পরীক্ষা করে দেখাও। দেখানোও হ'ল। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের নিভূতে গুহায় (সঙ্কেত গুহা) যেখানে দাসদাসীদের প্রমত্তের স্থান সেখানে জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলেন। চলতে থাকলো কামান বানানো। আসলে ঔপন্যাসিক এখানে বোঝাতে চাইছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিলো। অনেকেই তা ব্যবহার করেছেন। এর আগেও 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' উপন্যাসে অগ্নিকন্দুকের ব্যবহার করে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ওই সময়ের মহারাজারা বোমার ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ প্রগতিশীল ভারতবর্ষের কথা তুলে ধরতে চাইছেন। মহারাজা বহুদিন হ'ল সীমান্তে গিয়ে সৈন্যদের চাঙা করে তুলছেন। শত্রুরা ওত পেতে বসে রয়েছে। সচেতন থাকতে হবে। স্লেচ্ছরা বড় চালাক। তারা যেকোনো প্রকারে সাম্রাজ্য দখল করতে চায়। তাই সদা সতর্ক থাকতে হবে।

কিন্তু রাজাস্তম্ভপুরে কি কি ঘটছে তা কেউ জানতেও পারলো না। যদিবামাত্র পিঙ্গলা দু'একবার ঠাহর করেছিলো, আমল দেয় নি। বিদ্যুন্মালা ও অর্জুন বর্মার প্রেম আর বলরাম ও মঞ্জিরার প্রেম। বলরাম-মঞ্জিরার প্রেম প্রসঙ্গিকভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। এখন বিদ্যুন্মালার প্রেম ও অর্জুনের প্রেম পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা যাক। যদিও দুটি প্রেমের কাহিনি পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি মুখ্য অন্যটি গৌণ। তবুও একটি অন্যটির পরিপূরক। বলরামের প্রেমোন্মাদনা কিন্তু অর্জুনের প্রভুভক্ত মনকে টলিয়েছে। মঞ্জিরার সঙ্গে বলরামের সখ্যতা, পরস্পর সান্নিধ্য, মঞ্জিরার বাঁশি বাজানো সমস্তই লেখক কিন্তু অর্জুন বর্মার প্রেমের স্ফূটন ঘটাতে পরস্পর এই কাহিনিটির অবতারণা করেছেন। অর্জুন বর্মা বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ কৃতজ্ঞ এমনকি কুমার কম্পনদেবের হাত থেকে মহারাজকে বাঁচিয়েছে। মহারাজ প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অর্জুন বর্মাকে পুরস্কার স্বরূপ তাঁর সারাক্ষণের দৈহিক রক্ষী বানিয়েছে। অর্থাৎ অর্জুন বর্মা ও মহারাজ দেবরায় পরস্পর পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে। রাজমহলে অর্জুনের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্জুন বিজয়নগর রক্ষার্থে, স্লেচ্ছদের তাড়াতে কিংবা স্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও

কোনোদিন পিছপা হবে না বলে সগর্বে জানায়।

যাইহোক, কুমার কম্পাদেবের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে এসে যায়। কুমার কম্পনদেবকে মহারাজা দেবরায় অত্যধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করতো। রাজদরবারের গোপনীয়, অতিগোপনীয়, রাজমন্ত্রণা, রাজস্ব আদায়, প্রজাপালন প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই তার স্থান ছিল। ভাতৃস্নেহে মহারাজা অন্ধ ছিলেন। কিন্তু পিতা বিজয় রায় ও মন্ত্রী ধন্যায়ক লক্ষণ মল্লপ বারম্বার কম্পনের গোপন অভিসন্ধির কথা জানিয়ে সচেতন করেছিলো মহারাজকে। এমনকি কম্পনের কূটচাল, ষড়যন্ত্র, রাজক্ষমতা লোভ, সিংহাসন লোভ, নারী লোলুপতা, মহারাজের মর্যাদাহানী এমনকি মহারাজের প্রাণনাশ সমস্তই জানাতেন। কিন্তু মহারাজ জানেন কুমার কম্পন তাঁর ছোট ভাই; কোনো দিনও তাঁর ক্ষতি সে করতে পারবে না। কিন্তু মানুষের মন কত বিচিত্র খাতে চলে কে জানে? মহারাজও কিন্তু তা কুমার কম্পনের অন্তরের লোভ ও জিঘাংসার কথা ধরতে পারে নি। কম্পনদেব ভেতরে ভেতরে এক ফন্দি বের করলো। রাজমহলের কাছাকাছি আর একটি মহল তৈরি করবে। মহারাজ দেবরায় কিন্তু তাতে বাঁধা দেন নি। রাজমহল তৈরিও হ'ল। এবার গৃহে প্রবেশের পালা। কম্পনের উদ্দেশ্য গৃহ প্রবেশে পিতা, মহারাজা ও মহামন্ত্রীসহ বাছা বাছা দশ বারোজনকে ডেকে প্রাসাদের অভ্যন্তরেই তাঁদের গুপ্তভাবে হত্যা করে রাজ্যের অধীশ্বর হবে। গৃহে প্রবেশের একদিন আগে রাতে মহারাজ ও মহামন্ত্রী দু'জনের মধ্যে মন্ত্রণা হয় যে, কুমার কম্পন কেন বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করলেন। কোনো দূরভিসন্ধি নিশ্চয় তার রয়েছে। কথা মিথ্যা নয়। একে একে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের মধ্যে দু'জন তিনজনকে তার গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানে গুপ্ত ভাবে হত্যা করেছে। চলছে জোর কদমে হত্যালীলা। রক্তপিপাপু জিঘাংসু কম্পনদেব শুধু অপেক্ষা করছিলো দেবরায়, মন্ত্রী আসছেন না কেন? তবে কি তারা আসবেন না। না আসলে স্বয়ং রাজপুরীতে গিয়ে তাঁদের গুপ্ত হত্যা করবে—সংকল্প নেয়। তবে রাজপুরীতে যাওয়ার আগে বৃদ্ধ পিতাটিকে হত্যা করা চাই। পিতা রাজপুরীর নিকটস্থ থাকেন। পিতার নিকটে উপস্থিত হলে পিতা বলে কি চাও? কম্পনদেব মোজার ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছু না বলে পিতার বুকে ছুড়ি মারে। পিতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময় বলে তোর সর্বনাশ হবে। আর কিছু মুখে কথা আসেনি, তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শেষে রাজপ্রাসাদে ঢুকে মহারাজ দেবরায়কে হত্যা করবার জন্য ইতঃস্তুত করে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। এদিকে অর্জুনবর্মা বিনা কারণে রাজপ্রাসাদে ঘোরাফেরা করছিলো। কুমার কম্পনদেবের কটিতে ছুরি। তার মানসিকগতি সন্দেহমূলক হওয়ায় সে-ও কম্পনের পেছনে পেছনে মহারাজের ঘরে যায়। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো। কুমার কম্পন বড় ভাই মহারাজ দেবরায়ের বুকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হলে মহারাজ প্রতিরোধ করলে মহারাজের হাতে লাগে এবং

অঝোরে রক্তপাত হতে থাকে। কম্পনদেব আবার মহারাজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে ছুরি তুলতেই অর্জুনবর্মা তার সর্বসময়ের সঙ্গী লাঠির অগ্রে যে বল্লম ছিলো তা দিয়ে গলায় আঘাত করে তাকে হত্যা করে এবং মহারাজ দেবরায়কে বাঁচায়। আসলে লেখক এখানে দু'টি বিষয় দেখাতে চেয়েছেন। এক. লোভ লালসা, জিঘাংসা বৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ আপন জনকেই কীভাবে হত্যা ও আঘাত করে তার চূড়ান্ত উদাহরণ। কম্পনদেবের যে লালসা রাজ্য চাই। এত ভালোবাসা, অফুরন্ত স্নেহ, সর্বোপরি রক্তের সম্পর্ক কোথাও কম্পনকে অনুশোচিত করে নি। পিতা যিনি জন্মদাতা তাকেও হত্যা করতে তার বাঁধেনি। সাম্রাজ্যের মোহে মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে, কতটা মনুষ্যত্বহীন হতে পারে, কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে সেই দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে। দুই. প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটতো। সেকালে প্রাণের মূল্য ও সম্পর্কের বাঁধনের কোনো মূল্য ছিলো না। অতিতুচ্ছ কারণে মানুষকে হত্যা করা কিংবা এক রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে বিরল ঘটনা নয়। হয়তো ঔপন্যাসিক এই হত্যা দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যতারও পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত দু'টি ছোটগল্পে তার পরিচয় মেলে। প্রথমটি, 'বিষকন্যা' এবং দ্বিতীয়টি 'তক্ত মোবারক'। 'বিষকন্যা' গল্পে ব্যবহৃত ইতিহাস এখানে উল্লেখযোগ্য—

“শিশুনাগ বংশের ইতিবৃত্ত পুরাণে আদ্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই, অজাতশত্রুর পর হইতে কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, অমিত বিক্রম অজাতশত্রুর পর হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় পর্যন্ত মগধে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চলিয়াছিল। পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করা শিশুনাগ রাজবংশের একটা বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিপুল রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য হনানহানি অন্তর্বিবাদ সহজ ও প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া হইয়া পড়িয়াছিল।”<sup>৬৪</sup>

মহারাজকে হত্যার চেষ্টা করবার কথা রাজপ্রাসাদে রাষ্ট্র হতে না হতেই হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল। রাণীদের তো বাইরে বেরোনো নিষেধ যতক্ষণ না মহারাজার আদেশ পায়। কিন্তু অন্তরে তাদের শ্যেল বিঁধে গেল মনে হয়। একি হ'ল। একে একে পিঙ্গলা, লক্ষণ মল্লপ ও মণিকঙ্কণা সকলে রাজার ঘরে ছুটে এলো। মহারাজ বিস্ময় ভরা মনে বললেন—“কম্পন আমাকে হত্যা করতে এসেছিল, অর্জুন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমার আঘাত মারাত্মক নয়, তবে ছুরিকায় যদি বিষ থাকে—।”<sup>৬৫</sup> দেবরায় করুণ ভাবে মন্ত্রির দিকে তাকিয়ে বললেন—‘তোমার সন্দেহই সত্য’।<sup>৬৬</sup> এই একটি মাত্র বাক্যেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভাই কম্পনদেবকে বিশ্বাস করে তাঁর কতটা ভুল হয়েছিলো। মানুষকে বিশ্বাস করাটা কি অন্যায়? ভালোবাসা, স্নেহ করা বুঝি

অপরাধ! ভাবতে ভাবতে দেবরায়ের অন্তর বিসাদে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

যাইহোক, অর্জুন বর্মা রাজার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাকে মহারাজ সাবাস দিলেন। এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। ওদিকে মেজো ভাই কুমার বিজয় রায়কে সংবাদ দিতে হবে নচেৎ তাকে কেউ ভুল বোঝাবে। তাই অর্জুনকে সেখানে পাঠালেন এবং বললেন ফিরে এসে সে যেন রাজার প্রাণরক্ষার ভার নেয় প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

দেবরায়ের চিকিৎসা চলতে লাগলো কবিরাজী পদ্ধতিতে। রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী ও রসরাজ দু'জনে মিলে আশ্বস্ত করলেন এবং বললেন শীঘ্রই মহারাজ ঠিক হয়ে উঠবেন।

এদিকে কম্পনের মৃতদেহ কোলে নিয়ে তার দুই রাণী সহমৃতা হলেন। অর্থাৎ সেকালেও যে সহমৃতা প্রথার প্রচলন ছিল তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাণীদের দোষ কোথায়? কেন তারা সহমৃতা হল—তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বর্ণনা লেখক করেন নি।

উপন্যাসের শেষ পর্বে বিদ্যুন্মালার অন্তর হরিষে-বিষাদে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে মণিকঙ্কণার আনন্দের সীমা নেই। সে এখন রাজার পাশাপাশি সবসময়ই থাকে। মণির কথায় দেবরায় মৃত ভাইয়ের কথা ভুলে যায়। যেন নূতন জীবনে প্রাণের সঞ্চারণ করছে এই কুমারিটি। বিদ্যুন্মালারও একটু আনন্দানুভূত হয় এই কারণে যে, অর্জুনের দেখা এখন প্রায় সবসময়ই হয়। কারণ অর্জুন রাজার দেহরক্ষী। বলরাম কর্মকারের প্রেমেও পরিণতির দিকে যাচ্ছে। মঞ্জিরা খাবার নিয়ে আসে না। সে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বলরামের মন খারাপ। বলরাম ওর সহ্য করতে না পেরে সেও মঞ্জিরার বাপের বাড়ি যায়। সেখানে গিয়ে সদর্পে বলে, সে মঞ্জিরাকে বিয়ে করতে চায়। মঞ্জিরার বাবা বলে, মঞ্জিরার মত কি এবং যে রাজার বাড়িতেই থাকে তাই রাজারও অনুমতি প্রয়োজন। বলরাম আনন্দে আপ্ত। সে রাজার অনুমতি পাবেই পাবে। পক্ষান্তরে, বিদ্যুন্মালার মন আর ঘরে বসে না। বাইরে যেকোনো অছিলায় যেতে চায়। অর্জুনের সঙ্গ চায়। পূর্বে কতবার পম্পাপতির মন্দিরে অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এখন হয় না কেন। বিভিন্ন প্রশ্ন তার মনে ঘুরপাক খায়। তবে রাজা তাকে কোথায় কাজ দিলেন? এভাবে কিছু দিন কেটে গেল। চতুর্মাস্যও এসে গেল। তিন মাস ব্রত পূরণের আর বেশি দিন নেই। কিন্তু বিদ্যুন্মালা মহারাজা দেবরায়কে বিয়ে করতে চায়না অথচ রাজার ব্যবহার তার খুবই ভালো লেগেছে। দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় তার দিন কাটছে। হঠাৎ একদিন বিদ্যুন্মালা পরন্তু বিকেলে পম্পাপতির মন্দিরের দিকে নদীর ঘাটে যাওয়ার সময় অর্জুন তাকে দেখে ডাকতে থাকে। বিদ্যুন্মালা অর্জুনের দেখা পেয়ে বিগলিত হয়ে পড়ে। অর্জুনের সঙ্গে সখ্যভাব আর প্রণয়-প্রণয়িণীর মত ব্যবহার করে। এতে অর্জুন কিন্তু একটু বিচলিত হয়। সে বুঝতে পারে না যে কুমারি একি করছেন। কোথায় কুমারি আর কোথায় সে। অর্জুন রাজী না হতে চাইলে

বিদ্যুন্মালা বলে—“তুমি কি আমাকে সত্যই চাও না? আমি কি তবে আত্মহত্যা করব? কী করব তুমি বলে দাও।”<sup>৬৭</sup>

এদিকে পিঙ্গলা কিন্তু সমস্তই দেখেছে। বিদ্যুন্মালার বিয়ে হবে মহারাজার সঙ্গে অর্জুনের সঙ্গে তার কি? তারা ভাবছেন পিঙ্গলা তাদের দেখে নি হয়তো। তাই অর্জুন নিম্নস্বরে বলে আমি কি বলব? তুমি যাও, এখনি রাজা আসবেন। আবার সন্ধ্যায় আসবে বলে বিদ্যুন্মালা চলে যায়। এদিকে পিঙ্গলা সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে জানায়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দীপের স্নিগ্ধ আলোকে বিদ্যুন্মালা অর্জুনের গুহায় সামনে এসে দাঁড়ালে। জানে বলরাম আজ নেই সে কারণে তার লজ্জা কিংবা সম্মানবোধও নেই। অর্জুনের কাছে গিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে—‘আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমার লজ্জা নেই, অভিমান নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই।’ দুই বাহু বাড়াইয়া তিনি অর্জুনের গলা জড়াইয়া লইলেন। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিলেন।

অর্জুন জগৎ ভুলিয়া গেল। তাহার বাহু অবশে বিদ্যুন্মালার দেহ দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখিয়া লইল।”<sup>৬৮</sup> অপূর্ব মিলন সম্মোহন। জগতের যেন কিছুতেই আর বাঁধা নেই। বাঁধা যে পড়তে পারে তা তাদের জানা ছিল না। যেন ‘দুঁছ কাঁদে দুঁছ কোরে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’ এরকমই ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নয়। বহুদিনের পিপাসিত অতৃপ্ত প্রাণের মিলন, পরম পাওয়ার মিলন বলে আমাদের মনে হয়। অতঃপর হঠাৎ দেখলেন কে যেন একজন তাদের পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন। মোহভঙ্গ হলে তারা দেখতে পায় মহারাজ দেবরায়কে। দু’জনে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে। মহারাজ বললে, অর্জুন বর্মা, অর্জুন বর্মা। নিঃস্বস্তেজ অচল অসার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে, কোনো কথাটিও সরলো না। পরক্ষণেই বিদ্যুন্মালা বলে উঠলো, মহারাজ ওকে ক্ষমা করুন, ওর দোষ নেই। যত দোষ আমার। আমিই ওকে ডেকেছি। আমাকে দণ্ড দিন। পিছনে পিঙ্গলাও এসে হাজির। রাজার আদেশে পিঙ্গলা রাজকুমারিকে নিয়ে গেল। রাজকুমারিও দীনতা প্রকাশ না করে গর্বিতার মতন চলে গেল।

এবার অর্জুন বর্মাকে রাজা প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন—কৃতঘ্নতা, বিশ্বাস ঘাতকতার কি দণ্ড? তুমিও যদি সমান দোষে দুষ্ট তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হওয়া চাই। না না, যেহেতু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো তাই মৃত্যুদণ্ড দেবো না। তুমি আজ রাত পোহানোর আগেই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। অর্জুন যথারীতি রাজ্য ছেড়ে চলেও যায়, সঙ্গে বলরামও তার পেছন পেছন যায়। কেননা তারা অন্তঃরঙ্গ বন্ধু। পথে যেতে যেতে রাজ্যের সীমানা পেড়িয়ে তারা একটা গুহায় প্রবেশ করে দেখতে পায় অনেক মানুষ পর্বতের গা ধরে ধরে কি যেন তুলছে। বলরাম বুঝতে

পারে।

কামান তুলছে। যুদ্ধের সাজ পরিকল্পনা করছে। বিজয়নগর আক্রমণের ফন্দি করছে। এরা স্লেচ্ছ। মুসলমান সৈনিক। যেহেতু কামান গুহার মধ্যে দিয়ে পাচার করা যাবে না সেহেতু তারা কামানগুলো পর্বতের ওপর দিয়ে পাচার করছিলো। এই দৃশ্য দেখে দু'জনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে স্থির করে যে, অর্জুন আবার বিজয়নগরে আসবে। মহারাজকে মুসলমান আক্রমণের কথা জানাবে। আর বলরাম গুহা পাহারা দেবে। যাইহোক, অর্জুন মহারাজকে খবর দিলে আর বলরাম কামান দিয়ে স্লেচ্ছ সৈনিকের পথ অবরোধ করতে থাকলেন—দু'জন স্লেচ্ছকেও কামানেরগুলিতে বাঁঝারাও করে দিলে।

এদিকে পূর্ব-দক্ষিণে মহারাজ মস্ত্রি সৈন্য নিয়ে এসে দেখলেন—অর্জুন সত্য কথাই বলেছে। অর্জুনের দেশভক্তি ও বিজয়নগরের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই মহারাজ তাকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বলরামও এল।

একটা ঘটনা সকলের অগোচরে ঘটল। মহারাজ দেবরায় বাধ্য হয়ে অর্জুনের প্রেমের কাছে, দেশভক্তির কাছে, প্রভুভক্তির কাছে হেরে গিয়ে বিদ্যুন্মালার সঙ্গেই তার বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে। যদিও বিদ্যুন্মালা তারই উপভোগ্য ছিল তবুও এতবড় ত্যাগ। ইচ্ছে করলেই মহারাজ তাকে ভোগ করতে পারতেন কিন্তু করেননি। বাহুবল দেখাননি। আসলে শরদিন্দু তাঁর অঙ্কিত হিন্দুরাজাদের ত্যাগ, পরধর্মসহিষ্ণুতা, মানবতা, মহানুভবতা ইত্যাদি দেখিয়েছেন। যেমন—‘কালের মন্দিরা’র স্কন্দগুপ্ত ও আলোচ্য উপন্যাসের মহারাজ দেবরায় প্রায় একই বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত ও অঙ্কিত। সে যাইহোক, বিদ্যুন্মালার নাম কিন্তু বিদ্যুন্মালা থাকলো না, মণিকঙ্কণার নামও আর মণিকঙ্কণা রইল না। মহারাজ তাদের একে অপরের নাম পরিবর্তন করে দিলেন। বিদ্যুন্মালার নাম হল মণিকঙ্কণা আর মণিকঙ্কণার নাম হল বিদ্যুন্মালা। কারণ এতে সাপও মরলো না লাঠিও ভাঙলো না। বিদ্যুন্মালাকে পূর্বশর্তে বিয়ে করার কথা থাকায় এবং রাজমহলে মহারাজ সম্পর্কে ধারণা সঠিক রাখার স্বার্থে মহারাজ এই ঘটনাটি ঘটালেন। উপায় নেই। বিদ্যুন্মালা মহারাজকে নয় ভালোবাসে অর্জুন বর্মাকে। তাই জোর করে ভালোবাসা কেড়ে নিলে শাস্তি আসে না, প্রেম থাকে না। তাই মনে দুঃখ থাকলেও, রাগ থাকলেও মহারাজ দেবরায়কে মেনে নিতেই হল। এটাই ভবিষ্যৎ। রাজবাড়িতে একই সঙ্গে তিন জোড়া বিয়ে হয়ে গেল। কথায় বলে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

হিন্দু রাজাদের স্লেচ্ছ যবন মুসলমান বিদ্রোহ; মুসলমান সুলতানদের হিন্দুবিদ্রোহ তখনকার দিনে ইস্তকে দেখা যেত। হিন্দু রাজাদের সৈনিকদের হত্যা করলে তারা—‘শহীদী’র শরবৎ<sup>৬৯</sup> পান করা বোঝাত। মুসলমানেরা হিন্দু সৈনিকদের হত্যা করলে বলত—কাফেরকে মেরে পুণ্য

করেছি ইত্যাদি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত, মুসলমান সুলতানরা উস্কে দিত। সুযোগ বুঝে হিন্দু রাজ্য দখল করত। হিন্দুদের গো-মাংস জোর করে খাওয়াত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক যে ভালো ছিল না তার দৃষ্টান্ত আমরা কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠ করলে সহজেই অনুমান করতে পারি।

অন্যদিকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যুন্মালা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগ জীবনের নারী হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা যায়, নারীর হৃদয়টির চরমতম প্রকাশ। নারীর চাওয়া পাওয়ার অধিকারের কথা প্রসঙ্গ সত্যই অভূতপূর্ব। ব্যক্তিত্বময়ী, তেজস্বিনী, গর্বিণী নারীর হৃদয় যন্ত্রণা ও ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন। লেখক এরকম নারী চরিত্র অঙ্কন করা ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’<sup>১০</sup> ছাড়া কেউ সাহস দেখান নি। ইতিহাসের অলিন্দে অতি আধুনিক নারীর চিত্র অঙ্কনে শরদিন্দু অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত নারীরা সত্যিই প্রেমের প্রতিমূর্তি। আবার একই সঙ্গে যুগপদ স্নেহময়ী ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালয়িত্রী। বিদ্যুন্মালা প্রেমের জন্য যেভাবে দুর্বীর হয়ে উঠেছে তা মধ্যযুগে কোনো নারীর সাধ্য নেই যে, ওভাবে প্রেম নিবেদন করে। সে কিন্তু জয়ীই হয়েছে। পক্ষান্তরে লেখক তার প্রেমকেই জয়ী করেছেন। অন্যদিকে দাসীদের প্রেম প্রত্যাশা, হতাশা ও ব্যর্থতার ছবিও এঁকেছেন অবলীলায়। আলোচ্য উপন্যাসে মঞ্জিরার প্রেমটি ও বাঁশি বাজানোর দক্ষতা লেখকের সহানুভূতিরই চিহ্ন। অন্যদিকে পিঙ্গলার সম্মান ও গুরুত্ব এমনকি নারী বাহিনী তৈরি সমস্ত কিছুতেই নারীদের স্থান দিয়ে শরদিন্দু ভারতবর্ষের নারীদের গৌরবান্বিত জীবনকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও এই চিত্রই বিদ্যমান। ‘কালের মন্দির’র গোপা, ‘গৌড়মল্লারে’র কুহু, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘের’র বাঙ্কুলি, ‘কুমার সম্ভবের কবি’র মালিনী এবং ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র মঞ্জিরা ও পিঙ্গলা প্রমুখ দাসী নারীদের চরিত্র লেখকের পূর্ণ সহানুভূতির ফসল। গুরুত্বও দিয়েছেন সমধিক। মূল নারী চরিত্রের সমান্তরালে গুরুত্বপূর্ণ সহচরীরূপে, সখিরূপে এমনকি কূটনৈতিক বুদ্ধিদাতা হিসেবে তাদের ভূমিকা উজ্জ্বল। সত্যিই ভাবলে অবাক হতে হয়, শরদিন্দু প্রতিটি উপন্যাসের আখ্যানকে পরিপূর্ণ করে তুলতে দাসী সখি চরিত্রগুলিকে এঁকেছেন সুচিন্তিত বুদ্ধি ও ভালোবাসার যাদুস্পর্শে।

হাস্যরসের ফোয়ারাও আলোচ্য উপন্যাসটিকে অনন্যমাত্রা দান করেছে। চিপটিক মূর্তি, মন্দোদরীর আখ্যান, অর্জুন বর্মার সঙ্গে চিপটিক মূর্তির কথোপকথন, বলরামের সঙ্গে গুপ্তচর বেঙ্কটাপ্লা ইত্যাদি প্রসঙ্গে লেখক কৌতুকময় পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গাভীর্যতা থেকে পাঠককে কিছুটা সরস হাস্যময় করে তুলতে চেয়েছেন। যদিও লেখকের এটা বড় গুণ।

প্রতিটি উপন্যাসে তার পরিচয় স্পষ্ট।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের রহস্যময় জীবনকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন—যা উপন্যাসের চরিত্রের গতিবিধি, গতিরোধ ও মনের ক্রিয়াকলাপ পাঠককে জানিয়েছেন আগাম। এটা আসলে ইতিহাস বলার কৌশল মাত্র।

এভাবেই তিনি অতীত ইতিহাস, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত ছবি, অতীত জীবন ও সমাজ, অতীত যুগের যন্ত্রণাময় ও অস্থিরময় বাতাবরণকে আধুনিক পটভূমিকায় নামিয়ে এনে পুরাতন কাহিনিকে নোতুন করে পরিবেশন করেছেন। যেন ঐ অতীত জীবনকে অতীত মনেই হয় না। বর্তমানের অস্থির মর্মর জীবন ও সমাজকেই মনে হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে বলরামের কামান বানানোর কৌশল ও ব্যবহার সেকালে কামানের ব্যবহারকে মনে করায়। অনেকে মনে করেন যে, ভারতে কামান বা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার অনেক পরে এসেছে কিন্তু শরদিন্দু তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ কিংবা তারও পূর্বে ভারতবর্ষে কামান বা আগ্নেয় অস্ত্রের প্রচলন ছিল।

তুঙ্গা ও ভদ্রার সম্মিলনে তুঙ্গভদ্রার নামটি এসেছে। তুঙ্গভদ্রার একটি ক্ষুদ্র নদী। ক্ষুদ্র হলেও এর একটা গুরুত্ব রয়েছে। কত ইতিহাস কত ঘটনা যে তার গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে—কেউ তা খোঁজ নেয় না কিন্তু বিজয়নগর রাজ্যের অতীত ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ লক্ষ্যে প্রায় তিনশ বছরের সমৃদ্ধশালী ইতিহাস পুনরায় শরদিন্দুর লেখায় ধরা পড়েছে। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি ও উত্থানের ইতিহাসও তাৎপর্যময়। কারণ কত রাজা মহারাজা সুলতান এই নদীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছেন—তারই ইতিহাস লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করেছেন। কত শত কাহিনি তার গর্ভে। কত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির যোগস্থল—এই নদী যুগে যুগে মানুষের জীবন তৃষ্ণা মিটিয়েছে। তাই লেখক এখানে ইতিহাসকে ভেঙে ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান জীবনের যোগসূত্র করে তৈরি করে নির্মাণ করেছেন ইতিহাসাশ্রিত মহাআখ্যান। বলা যায়, অতীত জীবন, অতীতের কর্মসাধনা, দেশানুরাগ, ধর্মপ্রীতি, সাম্রাজ্যনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিজগৎ সমস্তই ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, স্নেহ বিদ্বেষ, মুসলিম বিদ্বেষও সরাসরি উঠে এসেছে উপন্যাসের আখ্যানে। ইতোপূর্বে ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসটিতেও মুসলমান আক্রমণ প্রসঙ্গ এসেছে। তদুপরি সেখানে দেখা যায় দুই হিন্দু রাজার পরস্পর বৈরীতা ও সমন্বয়ের চিত্র। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটিতে মুসলমান শাসক আহমদ শাহ সুলতানের বিজয়নগর আক্রমণ ও অনুজ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেবের রাজ্য লাভের ইচ্ছায় মত্ত হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ দেবরায়কে হত্যার চেষ্টা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসের উপাদান ও

বাতাবরণ হিশেবে।

আসলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছে ছিলো খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করবার। সেজন্য তিনি ইতিহাসের অনুসঙ্গ, ইতিহাসের চরিত্র, ইতিহাসের ঘটনাবলী ও ইতিহাসের তথ্য ও সত্য ঐতিহাসিকের মত ব্যবহার করেও নিজ কল্পনাবলে কীভাবে সত্যিকারের রস সাহিত্য তৈরি করা যায়, কীভাবে পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণ করা যায়—তারই চেষ্টা তিনি করেছেন আলোচ্য উপন্যাসটির আখ্যান নির্মাণে। ইতিহাসকে ভেঙে নবকলেবরে উপন্যাসে পুনর্নির্মিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস এখানে পুনর্নির্মিত। ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের মস্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—

“...আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন—এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্যে নিয়া three Muskateers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্যদিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে 'Delhi Sultanate', p. 460 তে আমার মস্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইলতুৎমিসের সময়ে না হউক দেবরায়ের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল।”<sup>১১</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মনে করেছিলেন পোর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খ্রিস্টাব্দ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে ‘আগ্নেয়াস্ত্রে’র প্রচলন ছিল।<sup>১২</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইতিহাসের তত্ত্বজ্ঞ পাঠক ও গবেষক। তাই অনায়াসে যে কোনো ঐতিহাসিক উপাদান, ঘটনাবলী, সভ্যতা নিয়ে ভারতবর্ষের নামজাদা কিংবা ভারতবর্ষের বাইরের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, মতামত শুনতেন ও তিনিও যুক্তিসঙ্গত মস্তব্য করতেন। এই উপন্যাসগুলির রচনাকালে বিভিন্ন ইতিহাসবেত্তার সঙ্গে কথোপকথন তারই প্রমাণ। এভাবে তাঁর ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী<sup>১৩</sup> সর্বোপরি সাহিত্যিক মানসিকতার অপূর্ব মিশ্রণে ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত) উপন্যাসটি সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বলা যায়, বাংলা ভাষায় রচিত হলেও জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্য গুণ সম্পন্ন অনবদ্য সাহিত্য হিশেবে উচ্চমর্যাদা লাভ করেছে। এখানেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান নির্মাণের সার্থকতা।

আলোচ্য উপন্যাসটি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমালোচকের সংপ্রশংস ও বিতর্কিত

মস্তব্য চোখে পড়ে। একদা বলা হয়েছিলো এই উপন্যাসটিতে যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতাকে বিনষ্ট করবে। ধ্বংস করবে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিলন ঐতিহ্যকে। তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিকায়, তদানীন্তন ভারতবর্ষের আপামর মানুষের সংকটাপন্ন অবস্থার কথা মনে রেখেই এমন কাহিনিকে বেঁছে নিয়েছেন। ভারতবর্ষকে বৈদিক শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার কল্পে সেদিনের মানুষের মনে স্বদেশানুরাগ, স্বাভাৱ্যবোধ ও দেশ রক্ষার তাগিদ সঞ্চার করবার জন্যই এ ধরণের লেখায় হাত দিয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলায় নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা মুসলমান শাসকের অঙ্গুলিহেলনেই ঘটেছে। বাংলার পৌরাণিক সমাজ বা ব্রাহ্মণিক সমাজ সেদিন মহাধর্ম সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষকে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এতে পৌরাণিক সমাজের দায়ও অস্বীকার করবার মত নয়। কারণ একদিন ব্রাহ্মণ সমাজ সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করেন নি। পুরাণে কিন্তু তার প্রমাণ রয়েছে। যাইহোক যখন উচ্চবর্ণের মানুষ মহাধর্ম সংকটে পড়েছেন তখন তারা তাদের রক্ষণশীলতার জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিয়ম নীতির শৃঙ্খল শিথিল করে ধর্মান্তরিত মানুষগুলোকে পুনরায় স্বজাতে ফেরাতে বিধান দেন। এর কারণ দু’টি—এক. হিন্দুধর্মের বা সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও দুই. ইসলামের হাত থেকে নিম্নবিত্ত হিন্দুদের বাঁচানো। প্রাসঙ্গিক ভাবে পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কবিরা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে উক্ত কাজটিই করেছিলেন। নিত্যানন্দ আচার্যের ‘অদ্ভুদ রামায়ণে’ সেই বিধানের কথা জানা যায়—

“বল করি জাতি যদি লএত যবনে ॥

ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে ।

প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে ॥”

তাই বলে ইসলাম ধর্মের মানুষের ওপর হিন্দুধর্মের মানুষের অত্যাচার একেবারেই যে হয়নি তা নয়, বিভিন্ন লেখকের লেখা কিন্তু এই সত্য প্রমাণ করে। তদুপরি ভারতবর্ষীয় ইসলামধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি আস্থা রেখেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে ভারতবর্ষের একজন নাগরিক হিসেবেই ভেবেছেন। সুতরাং তিনি এখানে হিন্দু বলতে গোটা হিন্দুস্থানের আপামর মানুষকেই বুঝিয়েছেন। মুসলমানও কিন্তু হিন্দুস্থানের বাইরে নয়। কিন্তু যারা ভারতের বাইরে থেকে এসে এদেশ আক্রমণ, দখল ও ধ্বংস করে দিয়েছিলো—তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে জাগাতেই তাঁর এই রচনা। যারা

স্বদেশ আক্রমণ করে, ধর্ম-সংস্কৃতি ধ্বংস করে সে আর যাইহোক না কেন তারা আমাদের শত্রু। একথার সমর্থনে শরদিন্দুবাবু তাঁর ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসেও রাজরাণী রত্না যশোধরার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন ‘...আমার দেশ যে আক্রমণ করে, পরমাত্মীয় হইলেও সে আমার শত্রু।’<sup>৯৪</sup> অতএব, যাঁরা মনে করেন যে, শরদিন্দুর এই উপন্যাসটি বিতর্কিত তাঁরা একটু গভীরভাবে ভাবলেই বুঝতে পারবেন উপন্যাসটি বিতর্কিত নয়, হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ নয়, দাঙ্গা নয়—আসলে উপন্যাসটি ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, সংকটাপন্ন অস্থির সময়ে ভারতবাসীকে স্বদেশানুরাগে ও স্বাধীনতাযুদ্ধে উদ্দীপ্ত করবার অন্যতম মাইল ফলক। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ নিয়েও একসময় বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জবাবও দিয়েছিলেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে কিন্তু শরদিন্দু সে পথে হাঁটেননি। তাঁর উপন্যাস পাঠে পাঠককেই বুঝে নিতে হয়—উপন্যাসিকের বার্তা কি। বিষয়-আশয়ই বা কি।

সুতরাং শরদিন্দুর এই উপন্যাসটি পাঠে আমাদের বিতর্কিত বলে মনে হয়নি কারণ পূর্বেই সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেদিনের পটভূমিকায় এই কাহিনির প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী অনুভব করেছিলেন মনে মনে। তাই শরদিন্দুও একজন ভারতবাসী হিশেবে সেদিনের প্রয়োজন পূরণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি কাহিনি নির্মাণে, চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাষার বুননে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত।

### নির্দেশিকা :

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৯৯
২. তদেব, ১১২
৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১১২
৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১২৪
৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৪
৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৭২
৭. R.C. Majumdar, The Classical age, p. 25
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১১২
৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাসিক, পৃ. ২০

১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ২১
১১. A.L. Basham, The Wonder that was India, p. 91
১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, দিনলিপি, পৃ. ২৭১
১৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ২৭
১৪. তদেব, পৃ. ২৭
১৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৪
১৬. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 80
১৭. তদেব,
১৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১২৫
১৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৫০
২০. তদেব, পৃ. ১৪৯
২১. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 79
২২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৪২
২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৩৪
২৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৪০
২৫. তদেব, পৃ. ৪৪৪
২৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, ভাদ্র, ১৩৬৫, অসঙ্কলিত রচনা, পৃ. ৪৩৯
২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৩৪

২৮. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 80
২৯. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৩
৩০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ২৬৯।
৩১. V.D. Mahajan, History of Medieval India, S. Chand, New Delhi, 2005, p. 33
৩২. *Ibid*
৩৩. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 145
৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৭২
৩৫. অলকা চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, পৃ. ৪৮
৩৬. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 145
৩৭. *Ibid, p. 675*
৩৮. *Ibid, p. 675-676*
৩৯. *Ibid, p. 676*
৪০. *Ibid, p. 145-146*
৪১. *Ibid, p. 146*
৪২. *Ibid*
৪৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৮৭
৪৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭২
৪৫. তদেব, পৃ. ৪৭৫
৪৬. তদেব,
৪৭. তদেব,
৪৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪২৮
৪৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৩৭

৫০. শূদ্রক, মূচ্ছকটিকম্
৫১. তদেব,
৫২. তদেব,
৫৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৬৯
৫৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯
৫৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯
৫৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৪৯
৫৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৩
৫৮. তদেব,
৫৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৯
৬০. জীবন মুখোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, পৃ. ৪১৪-৪১৫
৬১. তদেব,
৬২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫২০
৬৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, একত্রিংশ মুদ্রণ, ১৪২০, পৃ. ১৬৪
৬৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৪৫
৬৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৭৯
৬৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৭৯
৬৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৮৭-৫৮৯
৬৮. তদেব,
৬৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৬০১
৭০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলার মতিবিবি বা লুৎফউল্লিসা
৭১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, পৃ. ৪৪৬
৭২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৩
৭৩. তদেব,
৭৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১১৫

## শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিচার

‘বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সমাজচিত্র বেশি পাই না।’<sup>১</sup> কথাটা অংশত সত্য হলেও একবাক্যে স্বীকার করা যায় না। কারণ একজন লেখক দেশ-কাল-সময়াশ্রয়ী ইতিহাস-নির্ভর আখ্যান রচনা করেছেন তাতে হয়তো ‘ব্যক্তি চরিত্র’ বা ‘বীরচরিত্র’ (Hero Whorship) বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বলা যায়, মহৎ করে দেখানো হয়েছে ইতিহাসের বীর যোদ্ধা ও পৌরুষদীপ্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের। তবে সমাজচিত্র বড় হয়ে ওঠেনি তা নয়। প্রকৃত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে অতীতের স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী সমান গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়। প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত হয় না; ইতিহাসের সত্যেরও হয় না অপলাপ। এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসবীরের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজচিত্রটাই বিধৃত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যগুলি তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতিহাসাশ্রিত দু’একটি ছোটগল্প ইতিহাস বীরের চরিত্র পুনঃসৃষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজ পারিপার্শ্বিকতা বাদ পড়ে নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই চরিত্র পূজা তিনি করেন নি। সেকালের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই তা বোঝা যায়। যেমন— ‘কালের মন্দির’, ‘গৌড় মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ও ‘কুমার সম্ভবের কবি’। ‘কুমার সম্ভবের কবি’তে কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি বিধৃত হলেও সেকালের সমাজ নগর জনপদ ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা যায়, সেকালের সামগ্রিক সমাজজীবন যেন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসটির আখ্যান বস্তুতে।

বস্তুত এক সময় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকগণ বীর বিক্রম কেশরী ইতিহাসের রাজা সম্রাট বাদশাহগণের চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী থেকেছেন। তখন ইতিহাস বীরেরাই বড় জায়গা দখল করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের তিনের দশকের কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রবণতায় জল ঢাললেন। তিনি ইতিহাসের প্রকৃত চর্চা ও অনুশীলনে ব্রতী হলেন। ইতিহাসে মানে কি শুধুই বীর ব্যক্তি চরিত্রের উপস্থাপনা? তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে। তাইতো তিনি ইতিহাসের প্রকৃত রূপ বলতে যা বোঝেন সেই প্রকৃত বিষয়টিই রচনায় স্থান দিলেন। বলা যায়, ইতিহাস হল—“মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল যথার্থ ইতিহাস।”<sup>২</sup> অতএব, বলা যায়, ইতিহাস মানুষের বেড়ে ওঠার কাহিনি। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে বেড়ে ওঠার কাহিনি যাদের শাস্ত্রত সত্য ঘটনা সেহেতু ইতিহাস আলোচনায় সমাজ

বাদ পড়তে পারে না নিশ্চিতভাবে। যাঁদের লেখায় সমাজ মূল্যবান নয়, শুধুই ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছে তাঁদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সাধনা দুই-ই একদেশদর্শিতার পরিচয় দেয়। কেননা ইতিহাস সৃষ্টি ও সংরক্ষণ যুগপদ সমাজের অন্তর্গত মানুষই করে।

যাইহোক, উনিশ শতকে ইতিহাসমূলক আখ্যান রচনার যে প্রবণতা তা ক্ষীণ হতে শুরু করেছে বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের হাতে। বস্তুলীন মনোভাব ও জনতার ছাপ দুই-ই এই সময়ের লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি—মানুষই ইতিহাস গড়ে আবার অর্বাচীন মানুষই ইতিহাস পুনঃ সৃষ্টি করে। সাহিত্যের আধারে যাঁরা ইতিহাস পুনঃ সৃষ্টি করেন তাঁরা লেখক সাহিত্যিক। ইতিহাসের সত্য ও তথ্যের নিরিখে কল্পনা মিশিয়ে প্রকৃত মানবরস সৃষ্টি করেন। যদি কেউ বলে থাকেন ইতিহাস লেখক কখনোই সেটা করেন না তা সম্পূর্ণ ভুল। শুধু কেটে ছেঁটে জোড়া দিয়ে সাজিয়ে দিলেই ইতিহাস লেখার কাজ সম্পন্ন হয় না। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার পূর্বকার ইতিহাস যখন কোনো একজন ঐতিহাসিক লেখেন তখন কি তাঁর কল্পনা কাজ করে না? মনে হয় করে। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

“Filled up the narrative of caesar’s doings with fanciful details such as the names of the persons he met on the way, and what he said to them, the construction would be arbitrary : it would be in fact the kind of construction which is done by an historical novelist.”<sup>৩</sup>

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাস-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। কারণ, সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক, চেতনা প্রবাহধর্মী, কারাধর্মী, কাব্যধর্মী প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসধর্মী আখ্যানমূলক উপন্যাসের পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও প্রত্যেকটি প্রকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগঠনমূলক তবুও উপন্যাসের সত্যের খাতিরে এক গোত্রভুক্ত।

প্রকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার পূর্বে ‘প্রকরণ’ কি সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ‘প্রকরণ’ হ’ল একথায় শিল্প। অন্যার্থে করণ বা রূপায়ণ আর আঙ্গিক কথার অর্থ হ’ল অঙ্গের করণ। দু’টো কথাতেই করণ শব্দটি সমতুল অর্থে ব্যবহৃত হলেও দু’টো কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিল্প হচ্ছে সামগ্রিক রূপকৃতি আর শিল্পাঙ্গিক রূপকৃত্যের বিভিন্ন দিক। বলা যায়, বিষয় কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা, নাটকীয়তা, কবিত্ব, তত্ত্ব, ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্রন্দ,

লেখকের জীবন দর্শন, দৃষ্টিকোণ, প্রতিবেশ ও সময় বা কাল শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ। উক্ত অঙ্গের সংযোজনায় গোটা শিল্পের ছাঁদ তৈরি হয়। শিল্প তার যথার্থ শিল্পীত রূপ পায়। উল্লেখ্য গুণময় মান্না তাঁর ‘বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক’ বইটির ভূমিকাংশে প্রকরণ বিষয় প্রসঙ্গে 'Form' এবং 'Content' আলোচনা করতে গিয়ে 'content' বা বিষয়কে 'Form' বা আঙ্গিকের অঙ্গ হিসেবে দেখেছেন। যদিও ‘মাকসীয় সাহিত্য তত্ত্বে’ ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মাকসীয় সাহিত্য আলোচনায় সামাজিক মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার বদলীক 'Form' এবং 'content' বলেছেন। তাঁর কথায়— “ ‘কন্টেন্ট’ ও ‘ফর্ম’ -এর সম্পর্ক ‘ডায়ালেকটিক্যাল বা দ্বন্দ্ব মূলক।’” (মাকসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ. ৩৫) আমরা বলতে পারি, উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও একে অপরের সম্পর্কও বিদ্যমান। উভয়ের সমন্বয়ে শিল্প তৈরি হয়। এমনকি শিল্প শৈলীর পরিপূরকরূপ প্রকরণ বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়। বলা যায়, অন্য অর্থে প্রকরণ হ'ল প্রকৃষ্ট রূপে যে শিল্প তার শিল্পীত রূপ পায়, সে শিল্পই প্রকৃত শিল্প। প্রকরণ বিন্যাসে যে শিল্পী যত বেশি পারঙ্গম সাহিত্য জগতে তিনি তত বেশি আদরণীয় ও অবিস্মরণীয়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাস ও বিচার সম্পর্কে এবার দৃকপাত করা যাক।

শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের নির্মাণ-শিল্প বা প্রকরণ বিন্যাসের কৌশলগত দিকটি অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাসের থেকে আলাদা। প্রকরণ বিন্যাসের বিচারে দৃষ্টি কোণ (focalization), সময় বা কাল (time), পরিবেশ-পটভূমি (setting or milieu), আখ্যান (plot), চরিত্র (character) ও ভাষা (language) ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ-বিন্যাস বিচারে অনিবার্যভাবে উপরোক্ত উপাদানগুলির ব্যাখ্যা ও বিচার অত্যন্ত জরুরি।

প্রসঙ্গত, উক্ত বিষয়গুলি কীভাবে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিচার ও বিশ্লেষণ করা যাক।

দৃষ্টিভঙ্গি বা নিরীক্ষণ (point of view or focalization) উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধু বহিঃরঙ্গ উপাদান নয়; অন্তরঙ্গ উপাদান হিসেবে উপন্যাসের রচনা রীতির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। এককথায় তা উপন্যাস ও ছোটগল্পের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। লেখক কিংবা কথক কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে আখ্যান কিংবা কাহিনি পরিবেশন করতে চান তা আমরা দৃষ্টি কোণের মাধ্যমে জানতে পারি। গল্পের সঙ্গে কথকের বা লেখকের সম্পর্ক কেমন হবে বা পাঠকের সঙ্গে কথকের বা লেখকের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠবে তা ঠিক করে দেয় এই দৃষ্টিভঙ্গি বা নিরীক্ষণ নামক উপাদানটি। নিরীক্ষক নিরীক্ষণ করেন। সেটা কার চোখ দিয়ে কীভাবে নিরীক্ষণ করবেন তা

লেখকই ঠিক করবেন। কখনো প্রধান চরিত্র, কখনো অপ্রধান চরিত্র, কখনো কথক, কখনো বা স্বয়ং লেখকই একাজটি করে থাকেন। নায়ক-নায়িকাও হতে পারে; তবে এর কোনো পূর্বশর্ত নেই। এই দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্বতন্ত্র প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে। সে প্রেক্ষিত কখনো অন্তঃপ্রেক্ষিত আবার কখনো বা বহিঃপ্রেক্ষিত। আবার প্রেক্ষিত অনুসারে কথনের রীতি গড়ে ওঠে। এই রীতি সাধারণত তিন ধরনের। যথা—ক. সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি (authorial narrative situation or omniscient point of view), খ. আত্মকথন পরিস্থিতি (first person narrative situation) ও গ. ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতি (figural narrative situation)। এককথায় প্রথম পুরুষ বাচক বা সর্বজ্ঞ কথনভঙ্গি, উত্তমপুরুষ বাচক কথনভঙ্গিও ভূমিকানুগ কথনভঙ্গি। আবার কদাচিৎ মধ্যম পুরুষ বাচক কথনভঙ্গিও লক্ষণীয়। তবে ভূমিকানুগ কথন ভঙ্গি অন্তঃপ্রেক্ষিত কিংবা বহিঃপ্রেক্ষিতও হতে পারে। অর্থাৎ লেখক বা কথক কাহিনি তলের বাইরে থেকে অন্তঃপ্রেক্ষিত তৈরি করে। মধ্যমপুরুষ বাচক রীতি খুব কম লেখকই অনুসরণ করেছেন। তিন-চার দশকের লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের ‘রেণু তোমার মন’ উপন্যাসটি মধ্যমপুরুষ বাচক কথন পরিস্থিতি আশ্রয়ে রচিত। আত্মকথন রীতির উপন্যাস বুদ্ধিদীপ্ত মননের পরিচয় বহন করে। আত্মকথন রীতির উপন্যাসের দাবি মস্তিষ্কে; হৃদয়ে নয়। এই রীতির আশ্রয়ে অনেক কালোত্তীর্ণ উপন্যাস ও ছোটগল্প রচিত হয়েছে। তবুও সর্বজ্ঞকথন রীতিটিই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যেও এই রীতিকে অবলম্বন করে লেখকরা প্রচুর উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাসের কথায় দৃষ্টিকোণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই উপাদানের যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রকরণ রীতির প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথাসম্মত উপায়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি অনুসারে কথন তৈরি করেছেন। কখনো লেখক স্বয়ং আবার কখনো বা কথক চরিত্রের মাধ্যমে কথনবস্তু তৈরি করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করে লেখক বা কথক পাঠকের অনেক কাছাকাছি এসেছেন। গল্প শুনিয়েছেন। বিশেষ করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসমূলক উপন্যাস ও ছোটগল্পের কথক পাঠক-শ্রোতাকে আন্তরিকভাবে অনেকটা নাছোড়বান্দা হয়ে গল্প শুনিয়েছেন। ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বৃদ্ধ মোড় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক প্রথমে মোড়ের পরিচয় দিয়ে গল্প শুরু করলেও মোড় শ্রোতাকে গল্প শুনিয়েছেন। পরবর্তীকালে লেখকই কথকের ভূমিকা নেন বলা যায়, পরিবর্তমান দৃষ্টিকোণের আশ্রয়ে ‘কালের মন্দিরা’র প্রেক্ষিত রচিত যেমন—“বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোড় গল্প বলিতেছিল। নির্জন বন পথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র; এই সত্রের প্রপাশালিকা যুবতী অদূরে

বসিয়া করলগ্ন কপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৩।)

আবার মোঙের কথায়—“সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু কেন এমন হইল? দ্বাদশ সহস্র শোণিত-লোলুপ মরু-সিংহ পাঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া-সব ভেড়া।” (তদেব) এই ধরণের প্রকরণ বিন্যাস আখ্যানের সংলাপকেও নাট্যধর্মী করে তোলে। কথক হয়ে ওঠেন নাট্য গুণে অধিকারী। (dramatised narrator) ‘গৌড়মল্লার’ ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, ‘ঝিন্দের বন্দী’ ও ‘বহুযুগের ওপার হতে’ প্রভৃতি উপন্যাসের কথন রীতি মূলত একই জাতীয়। আবার আত্মকথন রীতির আশ্রয়ে তিনি ইতিহাসাশ্রিত জাতিস্মর ধারার গল্পগুলির কথনশৈলী রচনা করেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘রুমাহরণ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘মৎপ্রদীপ’ প্রভৃতি গল্পগুলি উত্তম পুরুষের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। আত্মকথন রীতির শর্তানুসারী কথন বর্ণিত হওয়ায় গল্পগুলি বহুগুণীত হয়ে উঠেছে। যেমন—“সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল— ‘অমিতাভ’, ‘অমিতাভ’।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২৮।)

বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস-ছোটগল্পের কথা বলুন আর অন্যান্য প্রকরণ-আশ্রয়ী উপন্যাস-ছোটগল্পের কথা বলুন মধ্যম পুরুষবাচক কথনরীতির উদাহরণ খুব বেশি একটা চোখে পড়ে না। উল্লেখ্য, সন্তোষকুমার ঘোষের ‘রেণু তোমার মন’ উপন্যাসটি মধ্যম পুরুষ বাচক কথনশ্রয়ী। শুধুমাত্র ‘সেতু’ ইতিহাসমূলক-জাতিস্মর ধারার ছোটগল্পটির কথনে দু’একটি জায়গায় মধ্যম পুরুষবাচক কথনশৈলীর পরিচয় পাই। যেমন—“লিখে রাখ, ওরা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯৯।) প্রসঙ্গত, আখ্যান নির্মাণ কৌশল প্রসঙ্গে উক্ত তিন ধরণের কথনরীতি সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আখ্যান সম্পর্কে সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা মাথায় রেখেও বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ডিসকোর্স (discourse) বা বাচনের উপাদানগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ’ল সময় (time) যা আখ্যান (বাচন)-এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সময় বা কালই নির্ণয় করে দেয় আখ্যানের গতিবিধি। সে উপন্যাসেরই হোক বা ছোটগল্পের। সময়ের ধর্ম একমুখী। নিরন্তর ছুটে চলাই তার ধর্ম। কথায় বলে—সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। উপন্যাস ও ছোটগল্পে মূলত দু’ভাবে সময়ের স্থিতি ধরা হয়। যদিও একেকজন একেকভাবে এই সময়কে ব্যবহার করে থাকেন, দুই বা ততোধিক dimension-এ (বহুমাত্রিক)। যথা এক. গল্পের বা কাহিনির সময় ও দুই. লেখকের বলার বা রচনার সময়। সময় বাচনের উপাদানগুলির যথাযথ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক

উপাদান। প্রধানত চরিত্রের অন্তর্ভাব প্রকটনে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এককথায় চরিত্রগুলির অন্তঃরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ উভয় বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বলতা পায় সময়ের অভিঘাতে। আখ্যানও হয়ে ওঠে কংক্রিট। আবার সময়ের শিথিলতায় আখ্যানও শিথিল বিন্যস্ত হয়। অর্থাৎ সময়ের এলোমেলো বিন্যাসে আখ্যান গঠন-বিন্যাস পৃথুল হয়ে পড়ে। পাঠকের উৎকর্ষা, সন্দেহ সংশয়, কৌতুহল সময়ের পশ্চাৎ-উদ্ভাস ও পূর্ব-উদ্ভাসের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। কোন চরিত্র, কতটুকু সময় ধরে ভূমিকা পালন করবে তারও নির্ণায়ক এই সময়। পৌনঃপুনিকতা কীভাবে উপন্যাসে ও ছোটগল্পের আখ্যানে ব্যবহৃত হবে তাও-ও সময়ের বিন্যাসে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ লেখককে সময় সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হয়। সময়ের বিভ্রান্তি হলেই আখ্যানে কালানৌচিত্ত (anachronism) দোষ দেখা দেবে। Ronen, Ruth -এর কথায়—“The narrative time line is not one monolithic sequence : the time line is segmented into a foreground and background or into a narrative present and a nonpresent;” (আখ্যানতত্ত্ব, অমিতাভ দাস, পৃ. ৩৪।)

পাশাপাশি ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে সময় বা কালের ব্যবহার হয় একটু অন্যভাবে। লেখককে এক্ষেত্রে বাড়তি কৌশল গ্রহণ করতে হয় এবং দূর কালের পটভূমিকে বা অতীতের পটভূমিকে বর্তমানের নিরীক্ষণে পাঠকের বিশ্বাস ও বাস্তবতাবোধ জাগানোর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। দ্বি-স্তরীয় সময় বিন্যাসের রূপটি এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক সময় ও বর্তমানের সময়ের মধ্যে সেতু তৈরি করে এ জাতীয় আখ্যান রচনা করেন একজন লেখক। প্রধানত দু’টি শর্ত লেখককে মাথায় রেখে এ ধরনের বাচন বা আখ্যানশৈলী রচনা করতে হয়। এক. ইতিহাস প্রতীতি ও দুই. বাস্তবতাবোধ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি মূলত উক্ত শর্তেই রচিত। ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসটি মূলত বারো বছর পূর্বে লেখা শুরু হলেও দীর্ঘদিন পড়ে থাকবার পর পুনরায় লেখা শুরু করেন। সময়ের ব্যবধানে লেখকের মানসিকতা বদলাতেই পারে। অনেকসময় বদলায়ও। কিন্তু চিন্তার সূক্ষ্ম নৈপুণ্যতায় লেখকের মানসিকতা বদলায়নি। উল্লেখ্য উপন্যাসটির পটভূমি ভারতবর্ষে হুণ আক্রমণের ইতিহাস। সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতি লেখকের অনুরাগ বৌদ্ধ যুগকেই চিহ্নিত করায়। সর্বোপরি লেখকের রচনাকালের সঙ্গে মিলিয়ে এক বাস্তবধর্মী আখ্যান জন্ম নিয়েছে এবং রোমান্স, কল্পনাচারিতাকে ছাপিয়ে মানুষের বিশ্বস্থ হয়ে উঠেছে। ‘গৌড়মল্লার’, ‘কুমারসম্ভবের কবি’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসগুলিতেও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সময় বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বি-স্তরীয় সময়-বিন্যাসের ফলে উপন্যাসগুলির অন্যান্য উপাদানগুলিও অত্যন্ত শিল্পীত রূপ পেয়েছে। এককথায়

উপন্যাসের যাবতীয় উপাদান সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ; অবিচ্ছেদ্যভাবে উপস্থাপিত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলিও দূরকালের ও নিকট অতীতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটির পটভূমি মূলত আর্যদের আগমনের পূর্বকাল। অনির্দেশ্য ও প্রাগৈতিহাসিক কাল ‘রুমাহরণ’ গল্পটির পটভূমি। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস বর্ণিত গল্প ‘আদিম’ ইত্যাদি। এর থেকে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া যায় যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখনবিশ্ব মূলত সময়ের সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অর্থে উপন্যাসে, ছোটগল্পে সময়ের বিন্যাস দেখিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সে পথে অনেকটা হেঁটেও নিজের জগতকে আলাদা করে নিয়েছেন। তাঁর সময়চেতনা আরও গভীর আরও অন্তর্বাহী (inward)। কয়েক হাজার পূর্বেকার ঘটনা চরিত্র ও পরিবেশকে উপস্থাপন করে বাস্তবমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তাঁর জুড়ি বাংলা সাহিত্যে মেলানো ভার। সুদূর অতীত ও বর্তমানের সংযোগ সূত্রের কৌশলপণার দিকটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলিতে স্পষ্ট—“ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম্র-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলিয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, ‘অমিতাভ’, পৃ. ১৭) Georg Lukacs -এর ‘The Historical Novel’ বইটিতে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের সময়-বিন্যাস, পরিবেশ-বিন্যাস সমাজ, বিন্যাসও চরিত্র-বিন্যাসের বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—“It drew the attention of writers to the concrete (i.e., historical) significance of time and place, to social condition and so on, it created the realistic, literary means of expression for portraying this spatiotemporal (i.e. historical) character of people and circumstances.” (Georg Lukacs, The Historical Novel, Translated from the German by Hannah and Stanley Mitchell, p. 18)

কথাসাহিত্যের সংস্থান বা পরিবেশ-বিন্যাস (setting or milieu) অত্যন্ত জরুরি উপাদান। সংস্থান বিষয়টি স্থান-কাল-চরিত্র, আখ্যান ও ভাষা কিংবা সংলাপের সঙ্গে অন্তর্বাহী সম্পর্কে জড়িত। উক্ত বিষয়-আশয়ের অবস্থানের রূপটিও দিক নির্দেশ করে। অনেকে আবার প্রতিবেশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ (ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেন অস্টেন, সূত্র - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, পৃ. ৫২) বিপরীত ক্রমে আবার টমাস হার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। লেখাগুলিতে পরিবেশ বিষয়টি অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূলেও কিন্তু সংস্থান বা প্রতিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশ না থাকলে চরিত্র বলুন আর

ভাষা সংলাপ বলুন উভয়ই মৃত। কারণ বিষয়ানুসারী পরিবেশানুসারী আখ্যান জন্ম না নিলে সে আখ্যান কালজয়ী হয় না। তবে চরিত্রগত মনস্তত্ত্বমূলক কিছু কিছু উপন্যাসে ও ছোটগল্পে পরিবেশ বিষয়টি কিছুটা অনুজ্জ্বল। তথাপি এ জাতীয় লেখায় পরিবেশকে উপেক্ষা করা যায়। পারিবারিক পটভূমিটাই সেখানে লক্ষ্য। নৈসর্গিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক পরিবেশ, আঞ্চলিক ও সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের আখ্যান জন্ম দেয়। ফলে লেখক নিজেই তা ঠিক করে নেন কোন পরিবেশের মাধ্যমে আখ্যান রচনা করতে চান। পরিবেশগত ভিন্নতার কারণেই কথাসাহিত্যের আখ্যানও স্বতন্ত্র রূপ পায়। সচেতন লেখক মাত্রই জানেন কোনো একটি ঘটনা, চরিত্রকে সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় বা রূপকের আশ্রয় প্রকাশ করতে গেলে পরিবেশ বা সংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পরিবেশ পরিস্থিতি। যেমন—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বিষকন্যা’ গল্পে মত্ত হস্তী পুষ্করের উন্মত্ত অবস্থার প্রকাশ ঘটাতে প্রতীকী রূপকে অবলম্বন করেছেন—“ সেনজিৎ সভাচত্র হইতে অবতরণ করিয়া হস্তীর আরও নিকটবর্তী হইলেন। মদস্রাবী মাতঙ্গ প্রহার-উদ্যমে শুণ্ড উর্ধ্ব তুলিল। তখন সেই রুদ্ধশ্বাস নীরবতার মধ্যে সেনজিৎ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—‘পুষ্কর! পুষ্কর!’

পুষ্করের শুণ্ড ঘোরবেগে অবতরণ করিতে করিতে অর্ধ-পথে থামিয়া গেল। মত্ত হস্তী রক্তনেত্রে মহারাজের দিকে চাহিয়া যেন বিদ্রোহ করিতে চাহিল, একবার দ্বিধা ভরে তাহার করদণ্ড ঈষৎ আন্দোলিত হইল—তারপর ধীরে ধীরে শুণ্ড অবনমিত করিয়া সে নম্রভাবে দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত মধ্যে ধবংসের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবন মৃগে পরিণত হইল।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৬২-১৬৩)

তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটগল্পেও এ জাতীয় প্রতীকী ব্যঞ্জনার ছাপ বর্তমান। বিশেষ করে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে এই বিষয় অত্যন্ত প্রাণবন্ত। বিশেষ করে অতীত যুগের চিত্র, মধ্যযুগের চালচিত্র অঙ্কনে লেখককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পরিবেশের যথাযথ পরিস্ফুটনে এ জাতীয় উপন্যাস বা ছোটগল্প শিল্পীত রূপ পায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে স্বয়ং জানিয়েছেন—“প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশ পংক্তির বেশি করিবে না। যাহা সকলেই দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা ক্লাস্তিকর। বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে মনের পটে আঁকা না থাকিলে বর্ণনা অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যটি visualise করিবে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশ সৃজনে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য তার প্রমাণ। পরিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি দশ পংক্তির বেশি বর্ণনা করেন নি। নির্দিষ্ট

পংক্তির মাধ্যমেই পরিবেশানুসারী আখ্যান তৈরি করেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সংস্থান বা প্রতিবেশ-বিন্যাসে তিনি মনোযোগী। বলা যায় প্রতিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনা তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রাণ। কেননা প্রতিবেশ বিন্যাস উপযোগী না হলে লেখকের বর্ণনীয় বিষয় জীবন্ত হয়ে ওঠে না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৈসর্গিক বর্ণনায় এমনকি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় কোথাও লেখক অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেন নি। এছাড়াও মোগল অন্তঃপুর, মোগল রঙমহাল এবং মধ্যযুগের চালচিত্র অঙ্কনেও যুগপোযোগী পরিবেশ-বিন্যাসে তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বর্তমান। ঐতিহাসিক বিষয় ও অনৈতিহাসিক বিসয়ের পরিবেশ বিন্যাসে তিনি সচেতন ছিলেন। ফলে তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি পাঠে আমাদের ক্লাস্তি আসে না বরং কাহিনির দুর্দান্ত আকর্ষণ আমাদের আদ্যন্ত ধরে রাখে। উল্লেখ্য, “রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়স্বী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, এই নারী বাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫২০) এই পরিবেশ বর্ণনায় লেখক তাতারী সৈনিকদের উপস্থাপন ধরে নারী বাহিনীর পুরী রক্ষার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। লক্ষণীয়, তাতার সম্প্রদায়ের মানুষজন মূলত এশিয়া এবং ইউরোপে বসবাস করে। তুর্কো-মোগল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সেনাদের মতো নারী বাহিনীও সমান দক্ষ। অশ্বপৃষ্ঠেও তারা যুদ্ধ করতে পারে।

প্রসঙ্গত, লেখক জানিয়েছেন এই উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা থাকলেও কাহিনিটি কল্পিত কিংবা মৌলিক। কাহিনিটির সময়কাল মূলত ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের আশে পাশে। তখনও বিজয়নগর রাজ্যের অবসান থেকে একশ বছর বাকি ছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগের পরিবেশের উপস্থাপনায় এ জাতীয় বর্ণনা অত্যন্ত উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পেও একই চিত্র বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চ রচনাগুলি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকার কারণেই তিনি নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করেছেন। ফলে তাঁর এ জাতীয় রচনায় পরিমিত পরিবেশ-বিন্যাস সহ অন্যান্য বাচনিক উপাদানগুলি বিষয় উপযোগী হয়ে উঠেছে।

প্রকরণ বিচারে শরদিন্দুবাবু যে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন তা তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রিত

কথাসাহিত্যগুলি পাঠে স্পষ্টভাবে জানা যায়। লেখকদের জনপ্রিয় সর্বজ্ঞকথন রীতিকে আদর্শ করে তিনি তাঁর রচনাগুলির প্রাতিস্বিকতা বজায় রেখেছেন—এতেই তাঁর মৌলিকতা ও সাহিত্যিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাসাহিত্য মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পের জগৎ নিয়ে তৈরি। উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু প্রাকরণিক যোগ থাকলেও বৈসাদৃশ্যও বেশী চোখে পড়ে। উভয়ের প্রাণ কথা হলেও সাহিত্য পদবাচ্য হিসেবে কথার স্ফূরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং উভয় শাখার পৃথক পৃথক মূল্যায়ন জরুরী হয়ে ওঠে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল্যায়নে সেই পথেই হাঁটা আবশ্যিক।

দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, পরিবেশ, আখ্যান, চরিত্র ও ভাষা ইত্যাদি উপাদান বিন্যাসের ওপর ছোটগল্পের সার্থকতা নির্ভর করে। পরিমিত ভাষাবোধ ও তার ব্যবহারও যথোপযুক্ত হওয়া চাই। কারণ ছোটগল্পে ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন ছোটগল্পকারকে সতর্ক থাকতে হয়। পরিমিত ভাষাবোধ, অনাবশ্যিক বাহুল্যবর্জন, ঋজু, সরল, একমুখী ভাষাই ছোটগল্পের উপজীব্য। ছোটগল্পের কাহিনি-নির্মাণে লেখকের স্বাধীনতা যেহেতু কম সেহেতু গল্পকারকে স্বল্প পরিসরে খণ্ড-খণ্ড প্রতীতির মধ্যে দিয়ে জীবনের সামগ্রিক ছবি আঁকতে হয়। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কাহিনি স্বল্প পরিসরে ছোটগল্পের শর্ত পূরণ করে। তবে বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ পরিসরের ছোটগল্পে সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোটগল্পের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ পরিসরে অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন। তিরিশের দশকের কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক সফলতাও পেয়েছেন। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘বিষকন্যা’ ইত্যাদি গল্পগুলি তার দৃষ্টান্ত। এই গল্প দু’টিতে তিনি ছোটগল্পের প্রচলিত রীতিকে ছাপিয়ে গেছেন। তবুও তাঁর এই গল্প দু’টি রমণীয়তার উৎকর্ষ লাভ করেছেন। রস-সৃষ্টিই যেহেতু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য সেহেতু তিনি গল্পের আয়তন রচনার বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতির ধার ধারেন নি।

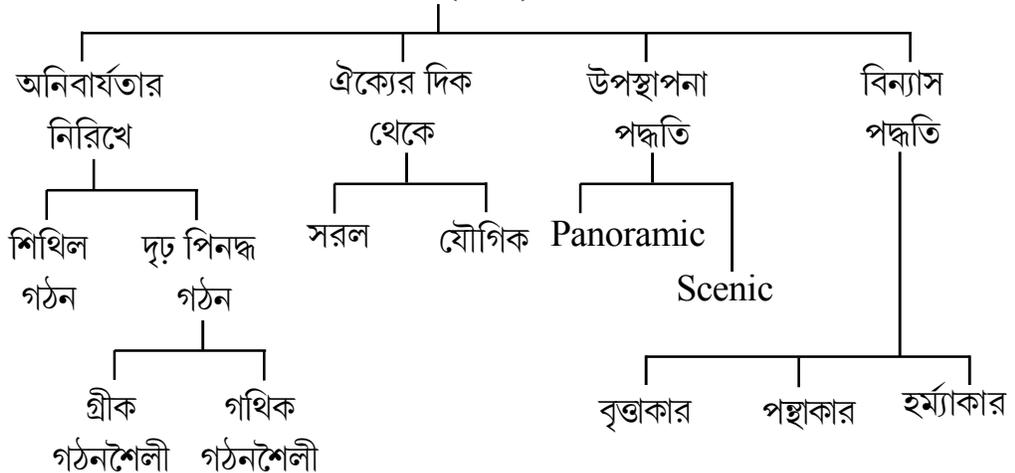
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলি ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে তৈরি। এক-একটি অভিনব কল্পলোক। এই অভিনব কল্প জগতে প্রবেশে দু’ধরণের পস্থা অবলম্বন করেছেন। এক. ইতিহাস, দুই. জাতিস্মরতা। ‘শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প বইটিতে মোট সতেরেটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প পাই। ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’, ‘আদিম’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘রেবা রোধসি’, ‘চুয়াচন্দন’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘তক্ত মোবারক’ ও ‘চন্দন-মূর্তি’ প্রভৃতি গল্পগুলি বিশুদ্ধ ইতিহাসের উপাদানে রচিত। আর ‘রুমাহরণ’, ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ ও ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ প্রভৃতি গল্পে ইতিহাসের পটভূমিকায়

জাতিস্মরমূলক প্রকরণ-কৌশলের আশ্রয়ে রচিত।

ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র, প্রতিবেশ, অতীতযুগের জীবনযাত্রা ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির কথাবস্তুতে। উঠে এসেছে অতীত ইতিহাসের মায়াময় জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের পটভূমির মিশ্রণে গল্পগুলির কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে। অতীতের রোমাঞ্চ, অতীতের আলো আধারি অধ্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগজীবন শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির বিষয়-আশয়। নিছক ইতিহাসের তথ্যকে পরিবেশন না করে তথ্যকে অবিকৃত রেখে ইতিহাসের অস্পষ্টতাকে কাজে লাগিয়েছেন। অতীতকে উজ্জ্বল করে তুলতে ধ্রুপদী যুগের গান্ধীর্য়পূর্ণ ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘আদিম’, ‘প্রাগজ্যোতিষ’, ‘অষ্টম সর্গ’ প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নাটক মূলত মিশ্রকলা। নাটকের শরীর সংলাপ দিয়ে তৈরি। সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপ দিয়ে নাটকের কথার শরীর গড়ে ওঠে। অভিনয় কিংবা মঞ্চ প্রযোজনা দৃশ্যের জন্ম দেয়। নাটক পিয়াসী মানুষের দেখার চাহিদা পূরণ করে। ফলে নাটক হয়ে ওঠে অভিনয় নির্ভর শিল্পকলা। যাকে আবার বলতে পারি নাট্যকলা। কিন্তু কথাসাহিত্যের আখ্যানকে হতে হয় কথন নির্ভর; কথন মুখ্য। নাটকে অভিনেতার মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করা হয়। আর উপন্যাস ও ছোটগল্পের আখ্যানে কথক তার অভিজ্ঞতা পাঠক-শ্রোতাকে জানাতে চায়। এতে উভয়ের মধ্যে একটি মাধ্যম তৈরি হয়। তৈরি হয় একধরনের যোগাযোগ সূত্রে কথন-রীতি বা কথন পরিস্থিতি। তিনটি উপায়ে এই কথক-পাঠক-শ্রোতার সম্পর্ক তৈরি হয়। আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অমিতাভ দাস তাঁর ‘আখ্যানতত্ত্ব’ (পৃ. ৬৭) গ্রন্থে আখ্যান-সমালোচক Stanzel-এর অনুসরণে তা দেখিয়েছেন। আবার অলোক রায় সম্পাদিত ‘সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য’ (পৃ. ১৪৯) গ্রন্থে শ্যামাপ্রসাদ সরদার প্লটের স্বরূপ ও লক্ষণ চিহ্নিত করতে ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড (১৮৭৩-১৯৩৯) -এর অনুসরণে চার ধরনের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। সারণির সাহায্যে তা উল্লেখ করা হ’ল—

### প্লট (Plot)



প্রসঙ্গত, E.M. Forster তাঁর ‘Aspects of the Novel’ গ্রন্থে Plot সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা উল্লেখ্য— “We have defined a story as a narrative of events arranged in their time-sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality. 'The king died and then the queen died' is a story the king died, and then the queen died of grief' is a plot.” (p. 75.) পাশাপাশি অমিতাভ দাসের ‘আখ্যানতত্ত্ব’ গ্রন্থে প্রপ, তোমাশেভক্ষি, বাঁভেনিস্ত, রোলাঁ বার্ত চ্যাটম্যানের প্রসঙ্গ সূত্রে আখ্যান সম্পর্কে কিছু কিছু পরিভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যথাক্রমে—Fabula, Sjuzhet, historie, discourse/recit, story, discourse প্রভৃতি। তবে আখ্যান সম্পর্কে discourse শব্দটিকেই অনেকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেকগুলো উপাদানের ক্রমবিন্যাস যখন কার্যকারণ সূত্রে ও যুক্তির নিরিখে বর্ণিত হয় তখনই কিন্তু discourse-এর জন্ম হয়। আবার এই discourse-ও অনেক সময় বাচন অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখি। বাচনের কতগুলি উপাদানও রয়েছে। যেমন—কাল/সময়, নিরীক্ষণ, কথন, চরিত্রায়ণ, সংস্থান ইত্যাদি। এভাবেই একটি কাহিনি বা ঘটনাক্রম পরম্পরায় আখ্যানের রূপ পায়।

অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘সাহিত্য ছোটগল্প’ (পৃ. ১৯০) গ্রন্থে ছোটগল্পের নির্মাণ-কৌশল প্রসঙ্গ সমাপ্তির বিষয়টিও দু’টি পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। যেমন— ক. অপ্রত্যাশিত চমক (whip-crack ending), খ. ধীর স্বাভাবিক পরিণাম। পো, মপাশাঁ এবং ও. হেনরি অপ্রত্যাশিত চমকের সৃষ্টিতে আগ্রহী। আর একদল রয়েছেন যাঁরা এই অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টিকে পছন্দ করেন না। তাঁরা হলেন চেকভ, হেনরি জেমস প্রমুখ। ধীর স্বাভাবিক পরিণতিই এদের কাম্য। বলা যায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আলো যেমন ধীরে ধীরে বিকেলে গড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ছোটগল্পের সমাপ্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন এই গোষ্ঠীর লেখকগণ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই দু’ধরনের পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছে। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ ও ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ তার প্রমাণ। ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পটি মূলত দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই অনুসরণ করায়। আবার ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাসের কথায় তিনটি গঠন পদ্ধতির কথা জানা যায়। আব্দুর রহিম গাজী তাঁর ‘যুগের প্রতিবিশ্ব বাংলা ছোটগল্প’ (পৃ. ১১) সম্পাদিত বইয়ে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমন—

- i) Stair-step Construction বা সোপানারোহ।
- ii) Rocket construction বা চকিতোন্নত গঠন।
- iii) Circular Construction বা ঘূর্ণরেখ গঠন।

বলা যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির গঠন ও বিন্যাস মূলত উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে তিনটি পদ্ধতির আশ্রয়ে গড়ে ওঠা শরদিন্দুর লেখা তিনটি গল্পের উদাহরণ চয়ন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন—‘অমিতাভ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘সেতু’ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতি সর্বস্তরের লেখকের জনপ্রিয় রীতি। এই রীতিকে আশ্রয় করে বহু কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই রীতিকে অবলম্বন করে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে লেখক চরিত্রগুলির অন্তর্প্রকটনে যত্নবান হন। শরদিন্দুর ‘কালের মন্দিরা’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসের মতো ‘অমিতাভ’, ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘সেতু’ প্রভৃতি ছোটগল্প উদাহরণ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পের কিছু অংশ উল্লেখে তাঁর পরিচয় ফুটে উঠবে— “ঘাট নির্জন। অন্যদিন এই সময় বহু স্নানাথিনীর ভিড় লাগিয়া থাকে; তাহাদের কলহাস্য ও কঙ্কণকিঙ্কণী মুখরভাবে শিথাকে উপহাস করিতে থাকে; তাহাদের ঘটোচ্ছলিত জল মসৃণ সোপানকে পিচ্ছিল করিয়া তোলে। আজ কিন্তু ভিড় নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণী বধু আকাশের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিয়া ঘট ভরিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিতেছে। ক্কাচিৎ একঝাঁক কিশোরী বয়স্যা মঞ্জীর বাজাইয়া গাগরী ভরিতে আসিতেছে; তাহারাও অল্পকাল জল ক্রীড়া করিয়া পূর্ণ ঘট কক্ষে চঞ্চল চরণে সোপান আরোহন করিয়া প্রস্থান করিতেছে। নির্জন ঘাটে সন্ধ্যার ছায়া আরও ঘনীভূত হইতেছে।” তদুপরি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি অতৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। কেননা ইতিহাসাশ্রিত অতীত যুগের জীবনচিত্রের বর্ণনায় তিনি গুরুগভীর তৎসম আশ্রয় নিয়েছেন। অতীতকে অতীতের স্থান-কাল-পাত্রকে উপস্থাপিত করতে গেলে এ জাতীয় পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। শরদিন্দু সেই কাজটিই করেছেন আদর্শ মনে একাজ তিনি সম্পাদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষা শরদিন্দুর রচনায় অবলীলায় স্থান পেয়েছে। তা সত্ত্বেও শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষা পৃথক। ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মত এরকম— “ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতন — বেতো ঘোড়ার মতন নয়। শুধু গতিবেগ নয় — ছোটার মধ্যেও সৌন্দর্য যেন ফুটে বেরোয় — মন যেন ভরে যায়।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই বসু, পৃ. ৭৭) মন্তব্যটির সূত্র ধরে ‘সেতু’ গল্পে প্রকৃতির বর্ণনা সে কথাই স্মরণ করায়— “একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কঙ্কুম-অরুণিত সায়াহে। উজ্জ্বলিনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই — লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুল চরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢলু ঢলু

হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুম প্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুণী হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনও মৃগ নয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে — তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ। প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরণ্যভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯২) চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার নিরিখে গল্পের পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। এখানে পটভূমিকা পাত্রপাত্রীদের পরিপূরক বলা যায়, পটভূমি সৃষ্টির ভাষাও মনোরম, বিশেষ করে বসন্তোৎসবের বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করে। করুণ রসের ব্যবহারেও তিনি সিদ্ধ হস্ত। ‘অমিতাভ’ গল্পের দিগ্‌নাগের কান্না পাঠককেও অশ্রুসজ্জন করে তোলে। ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রুরতা-নিষ্ঠুরতার প্রকাশেও তিনি সফল। ব্যঙ্গ-কৌতুক তথা হাস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে কাহিনি কিছুটা লঘু করেছেন। লক্ষণীয়, হাসির আড়ালে চরিত্রের অসঙ্গতির কথাও ভোলেন নি। প্রাসঙ্গিকভাবে ‘বিষকন্যা’ গল্পের বটুকের কথা বলা যাক— “বটুক দ্রুত পলায়ন করিতে করিতে বলিল — মহারাজ, ও ইচ্ছা দমন করুন, আমি শয্যায় শুইয়া শুইয়া মরিতে চাই।”

ভাষার ব্যবহার নিয়ে শরদিন্দুবাবু যথেষ্ট সচেতন। লক্ষণীয় তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে সাধুরীতি ও চলিত রীতির ব্যবহার লক্ষণীয় উপন্যাসগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। সমালোচকেরা ‘গুরু-চণ্ডালী’ বলে অভিহিত করলেও কিন্তু শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষা রমণীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিনব এক জগৎ নির্মিতির সন্ধান চালিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় ও উপস্থাপনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সরস হয়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—

“আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকেরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প ক’জন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাঁদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই — আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধ হয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ।”<sup>৪</sup>

প্লট বা আখ্যান নির্মাণে স্বতন্ত্র রূপ দক্ষ। এসময় পর্বেও পাঠক তাঁর লেখাগুলি পড়ে সন্তোষ

প্রকাশ করেন। জনপ্রিয়তার প্রাচুর্যে তিনি আজও অমর।

‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

‘ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কাল রাতে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—’

খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।’

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কাল রাতে কি খেয়েছিলেন?’

পণ্ডিত বলিলেন, ‘মনে নেই। গিম্বি বলতে পারেন।’

গৃহিণী বলিলেন, ‘কাঁকড়ার ঝোল আর ভাত।’

বলিলাম, ‘বুঝেছি, ইংরেজিতে যাকে নাইট মেয়ার আপনি তাই দেখেছেন আমি এবার উঠি।’

পণ্ডিত বলিলেন, ‘আরে বোসো, চা খেয়ে যাও। —ভূগোল পড়েছ?’

বলিলাম, ‘ভূগোল? ইতিহাসের স্বপ্ন দেখলেন, তার মধ্যে ভূগোল। ইস্কুলে পড়েছিলুম বটে।’ (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২৪০)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে ‘সেতু’ গল্পটির প্রথম এবং শেষ কয়েকটি ছত্রে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ‘তুমি’ মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষণীয়। কিন্তু তা উহ্য রয়েছে। লেখকের ভাষায় — “হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল ... পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, লিখে রাখ, ওরা চৈত্র ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম ...।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯০)

আত্মকথন রীতি উত্তম পুরুষবাচক কথনরীতি দেশে-বিদেশে বেশ একটি জনপ্রিয় রীতি। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথনরীতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’ প্রভৃতি উপন্যাস তার দৃষ্টান্ত। আমি, আমরা ইত্যাদি সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয় এ জাতীয় রীতিতে। Interior monologue বা আত্মকথন রীতিতে মানসলোকে আলো ফেলা হয় চরিত্রের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে টানা পোড়েন উত্থান-পতন লক্ষণীয় দেশ, কাল, পাত্রের সেতু তৈরি করা হয় এজাতীয় আখ্যানে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিস্মরমূলক

গল্পগুলিতে সেই সংযোগ সেতুরই পরিচয় লক্ষণীয়। ‘অমিতাভ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘রুমাহরণ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘সেতু’ প্রভৃতি গল্পগুলির উপজীব্য বিষয় জাতিস্মর তথা পূর্বজীবনের স্মৃতি কথা-প্রসঙ্গ। স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের যোগসূত্র এদের ভিত্তি। লেখক এই জাতীয় আখ্যানে কথকের ভূমিকা পালন করেন। আত্মকথন রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ উক্ত গল্পগুলি। জাতিস্মরতার মধ্যে দিয়ে লেখক ধূসর মায়াময় অভিনব কল্প জগৎ গড়ে তুলেছেন। ‘রুমাহরণ’ গল্পটি থেকে তার পরিচয় নেওয়া যাক —

“সেদিন পাইন্ গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন্ বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এদেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী শিকারীর চেহারা, —হাতে একটা ধনুক কিংবা বর্শা থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৯০)

এখানেও পটভূমিকা বড় হয়ে উঠেছে। পটভূমিকানুগ পরিস্থিতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কথক মায়াময় পূর্বজীবনের কথাপ্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন— “এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিংবা যেন কোন্ অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া অর্ধ-ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।” ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘বিষকন্যা’, ‘তক্ত্ মোবারক’, ‘রুমাহরণ’ প্রভৃতি গল্পগুলির আখ্যান আধুনিক ছোটগল্পের আখ্যান-নির্মিত ওপর নির্ভরশীলতা না হলেও ছোটগল্পের গুণের দিক থেকে ছোটগল্পের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। আখ্যান যত বড়ই হোক না কেন। গল্পের কাহিনি বলাটাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ফলে গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মহামুহূর্ত বা ক্ল্যাইম্যাক্স (Pointing finger) বিষয়টিও যথোপযুক্ত। ধীরে ধীরে গল্পের সমাপ্তি অংশে তিনি গল্পের উৎকণ্ঠাকে জাগিয়ে তুলেছেন। ‘বিষকন্যা’ মহামুহূর্তের বর্ণনীয় অংশটি উল্লেখযোগ্য—

“উষ্কা—প্রাণময়ি—’ বিপুল আবেগে উষ্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন — আনন্দ-বেদনা।  
উষ্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল — প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনিভাবে আমায় মরিতে দাও।

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণমিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি বারিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ নিষ্পেষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৭৬)

এই দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয় গল্পটির উৎকর্ষার কথা। যা মহামুহূর্তকে স্মরণ করায়। ট্রাজিক মহিমাও গল্পটির অন্যতম আকর্ষণ।

সর্বোপরি, ইতিহাসাশ্রিত সতেরোটি গল্পের বিষয়ানুগ, চরিত্রানুগ ও পরিবেশানুগ ভাষা-ব্যবহার লক্ষণীয়। শরদিন্দুর ভাষা ব্যবহারের দু’টি দিক আমাদের নজরে পড়ে। সরল ও প্রাঞ্জল দ্বন্দ্ব মর্ষিত নাট্য গুণ সমন্বিত।

ভাষা রীতির মূল্যায়নে তাঁর আত্মমত হল—Style দেখাইবার চেষ্টা করিবে না, মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই style আসিয়া পড়িবে। (লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড)

যাইহোক, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির ব্যাখ্যা ও বিচার অনেকটাই একদেশদর্শিতার পথ থেকে সরে এসে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করায় ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গের কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি প্রকরণ বিশ্লেষণের দিকটিও যথার্থ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

এবার অতীতাশ্রয়ী উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া চাই। ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পের প্রকরণ কৌশল যেমন অত্যন্ত প্রশংসাধন্য তেমনি অতীতাশ্রয়ী ইতিহাসমূলক উপন্যাসেরও রচনাকৌশল পাঠক-সমালোচকের প্রশংসা লাভ করেছে। বলা যায়, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়টিও মূলত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাসেরও শিল্পশৈলী নির্মিত হয়েছে। ইতিহাস চরিত্র, আখ্যান, ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা ও জীবনযাপন প্রণালী এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে আখ্যান রচনাও তাঁর রচনশৈলীকে অনন্যমাত্রা দান করে। তাঁর গদ্যরীতি মূলত ঝা চকচকে। কোনো মরচে নেই। স্বচ্ছতোয়া নদীর মতো বেগবান। জড়তা নেই, আড়ষ্টতা নেই। শুধু গতিময় ও বেগমান। পদ্য নয় অথচ পদ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গদ্যের চলন ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ধারণার পরিচয় আমরা পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার চাল দেখে তাই-ই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—

“এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। ... সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, ... সেই চলন নদীর ঘাট থেকে

আরম্ভ করে রান্নার ঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার সঙ্গে মুদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। ... গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতি ভঙ্গি আবাঁধা।”<sup>৫</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গতি ঠিক তাই। তার চলন সর্বত্র। অবাধ গতি। নদীর ঘাট, রান্নারঘর বাসর ঘর সর্বত্র। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

“চাঁদ অবশ্য অনেক আগেই উঠিয়াছিল, দিকচক্র হইতে প্রায় একরাশি উর্ধ্বে—আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণচন্দ্র, কিন্তু পরশু ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহারই আলোকে বিদ্যুন্মালার ঘুমন্ত মুখখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত বেণী চুলগুলি বিস্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিপ্ত অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে অযত্ন ভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, ঝড়ের আক্রোশে উন্মূলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিষ্কিপ্ত হইয়াছে।”<sup>৬</sup>

এভাবেই তিনি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত আখ্যানগুলির গদ্য প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এক নূতন রীতির গদ্য রচনামৌলিক পাওয়া যায়। সাধু চলিতে এমন মেশামেশি আর অন্য কোনো লেখকের রচনায় অন্তত এভাবে দেখা যায় না। বললে অত্যাধিক হবে না যে, চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পাশাপাশি সাধুরীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহার এত স্পষ্ট, এত সাবলীল এত গতিময়—তা তাঁর ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান পাঠে আমাদের বিস্মিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, শুদ্ধ সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারও তাঁর লেখাগুলিকে অনন্যসুলভ করে তুলেছে। পাঠের দুর্গিবার আকর্ষণ আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে। আর ভাষা ও ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভাষা ব্যবহারে অযথা, অহেতুক পদ ব্যবহার করতে চান নি। প্রতিবেশ পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট বিষয়ানুসারী ভাষা ব্যবহারে তিনি পক্ষপাতী। তিনি যে সময়ের সমাজ জীবনেতিহাস উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে ধরতে চেয়েছেন তা ওজস্বী ভাষার মাধ্যমে কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। এমনকি ভাষার উপযুক্ত ব্যবহারে তৎকালীন সামগ্রিক জীবনচিত্র বিধৃত হয়ে উঠেছে। ক্লাসিক্যাল যুগের চিত্রকে ফোটানোর জন্য তিনি ক্যাসিক্যাল যুগের ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা একাধারে ধ্রুপদী ও আধুনিক। ভাষার প্রবাহ সময়ের নিরিখে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। কারণ ভাষা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয় না, গুরুত্ব দেয় বিষয়কে। বিষয়ের গুরুগম্ভীর চালে বা হালকা চালে চরিত্রও গুরুগম্ভীর ও হালকা চালের ব্যক্তি হয়ে উঠে। তাইতো খুব স্বাভাবিক ভাবে শরদিন্দুর ‘কালের মন্দির’র স্কন্দগুপ্ত আর শশিশেখর নামক দুই ভিন্ন চালের চরিত্র পেয়েছি। অন্যদিকে ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার ছবি দুই বিপ্রতীপতায়

অঙ্কিত। যদিও অ্যারিস্টটলের ভাষায়—চরিত্র অপেক্ষা আখ্যানের গুরুত্ব অধিক তবুও চরিত্র ছাড়া আখ্যান নিষ্প্রভ ও নিস্তরঙ্গ। অনুজ্জ্বল চরিত্র সম্বলিত আখ্যান তাৎপর্যহীন ও এককালীন। যেমন—‘ফুলমণি করুণার বিবরণ’ ও ‘আলালের ঘরের দুলাল’ জাতীয় আখ্যানধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের চরিত্রদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর ফুটে ওঠে তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে। তাদের মুখে ব্যবহৃত ভাষাও আখ্যান বিন্যাসকে করে তোলে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতার্থক। অবশ্য এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, শরদিন্দুর অন্যতম আখ্যান নির্মাণ কৌশল হ’ল—

এক. চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসে বিগ্রহ-বীরশ্রী, অনঙ্গ-বান্ধুলির চরিত্র তারই প্রমাণ।

দুই. সূচনা পর্বে কথিত আখ্যানের অর্থ সমাপ্তি ও পুনরায় সমাপ্তি অংশের সঙ্গে সংযোগ সূত্র স্থাপন।

এতে উপন্যাসিকের বুদ্ধিদীপ্ত মননেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা, সাবলীলতা, স্পষ্টতা, কথার সামাজিক তারতম্য, ব্যক্তিগত স্বরের বৈচিত্র্যময় ভিন্নতা<sup>৭</sup> আখ্যানকে আরও কালজয়ী করে তোলে। রহস্যলাপ ও হাস্যরসের সংলাপ পরিবেশনেও শরদিন্দু সিদ্ধহস্ত—“বলরাম বলিল—‘বাপু, কে তুমি? তোমার নাম কি? এখানে কি চাও?’

লোকটি বলিল—‘আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আমার নাম চতুর্ভূজ নায়ক।’

বলরাম বলিল—‘কাকে পাহারা দিচ্ছ?’

চতুর্ভূজ নায়কের গৌঁফ এবং দাড়ির সঙ্গমস্থলে একটু শ্বেতাভা দেখা দিল—

‘তোমাদের পাহারা দিচ্ছি।’

বিস্মিত হইয়া বলরাম বলিল—‘আমাদের পাহারা দিচ্ছ! আমাদের অপরাধ?’

‘তোমরা গোপনীয় রাজকার্যে ব্যাপৃত আছ। পাছে বাইরের লোক কেউ আসে

তাই মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি।’

‘বুঝলাম। রাত্রেও কি পাহারা থাকে?’

‘থাকে।’

‘তুমি একা পাহারা দাও, না তোমার মতন চতুর্ভূজ আরো আছে?’<sup>৮</sup>

এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজিক সম্মানের তারতম্যে ভাষার মেজাজ ও পরিস্থিতি বদলে গেছে। বলরাম পার্শ্ব চরিত্র। তাই তার ভাষাতেও এসেছে চটুল ও দুলালি চাল?

ভাষা উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রাণ। তাই ভাষা শুধুই একটি আখ্যানের বহিঃরঙ্গ সৌন্দর্য

বৃদ্ধি করে না অন্তঃরঙ্গ সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করে। ভাষার কারণে অনেক কবি সাহিত্যিকের রচনা মাটি হয়েছে। বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কমলকুমার মজুমদারের ভাষা অনেকটাই সুখপাঠ্য নয়। কমলকুমারের ভাষার গতি প্রকৃতি অনন্য। তাঁর ভাষার প্রাণ আছে কিন্তু—“তাঁর অন্তর্জলী যাত্রা উপন্যাসের নতুনরূপ ও ভাষা আমাদের মুগ্ধ করলেও, কমলকুমার-এর উপন্যাস সাধারণ পাঠকের জন্যে না।”<sup>৯৯</sup> ভাষায় ভর করে একজন কথাকার সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক সর্বোপরি জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করেন ভাষা-বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে। তদুপরি ভাষার সৌন্দর্যে উপন্যাস ছোটগল্পের সৌন্দর্যও ফুটে বেরোয়। ভাষা মাটি হ’লে উপন্যাস ছোটগল্পের আখ্যান-বিন্যাস, চরিত্র-বিন্যাস ও ভাষা-বিন্যাস সমস্তই মাটি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিখুঁত ভাবে বিচার বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্ক থেকে ভাষাকে কীভাবে প্রোজ্জ্বল ও স্পষ্টরূপে ব্যবহার করা যায় তার নব নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর রচিত কথাসাহিত্যগুলিই উজ্জ্বল প্রমাণ। সমালোচকের ভাষায়—“... আশ্চর্য এই—আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধহয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুনিবার আকর্ষণ।”<sup>১০০</sup> (চিঠি, তারিখ ২.৩.১৯৫৩) বাস্তব সম্মত জীবন ঘেঁষা ভাষার আকর্ষণও তদরূপ। ‘কুমার সম্ভবের কবি’ উপন্যাসটিতে কবি কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনির পশ্চাতে দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বমথিত প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। পাত্র-পাত্রীরা যেন সকলেই বাস্তব মর্মর পৃথিবীর। সকলেই যেন যশ প্রাপ্তি খ্যাতি ও যশহীনতা, খ্যাতিহীনতার লড়াই করছেন। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের জীবনধারণ ও পালনের লড়াই—এককথায় ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের শেষে মানবিকতায়, প্রেম-বিহুলতায়, অহঙ্কার-শূন্যতায় রাজরাণী রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণকুটিরে নেমে এসেছেন। এক্ষেত্রে লেখক সম্পদের চেয়ে, ঐশ্বর্যের চেয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। তাই ভাষাও হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষা—

“কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন—“কিন্তু দেবী, এ যে অসম্ভব। এই দীন

পর্ণকুটিরে—না না, এ হতে পারে না—”

হৈমশ্রী বলিলেন—‘ যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।’

কালিদাস বলিলেন—‘না না, তুমি রাজার মেয়ে—’

হৈমশ্রী বলিলেন—আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে, এখন আমি মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।”<sup>১০১</sup>

রাজার মেয়ে হৈম আজ পর্ণকুটির স্বামীর সঙ্গে থাকবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। নিজেকে আর রাজার মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতে সে নারাজ। এখন থেকে সে কালিদাসের স্ত্রী। সত্যিই লেখক রাজৈশ্বরের অন্তরালে ভারতীয় দাম্পত্য সম্পর্কের শাস্ত্র সত্যরূপ প্রকটিত করতে চেয়েছেন। হৈমশ্রী যেন আধুনিক নারী। স্বামীর পরিচয় দিতে সে কুণ্ঠা করেনি। স্বামীর পরিচয়ে সে বাঁচতে চায়—পিতার পরিচয়ে নয়। এ যেন সত্যিকারের একটি খাঁটি আধুনিক দাম্পত্য সম্পর্কের মিলনধর্মী উপন্যাস। অতীতের ছোঁয়া, স্পর্শ, কুহেলিকা রয়েছে ঠিকই কিন্তু অতীতের কুহেলিকা উপন্যাসের আখ্যানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ভাষার শাণিত রূপ হৈমশ্রী ও কালিদাসের চরিত্রকে সেকালের পারিপার্শ্বিকতা থেকে টেনে নামিয়েছে বাস্তবের মাটিতে। কথোপকথনধর্মী ভাষা প্রয়োগের ফলে চরিত্ররাও অনেক সময় নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বন্দ্ব ময়তার সঙ্গে নাটকীয়তাও এসেছে সমানে সমানে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও এই ব্যক্তি চরিত্রের পরিস্ফুটন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই।

‘অর্জুন বলিল—‘তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগদত্তা।’

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—‘আমি কাউকে বাগদান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি

হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব?’

‘তোমার পিতা তোমাকে দান করেছেন।’

‘আমি কি পিতার তৈজস? আমার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই!’

‘শাস্ত্রে বলে স্ত্রী জাতি কখনো স্বাতন্ত্র্য পায় না।’

‘ও শাস্ত্র আমি মানি না। আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।’<sup>১২</sup>

উপরিউক্ত কথাগুলি থেকে কি আমাদের মনে হয় শরদিন্দুর লেখাগুলি ইতিহাসের ভাৱে ভারাক্রান্ত। অলৌকিক জীবন বিন্যাসের ছবি? ইতিহাসের গুরুগম্ভীর জীবন কি এতে পাওয়া যায়? রাজপুত্র-রাজ-কুমারির জীবন-নাট্যের ভাষা কি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করায়? না। এ ভাষা, এ চিত্র বর্তমান কালের। বাস্তব-মর্মর জীবনের ছবি। ইতিহাসে একজন রাজকুমারির কি এত স্পর্ধা থাকতে পারে? আমাদের মনে হয় না। তাই বলা যায়, এ নারী বর্তমানের, বাস্তবের, ও আধুনিক মননের। স্বভাবতই ভাষাও হয়ে উঠেছে বাস্তবের চরিত্রের অনুসারী সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা। যে নারীর মধ্যযুগে বাক স্বাধীনতার অধিকার ছিল না সে নারী কীভাবে অকপটে উচ্চারণ করে ‘ও শাস্ত্র আমি মানি না।’ এতো মধ্যযুগীয় নারীর মনের কথা নয়—মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে নির্মিত আধুনিক চিন্তনের নারীর আঁতের কথা। চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট মত হ’ল— যে চরিত্র আঁকবে তাকে উলঙ্গ করে দেখে নিতে হবে। যদিও সে চরিত্র সম্পর্কে সব কথা

লেখার প্রয়োজন নেই, তবুও তাকে সমগ্রভাবে দেখে নেওয়া চাই। শরদিন্দু সৃষ্টি চরিত্রগুলি সম্পর্কে এ মন্তব্যটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কারণ তিনি চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাই বিষয়-পরিবেশ অনুসারী চরিত্র সৃজন দক্ষতা লক্ষণীয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও প্রাপোচ্ছল ছোট-বড়-মাঝারি সর্বস্তরের চরিত্ররা বাস্তব সম্মতরূপ পেয়েছে। এমনকি ইতিহাসের বীর পুরুষ চরিত্র থেকে ছোটখাটো সমস্ত চরিত্রই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট। স্কন্দগুপ্ত, কুমারদেবী, যৌবনশ্রী প্রমুখ চরিত্র তার দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের কৌশল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে স্টাইল দেখানোর চেষ্টা করবে না, মনের ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করলে স্টাইল আপনি এসে পড়বে। এমন কথা যিনি বলতে পারেন তিনি কি ভাষা সম্পর্কে নিবিড় চিন্তা না করে থাকতে পারেন। আর চিন্তা করেছেন বলেই তাঁর সৃষ্ট ভাষা এত অনায়াস সুন্দর, প্রাণবন্ত ও চলমান। সুতরাং বক্ষমাণ অধ্যায়ে শরদিন্দুবাবুর ব্যবহৃত ভাষাশৈলীর বিশিষ্টতা চোখে পড়বার মতো।

ক. ভাষার বাচনিক রূপ/ গোষ্ঠীগত রূপ

খ. ভাষার লেখ্য রূপ

গ. ভাষার বহিঃস্তরের অর্থ

ঘ. ভাষার অভ্যন্তরের অর্থ

ঙ. যুক্তিপূর্ণ তথ্য ব্যবহারের গঠনমূলক ছবি

চ. সামাজিক সংস্থানের প্রেক্ষিতে ভাষার ব্যবহার

ছ. সামাজিক পরিস্থিতিভিত্তিক ভাষার ব্যবহার

জ. সংজ্ঞাপনের ভাষা

ঝ. প্রুপদীযুগের ভাষা

ঞ. আধুনিক মননের ভাষা—

অ. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ

আ. সামাজিক রীতি-নীতি নিরপেক্ষ

ই. মানবিক

ঈ. বাস্তব সম্মত/মাটি ঘেঁষা ভাষা

ট. কাব্যধর্মী অর্থাৎ পদ্যরীতি

ঠ. গদ্যধর্মী—

অ. সাধু

আ. চলিত

ই. মিশ্র রীতি

ড. নাট্যধর্মী ভাষার প্রয়োগ—

অ. সংলাপ/কথোপকথনের ভাষা

আ. রহস্যলাপের ভাষা

ই. স্বগতোক্তির ভাষা

ঢ. প্রাচীন শব্দের ব্যবহার—

অ. দেশী

আ. বিদেশী

ণ. প্রতীক/সাংকেতিকময় ভাষা

ত. উপভাষার প্রয়োগ

থ. ব্যাকরণিক বাক্য ব্যবহার

দ. অভিধানগত শব্দের প্রাচুর্য

অ. তৎসম

আ. তদ্ভব

ই. অ-তৎসম

ঈ. কৃতঞ্চণ

ধ. নান্দনিকতা/শিল্পীতরূপ

ন. স্বাতন্ত্র্য রূপ

অতএব, বলা যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ব্যবহারের সচেতন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কথ্য বুননে। ভাষার যথাযোগ্য ও ইঙ্গিতময় ব্যবহার তাঁর লেখাগুলিকে বহুগুণিত করে তুলেছে।

চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্থিত মানসিক ক্রিয়া ও উদ্দীপনার ফলশ্রুতি হ'ল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ব্যবহৃত ভাষা। তাইতো প্রেমালাপের ভাষা আর মানসিক উত্তাপের ভাষা এক নয়। 'বিষকন্যা' নামক গল্পে উল্কা ও সেনজিতের প্রেমালাপের ভাষা আর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের অর্জুন বর্মা ও বিদ্যুন্মালার

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাষা এক নয়। কয়েকটি ছত্র তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—  
 “বিদ্যুন্মালাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভাল বাসিয়াছে,  
 মনের মধ্যে এমন নিবিড় প্রেমের অনুভূতি পূর্বে তাহার অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রেম যত গভীরই  
 হোক, তাহার দ্বারা অপরাধ- বোধ তো দূর হয় না। প্রেম যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে  
 তখনো মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার ক্রিয়া চলিয়াছে—আমি রাজার সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছি; যিনি  
 আমার অনন্যদাতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁহারই সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছি।”<sup>১০</sup> এ ভাষা সতত  
 ক্রিয়াশীল, সজীব ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অনুসারী। মনের ঘাত-প্রতিঘাতের অভিব্যক্তি অত্যন্ত  
 দৃঢ়রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়াও আমরা বলতে পারি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত ভাষা  
 আখ্যান অনুসারী, চরিত্রানুগ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার গুণ  
 ও মেজাজ তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যকে অনন্য মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে। তাইতো, প্রেমালাপের  
 ভাষায় আমরা গদগদ হয়ে উঠি, মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত ও চিন্তিত হই, প্রাচীন  
 ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বর্ণনায় মুগ্ধ হই এবং হাসির কথায় হেসে উঠি; পড়তে পড়তে হাসি স্বতোৎসারিত  
 হয়ে ওঠে।

আমরা জানি, ভাষা হ'ল কথাসাহিত্যের প্রাণ। ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাজ্ঞল ব্যবহারে কথাসাহিত্য  
 হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও প্রোজ্জ্বল। ভাষার গুণেই কথাসাহিত্য মর্যাদা পায়। ভাষা ছাড়া কোনো  
 আখ্যান, চরিত্র, পরিবেশ, দৃষ্টিকোণ, সময় ইত্যাদি কথাসাহিত্যের উপাদান উজ্জ্বল ও যথোপযুক্ত  
 পরিস্ফুটন হয় না। অর্থাৎ বলা যায় যে, ভাষা নিছকই শুধু তার সৌন্দর্য ও অবয়ব পরিস্ফুটন  
 কিংবা গরুগস্তীর ওজস্বরূপ দেখাবার জন্য ব্যবহার হয় না; ভাষা ব্যবহৃত হয় কোনো সাহিত্যও  
 শাখার অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত সৌকুমার্য, তাৎপর্য ও শিল্পিত রূপ নির্মাণে। একজন কথাসাহিত্যিকের  
 যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পায় ভাষার সুনির্দিষ্ট ব্যবহারে। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক,  
 পারিবারিক ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি প্রেক্ষিত পরিস্ফুটনে তা ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের ও রূপের ভাব  
 প্রকাশ করে। অর্থাৎ একজন কথাসাহিত্যিক ভাষাকে মৃত্তিকাখচিত রংপ্রতিমা করে গড়ে তোলেন।  
 ভাষার স্বচ্ছ পরিমত ধর্মকে লেখক তাঁর বাস্তব চলমান জীবনে দেখা বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে  
 এক অপরূপ শিল্প ভুবন গড়ে তোলেন। তাছাড়া ভাষারীতির প্রয়োগেই তো একজন লেখককে  
 চেনা যায়। বাক্যপ্রতিমার রূপ নির্মাণেই তো একেক জন শিল্পীর নিজস্বতার বা প্রাতিস্বিকতার  
 পরিচয় পাই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের বিশেষ করে ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের  
 ভাষারীতির প্রয়োগ কৌশলেই আমরা উক্ত বিষয়টি অবগত হতে পারি। শরদিন্দুর ভাষা প্রয়োগের  
 ক্ষেত্রে ছিলেন সচেতন শিল্পী। তিনি স্টাইল দেখাতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন মনের

ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিলেই স্টাইল আপনা আপনি আসবে। এছাড়াও তিনি বলেছেন— জোর করে কোনো রসের (হাস্য, করুণ) কারবারি করা যাবে না। বিষয়বস্তুর নির্বাচনের নিরিখেই রস আসে—এমনটাও তাঁর অভিমত। সংক্ষেপিত বর্ণনার পক্ষপাতিও তিনি। তাঁর কথায়— “প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশ পংক্তির বেশি করিবে না। যাহা সকলেই চোখে দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা ক্লাস্তিকর।

বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে মনের পটে আঁকা না থাকিলে বর্ণনা অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যটি Visualise করিবে।”<sup>৪৪</sup> প্রকৃতি পরিবেশ, আখ্যান, দৃশ্যপট, বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেমন তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ঠিক তেমনি চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারেও সদা সচেতন ছিলেন। তাঁর কথায়— “যে চরিত্রটি আঁকিবে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া দেখিয়া লইবে। হয়তো সে চরিত্র সম্বন্ধে সব কথা লেখার প্রয়োজন নাই, তবু তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লওয়া চাই।”<sup>৪৫</sup> আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি কত পরিমাণে চিন্তাশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আখ্যান রচনার ভাষাও যথেষ্ট স্পষ্ট মেজাজী। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, স্থানের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ধ্রুপদী সংস্কৃত গন্ধী ভাষা ও গুরুগম্ভীর পরিবেশ বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু যখন তিনি ইতিহাসের উপাদান বর্ণনায় ক্ষান্ত থেকে বিষয়বস্তু, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবোচিত বর্তমান পরিসর এঁকেছেন তখন তার বর্ণনা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বাস্তবোচিত যুক্তিপূর্ণ, সময়োপযোগী। ভাষাও তার ধ্রুপদী রূপ ছেড়ে নেমে এসেছে বাস্তবের কঠিন পরিসরে। পরিস্থিতির ওঠা-নামার পাশাপাশি ভাষাও ওঠা-নামা করেছে। চলিত রীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং শব্দ যোজনার ক্ষেত্রেও সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে— “কেন তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ! রাজা হৃদয়বান লোক, তিনি তোমায় স্নেহ করেন, সবই সত্য। কিন্তু তাঁর অনেক ভৃত্য-পরিচর আছে, তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে। এবং তিনি না থাকলেও তোমার চলবে। তুমি এ দেশের অধিবাসী নও। তুমি রাজার কাজ ছেড়ে দাও। চল, আমরা চুপি চুপি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।”<sup>৪৬</sup> এ ভাষা কি ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভাষা? ঔপন্যাসিক “এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাস্তুলিপি হইতে গৃহীত। Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনা কাল খৃ ১৪৩০-এর আশে পাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।”<sup>৪৭</sup> কাহিনীতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-প্রসঙ্গও চরিত্র থাকলেও

তিনি কাহিনিটিকে মৌলিক বলেছেন কারণ তিনি ইতিহাস রচনা করছেন না, করছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাইতো তিনি ইতিহাস প্রসঙ্গের বেলায় ভাষাকে অতীত অনুসারী ক্ল্যাসিক্যাল যুগের উপযোগী করে নির্মাণ করেন আর যখন তিনি অতীত খোলস ফেলে দিয়ে বাস্তবের মাটিতে পা দেন, চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক রূপে আঁকেন তখন তার ভাষা হয় অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ ও বাস্তব ঘনিষ্ঠ। এটা তাঁর ভাষা-রীতি ব্যবহারের অন্যতম কৌশল। ফর্ম ও কন্টেন্ট-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি ভাষাকে মূর্ত করে তুলেছেন। অনেকক্ষেত্রে রূপ রীতির চেয়েও ভাষা তার আপন সৌন্দর্য বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করে তুলেছে। হয়তো এক্ষেত্রে বঙ্কিমী রীতি ও রাবিন্দ্রীক রীতির অনুসরণ চোখে পড়বে। কারণ তিনি তাঁর লেখার আদর্শ অনেকটাই উক্ত দু'জন মহান শিল্পীর অনুসারী করে তুলতে চেয়েছেন। কোথাও কোথায় নিজস্বতা বজায়ও রেখেছেন। শিল্পীত আদিরস ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। “আদিরস রসের রাজা—রসরাজ, তাহাকে তাহার উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া নগ্নমূর্তি কামকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে, realism-এর সত্যনিষ্ঠা আপন রূঢ়তার লজ্জায় আপনি অধোমুখ হইয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে নবরসের নবরত্নবোধিত সাহিত্য-বিক্রমাদিত্যের ললাটে পঙ্কতিলক পরাইয়া দেওয়া হইবে।”<sup>১৮</sup> অর্থাৎ সাহিত্য রস বর্জিত হলে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না, (২৪ বৈশাখ ১৩৩৯) সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা। তিনি বাস্তবিকপক্ষে এরকম সাহিত্যাদর্শের ভাবনার পক্ষপাতি।

ভাষায় কাব্যধর্মীতার বেলাতেও তিনি সচেতন শিল্পী। কখনো কখনো কাব্যময়তা, ইঙ্গিতার্থক, ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার ব্যবহার চরিত্র ও পরিবেশকে যথেষ্ট প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কাব্যময় ভাষায় তিনি যথেষ্ট সাবলীল। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্পগুলি পাঠে আমরা তা বুঝতে পারি। অন্যদিকে তিনি কাব্য ভাষার মেদ ঝরিয়েছেন আখ্যান-বস্তুর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। লেখক তাঁর বর্ণনার ভাষায় ধ্রুপদী গুরুগম্ভীর পরিবেশ যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নির্মাণেও তা বজায় রেখেছেন। কিন্তু চরিত্রের সংলাপের ভাষায় তা পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে সংলাপে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সাবলীল ও ক্রিয়াশীল। অতীত ফ্রেম হলেও নারী-পুরুষের মুখে বাস্তবোচিত সংলাপই তিনি ব্যবহার করেছেন। ফলত ভাষা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত মননধর্মী, নাট্যগুণ সমন্বিত ও বাস্তবধর্মী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাসে রোমান্স রসের উৎকর্ষ দেখা গেলেও বঙ্কিম-পূর্ব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের ইতিহাসাশ্রিত পুস্তিকা ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্সরসের কারবারি লক্ষণীয়। বলা যায় যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্সের স্থান অপরিহার্য। কেননা, রোমান্সরসের মধ্যে দিয়ে একজন উপন্যাসিক অতিলৌকিক

ঘটনা, স্বপ্নাবতারণা দূরালোকের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। শুধু তাই নয়, চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনেও রোমান্সের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বড় মাপের ঔপন্যাসিকবৃন্দও রোমান্স-কৌশল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আখ্যান রচনা করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই পথেরই পথিক। পূর্বসূরীদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তাঁর সৃষ্ট অতীতশ্রয়ী রচনাগুলিতে রোমান্সের অবতারণা করেছেন। ‘কালের মন্দির’য় অন্ধকূপে বন্দিনী পৃথার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক এক দূর অতীতের স্মৃতিচিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে মুগ্ধীমানা দেখিয়েছেন। এছাড়াও এই উপন্যাসে গুহ চরিত্রটি অন্ধনেও লেখক রোমান্সের অবতারণা করেছেন। ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও আমরা রোমান্সরসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। ‘রোমান্সরস’ সৃষ্টিতে লেখকের বর্ণনার ভাষাও হয়ে উঠেছে অতীত ধ্রুপদী যুগের ভাষা। প্রহেলিকাময়, স্বপ্নালু, কবিত্বময়, মেদপূর্ণ ঐন্দ্রজালিক ভাষা প্রয়োগে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের আবহ তৈরি করেছেন। পাশাপাশি চরিত্র সৃষ্টিতেও কখনো কখনো রোমান্সের আনন্দে হয়েছেন মাতোয়ারা। বিশেষ করে ইতিহাস বীরের চরিত্র, কুহেলিকাময় নারী চরিত্র, সাধু ও বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা আচার্য চরিত্রের সৃষ্টিতে নিয়েছেন রোমান্সের আশ্রয়। ফলত চরিত্রদের মুখে বসানো সংলাপ হয়ে উঠেছে রহস্যময় ও কুহেলিকাপূর্ণ আলো আঁধারির ভাষা। প্রেম অবতারণার ক্ষেত্রেও একই রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনার বিষয়টিও বাদ পড়ে না। আলোচ্য উপন্যাসে স্কন্দের কথায়—“তোমার মতন অল্পই আছে। তোমার ন্যায় পিতৃভক্তি কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস অতি বিরল। কিরাতের দোষ নাই; রূপে ও গুণে তুমি সকল পুরুষের লোভনীয়।”<sup>১৯</sup> নারীর রূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।<sup>২০</sup> রট্টা যশোধরা, রঙ্গনা, রাণী শিখরিণী, কুহু, গুঞ্জা, যৌবনশ্রী, বাবুলি, হৈমশ্রী, মালিনী, বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা প্রমুখ নারী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশে ঔপন্যাসিক তাদের রূপ বর্ণনার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এমনকি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করায়। সোমদত্তা, উল্কা, রুমা, লোলা, ময়ূরিকা, মঞ্জুরিকা, প্রিয়দর্শিকা প্রমুখ নারীদের রূপের অতিশয্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাষা অনেকটা কাব্যময় হয়ে ওঠে। যেমন—

“তাম্রকাম্বুধরবর্ণা লোলযৌবনা তম্বী, কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে-কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে।... এই বিমোহিনীমূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।”<sup>২১</sup>

অপরাপরপক্ষে, এই রূপ বর্ণনার বৈপরীত্যে শরদিন্দুর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে সাহসিনী,

পুরুশালী, বলশালী নারী চরিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন—‘মুৎপ্রদীপ গল্পে পটুমহাদেবী লিচ্ছাবিদুহিতা কুমার দেবীর দুর্ধর্ষ প্রতাপের কথা পাঠকের অজানা হয়। তেমনি ‘বিষকন্যা’ গল্পে উষ্কার প্রচণ্ডতা প্রমত্ততার কথাও আমরা জানি। অন্যদিকে ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে গোপা যেভাবে সমাজে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল তা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, যৌবনশ্রীর পৌরুষদীপ্ত আচরণ (যৌবন-বিগ্রহের পলায়ন-প্রসঙ্গ) নারীর বলিষ্ঠতারই পরিচয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষা নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তেমনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কথাসাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট মত দিয়েছেন। ভাষা কেমন হবে? কীভাবে ভাষা প্রাণ পাবে? কথাসাহিত্যের আদর্শ ভাষা কী? প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর তিনি যথাযথভাবে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যসম্ভারই প্রমাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রেই হোক, আর উপন্যাস ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই হোক, ভাষারীতির বদল ঘটিয়েছেন বারে বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। উল্লেখ্য, ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’ আর ‘চতুরঙ্গের’ ভাষারীতির দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—“স্টাইল দেখাইবার চেষ্টা করিবে না, মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই স্টাইল আসিয়া পড়িবে।”<sup>২২</sup> অর্থাৎ স্টাইল সম্পর্কে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, স্টাইল হ’ল— উচ্চ চিন্তার ও ভাবের প্রকাশ। Chester field-এর মতো তিনি বলতে চান “Style is the dress of thoughts.” তাই পোশাকটাই যে সর্বস্ব নয় সেটা স্মরণ রাখতে হবে। Thoughts বাদ দিয়ে যারা style রচনা করে তারা দর্জির দোকানের পোশাক dummy পরা তৈরি করে মাত্র।”<sup>২৩</sup> তিনি বলতে চান ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতো, বেতো ঘোড়ার মতো নয়, ছুটলে যেন সৌন্দর্য বেরোয়।

স্বভাবতই, তিনি ভাষার বাহক হিসেবে Thoughts বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাইতো তাঁর লেখাগুলি হয়ে উঠেছে উচ্চ ভাবাদর্শের বাণীবাহক। বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষার তারতম্যও বিস্তর। গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও লঘু পরিবেশের মধ্যেও পার্থক্য দুষ্টর। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগও অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তবতা প্রকাশ ও অতীত মায়াময় জগতের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও ভাষার ভিন্নরূপ চোখে পড়ে।

কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক সদা সতর্ক থেকেছেন ভাষার প্রয়োগ রীতি নিয়ে। ঐতিহাসিক কাহিনির বর্ণনায়, অতীত জীবন চিত্র পরিস্ফুটনে, অতীতাত্মীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির অন্তর্গত মানবিক ঘটনার ধারাবাহিক বিকাশ বর্ণনায়, ইতিহাস বীরের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনায় লেখক যেমন দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দ্বন্দ্বমথিত প্রেম কাহিনি, ষড়যন্ত্র, সাধারণ

দাস-দাসী থেকে নর-নারীর প্রেম, অনৈতিহাসিক ঘটনা-চরিত্র, বাস্তবতা-অতিলৌকিতা-প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক ভাষা প্রয়োগে দেখিয়েছেন মুনশিয়ানা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কাহিনি-বিন্যাসে প্রকরণগত দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

ক. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খ. দৃশ্য বিন্যাস, উপশিরোনাম

গ. সংস্কৃত, ইংরেজি পুস্তকের পংক্তি ব্যবহারের তাৎপর্য

ঘ. প্রকৃতির বর্ণনা

ঙ. নাট্যরীতি

চ. প্রারম্ভিক পর্ব

ছ. সমাপ্তি অংশ

জ. পরিশিষ্ট অংশ

ঝ. পরিচ্ছেদ বিভাগ

ঞ. গৌণ কাহিনি

ট. উপস্থাপনা

ঠ. কাহিনির বিস্তার (পূর্বমুখ সূত্র)

ড. কাহিনির অন্তরালে অন্য কাহিনিতে চলে যাওয়া

ঢ. অতীত—বর্তমান—অতীত—বর্তমান চক্রাকারে কাহিনির বিবর্তন।

এইভাবেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনির নির্মাণ। উপরোক্ত উপাদানের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি গড়ে ওঠে—যা কথাসাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে লেখকের কাহিনি বিন্যাস রীতি। অ্যারিস্টটলের সূত্র ধরে—আদি, মধ্য, অন্ত্যসম্বলিত, কার্যকারণ পরম্পরা দ্বারা শৃঙ্খলিত ও নাটকীয় রীতি আখ্যানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েও বলা যায় যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসমূলক লেখাগুলিতে উপরোক্ত সমস্তই উপাদান বর্তমান।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সর্বস্ত কখন ভঙ্গিরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপের ভাষায় নায়ক কথক চরিত্রের মুখ দিয়ে উত্তম পুরুষ বাচক বা আত্মকথনভঙ্গির প্রয়োগ কৌশল অবলম্বনে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প আলোচনার সময়ে আমরা তা দেখিয়েছি। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সর্বস্ত কখনরীতিরই যথেষ্ট প্রয়োগ ঘটিয়েছেন যা প্রথম শ্রেণির লেখকদের জনপ্রিয় রীতি। পরিশেষে, শ্রী সুকুমার

সেনের মস্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

“শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগর সঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুষ্কিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর।”<sup>২৪</sup>

খাঁটি ইতিহাস নির্ভর গল্পগুলিতে কিন্তু সাধু-চলিত ও চলিত-সাধু উভয় রীতির পরিচয় পাই। যেমন — ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পে — “ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কালরাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম’ খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২৪০) লক্ষণীয় এই ভাষা আমাদের আকর্ষণ করে। সাধু-চলিত আবার চলিত-সাধু রীতির প্রয়োগ কৌশলও মনোরম! ‘গুরু-চণ্ডালী’ ভেদাভেদকে তিনি গুরুত্বই দেন নি। ফলে প্রথম বাক্যের শেষে ‘পড়তে’ ‘পড়তে’ চলিত রীতির ক্রিয়াপদ দ্বিতীয় বাক্যে কথকের কথায় ‘পড়িতে’ ‘পড়িতে’ সাধু রীতির ক্রিয়াপদে পরিণত হয়েছে। এরকম অনেক উদাহরণ চোখে পড়ে। কারণ হিশেবে বলতে পারি যে, কথাকার ভাষার গतिकে প্রবহমান করতে চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে, ক্রিয়াপদের জাড্যদোষ মুক্ত করতে, আখ্যানের সাবলীল গতি আনতে এরকম মিশ্র রীতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন। পেয়েছেন কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, ভারততাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদদের অকৃত্রিম প্রশংসাও। তাঁর উপন্যাসের ভাষাতেও এসেছে ধূসর মায়াময় জগতের বাস্তব রূপচিত্র। প্রাচীন কালের অনির্দেশ্য চিত্রাঙ্কন, সংস্কৃতির অন্তর্ভলয়, গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মানুষের মানুষে হানাহানি, জটিল জীবনাবর্ত, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা ও দ্বন্দ্বমথিত প্রেম তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি থেকে উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে — “কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দু’টি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাঁহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্নিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৪৬) রূপাসক্তি, লোভ, লালসা, উদগ্রকামনা মানুষকে যে কতটা নৈতিক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ

এই উপন্যাসের কম্পনদেব চরিত্রটি। নারীর প্রতি অনির্বাণ মোহ শুধু সে যুগে কেন এযুগেও বর্তমান, ভবিষ্যতেও থাকবে। লেখক শরদিন্দু কৌশলে মানুষের অমিতাচারী জৈবিক ক্রিয়াকে চিরকালের সমস্যা রূপে দেখাতে চেয়েছেন। তবে তার বৈপরীত্যে মহারাজ দেবরায়কে শৌযবীর্য ও শান্ত সমাহিত জৈবিক মানুষ রূপে দেখিয়েছেন। জৈবিক চাহিদা মানুষের সহজাত। কিন্তু মানুষই পারে তাকে শুচিস্মিত করে তুলতে। যিনি পারেন তিনিই তো মহৎ। যিনি পারেন না তিনি তো অসৎ। এই দুই বিপরীত মুখী ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব লেখক রূপদঙ্কের মতো চিত্রিত করেছেন। স্বভাবতই, প্রকরণ বিচার প্রসঙ্গে ভাষা, কাহিনি-বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে।

নির্দেশিকা :

১. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪০
২. তদেব, পৃ. ১
৩. R. G. Collingwood, The Idea of History, p. 240
৪. তদেব, পৃ. ৩
৫. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ছন্দ-মীমাংসা ও অলঙ্কার সমীক্ষা, পৃ. ২৭০
৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫১২
৭. বিপ্লব মাঝি—উপন্যাসের ভাষা, পৃ. ১৬
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৬৩
৯. বিপ্লব মাঝি, উপন্যাসের ভাষা, পৃ. ৩২
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৬
১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯
১২. তদেব, পৃ. ৫৭১
১৩. তদেব, পৃ. ৫৭৩
১৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮
১৫. তদেব
১৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৭২

১৭. তদেব, পৃ. ৪৮৩
১৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, পৃ. ২০৬
১৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১০৪
২০. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৩৫
২১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯৩
২২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ,  
পৃ. ২৩৮
২৩. তদেব, স্টাইল, পৃ. ২১৫
২৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, প্রথম খণ্ড, ব্যোমকেশ, পৃ. ১০

## উপসংহার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০.০৩.১৮৯৯—২২.০৯.১৯৭০) পেশাদার ও জনপ্রিয় লেখক। তাঁর লেখার জুড়ি মেলানো ভার। মূলত ১৯১৫ থেকে স্কুল জীবন থেকে কচি হাতের কবিতা দিয়ে লেখা লিখি শুরু করলেও পরিণত বয়সে তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি কবিতা, চিত্রনাট্য, নাটক, দিনলিপি, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখাগুলিতেও তাঁর দক্ষতার ছাপ বর্তমান। ১৯৭০, ২২ শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৭০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত এই সাতচল্লিশ বছরে তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। গোয়েন্দা গল্প রচনায় তাঁর জনপ্রিয়তা শিখরে পৌঁছালেও সুখপাঠ্য হিসেবে কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি পাঠকের নজর কাড়ে। এমনকি এই জাতীয় লেখার জন্যই তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারও লাভ করেন। সাহিত্যিক পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁর পুরাতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিক রূপের পরিচয় পাই। অন্যদিকে তিনি সমালোচকও বটে। তিনি সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের লেখা সম্পর্কেও সমালোচনা করেছেন। প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেও পরে তিনি রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়েন। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত একটা রসসাহিত্যের যুগ বলে ভেবেছেন। বঙ্কিমকে আদর্শ মেনে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের যুগবৈশিষ্ট্যকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালির ইতিহাসানুসন্ধান করে গেছেন আজীবন। শরদিন্দুর সাহিত্যের প্রেক্ষাপট শুধু বাংলা ও বাঙালি নয়, ভারত ও ভারতের সংস্কৃতি। বাংলা সাহিত্যে তিনি তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর যুগের লেখক হয়েও তিনি স্বতন্ত্র সাহিত্য জগৎ গড়ে তুলেছেন।

সাহিত্যের বিচারে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের চেয়ে সে সময়ের মানুষের জীবন কেমন ছিল, কীভাবে মানুষ জীবন-যাপন করতো, রীতি-নীতি, সংস্কার-আচার-বিশ্বাস, ধর্মসাধনা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ইত্যাদিই বা কেমন ছিল সে বিষয়গুলিকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর রচনায় ইতিহাস ব্যবহারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা যায়—

ক. ইতিহাস সরাসরি বর্ণনা করেন নি (দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া)

খ. ইতিহাসের তুচ্ছ অনুসঙ্গ ব্যবহার

গ. ইতিহাস রচনা নয়, সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য

ঘ. শরদিন্দু ঐতিহাসিক বা দর্শক নন, তিনি সাহিত্যিক ও স্রষ্টা।

এই ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণাগুলিকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ধারায় শরদিন্দুর স্থান এবং তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দিকটিও চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের

ক্রমপঞ্জি অনুসারে ইতিহাসমূলক বইগুলির উল্লেখ এই অধ্যায়ে অপরিহার্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরদিন্দুর কথাসাহিত্যের মধ্যে ইতিহাস ও তার গুরুত্ব বিষয়ে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করেছি। কোথাও কোথাও ইতিহাস নামমাত্র ব্যবহৃত হয়ে আখ্যানকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। কাহিনির দুর্গিবার আকর্ষণের মূলে এই ঐতিহাসিক রোমাঞ্চপ্রিয়তা ও রমণীয়তা। ফলে শরদিন্দু প্রয়োজন অনুসারে আখ্যান অনুসারী ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের ব্যবহার করেছেন। এতেই এই জাতীয় আখ্যানগুলি হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় ও প্রশংসাধন্য। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে তাঁর মর্মার্থ উদ্ধার করেছি। পুনর্নির্মাণ বিষয়টি কি তা আমরা ভূমিকা অংশে আলোচনার অবকাশ পেয়েছি ফলে এই অধ্যায় দু'টিতে তাঁর কৌশলগত দিকটির তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। কীভাবে ইতিহাসকে পুনঃরূপদান করেছেন তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এই অধ্যায় দু'টি জুড়ে রয়েছে। পুনর্গঠনের কারণ কি সে বিষয়েও সমানভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছি। পুনর্নির্মাণ কৌশলপণায় একদিকে যেমন তাঁর মুন্শিয়ানার পরিচয় পাই তেমনি অন্যদিকে ইতিহাসের বিষয় অবলম্বন করে সাহিত্য রচনায় প্রথম সারির লেখকদের মধ্যে জায়গা করে নেন। উল্লেখ্য, পঞ্চম অধ্যায়টিতে কথাসাহিত্যের প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা করে প্রকরণ কি? কীভাবে এই প্রকরণ কৌশল একজন কথাসাহিত্যিক তাঁর লেখায় রূপ দেন তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দিকটিতে আলোকপাত করেছি। দৃষ্টিভঙ্গি, সময় বা কাল, পরিবেশ-পটভূমি, আখ্যান নির্মাণ, চরিত্র-বিন্যাস ও ভাষারীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচিতব্য বিষয়। প্রাসঙ্গিক পর্বে আমি গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট ও নির্ঘণ্টের মাধ্যমে কিছু কিছু আনুষঙ্গিক দিক উল্লেখ করেছি। প্রাসঙ্গিক পর্বগুলিও এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের অপরিহার্য বিষয়।

পরিশেষে ড. সুকুমার সেনের একটি মস্তব্যে লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়—

“শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বগামী লেখকদের ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসে ‘জীবন্ত’ ভূমিকা যে মেলেনি এমন নয়। কিন্তু সে-সব ভূমিকা জীবন্ত হয়েছে বাইরের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায়, অর্থাৎ লেখকের উজ্জ্বল বর্ণনায় উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে। শরদিন্দু বাবুর গল্পের ভূমিকাগুলি জীবন্ত হয়েছে বাইরের থেকে আলোক সম্পাতে নয় তাদের অন্তরের জ্যোতি থেকেই। শরদিন্দুর বর্ণনা নয় তাঁর দৃষ্টিই ভূমিকাগুলিকে ইতিহাস মঞ্চের পুতুলবাজি থেকে নামিয়ে এনে যেন সমসাময়িক জীবনে ভূমিষ্ঠ করিয়েছেন।”

**নির্দেশিকা :**

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১২

## গ্রন্থপঞ্জি

ক. বাংলা আকর গ্রন্থ :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস। চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প। চতুর্বিংশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দু অম্নিবাস, দশম খণ্ড, উপন্যাস নাটক। পঞ্চদশ মুদ্রণ, মাঘ, ১৪১২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা। পঞ্চম মুদ্রণ, মাঘ, ১৪১৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯।

খ. বাংলা গ্রন্থ :

অমিতাভ দাস। আখ্যান তত্ত্ব। প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১০। ইন্দার্স পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স, ৬২/৩ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০০৯।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কালের পুত্রলিকা। বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর : ১৮৯১-২০০০। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৮২, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৪। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কালের প্রতিমা। বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭। প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৭৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে। বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৪। পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৬৭। প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই, ২০০০। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

অলোক রায়। সাহিত্য কোষ : কথাসাহিত্য। সাহিত্যলোক, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৩, কলকাতা-৭০০০০৬।

অশীন দাশগুপ্ত। ইতিহাস ও সাহিত্য। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

অশ্রুকুমার সিকদার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৮। অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

আব্দুর রহিম গাজী। যুগের প্রতিবিম্ব : বাংলা ছোটগল্প। প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস, ২০০৬। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। গল্প পাঠকের ডায়ারি। প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৫। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি। প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প। প্রথম প্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ, ১৩৮৪। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

ই. এইচ. কার, আর ডবলিউ ডেভিস (সম্পাদিত)। অনুবাদ : স্নেহোৎপল দত্ত, সৌমিত্র পালিত। সম্পাদনা : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কাকে বলে ইতিহাস? প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১। কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৫, বি.বি. গান্ধুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকরণ ও প্রবণতা। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প। প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তকমালা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩।

গুণময় মান্না। বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাত্মিক। প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯৫। ভাষা ও সাহিত্য, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

ড. অতুল সুর। হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য। প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মুদ্রণ : ১৯৮৪, ১৯৯৮ ও ২০১২। সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

ড. অতুল সুর। ভারতের তাত্ত্বিক পরিচয়। প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৮, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৪। সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

ড. অতুল সুর। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন। চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৮। সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা-৭০০০০৬।

ড. অভিজিৎ মজুমদার। শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক

মেলা, জানুয়ারি, ২০০৭। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০০১-২০০২। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ড. ইন্দ্রানী চক্রবর্তী। বাংলা ছোটগল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

ড. নিতাই বসু। সত্যশ্বেষী শরদিন্দু। সাহিত্যম, ১৮ বি শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ড. প্রমীলা ভট্টাচার্য। কথাশিল্পী শরদিন্দু : মন ও শিল্প। গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বি, পটুয়া টোলা লেন, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব। প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ড. রামেশ্বর শ'। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। প্রথম প্রকাশ, প্রথম খণ্ড, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯০, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ই ফাল্গুন ১৩৯৪, কলকাতা-৭০০০০৯।

ড. শচীন্দ্রনাথ রায়। সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার। প্রথম প্রকাশ, মহালয়া, ১৪০৬। প্রণতি বুকস, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার।

ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য। এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব। সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০২। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি। প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯০, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১১। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

জহর সেনমজুমদার। উপন্যাসের ঘরবাড়ি। প্রথম প্রকাশ, মে, ২০০১। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

জগমোহন মুখোপাধ্যায়। গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০১২। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, সুবীর কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

জ্যোতির্ময় দাশ। ড. হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্মান্তরবাদ : রহস্য ও রোমান্স। প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৭২। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩।

তপোধীর ভট্টাচার্য। উপন্যাসের সময়। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯১, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৯। এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

দেবেশ রায়। উপন্যাস নিয়ে। প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা

পুস্তকমালা, জানুয়ারি ২০০৩। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০০৭৩।  
দীনেশচন্দ্র সেন। বৃহৎবঙ্গ। প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫। তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৬। দে'জ  
পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩।

দীনেশচন্দ্র সেন। বৃহৎবঙ্গ। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৫। দে'জ  
পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩।

নগেন্দ্রনাথ বসু (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড)। প্রথম দে'জ সংস্করণ,  
ফেব্রুয়ারি, ২০০৪। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩।

নিতাই বসু। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ, ২০০৬। গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩ এ, কলেজ স্ট্রীট,  
কলকাতা-৭০০০০৭৩।

নবেন্দু সেন। উপন্যাস : প্রকরণ, প্রযুক্তি ও বীক্ষণ। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭। ২০ সি গাস্টা, বি. ৩  
পশ্চিম বিহার, নতুন দিল্লী : ১১০০৬৩। পরিবেশক : দে বুক স্টোরস, কলকাতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যে ছোটগল্প। প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৫, চতুর্থ  
মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৪১৬। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,  
কলকাতা-৭০০০০৭৩।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ছোটগল্পের সীমারেখা। প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৭৬, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন,  
১৪১২। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রোড, কলকাতা-৭০০০০৯।

নীহাররঞ্জন রায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)। প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর,  
২০০১। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩।

নীহাররঞ্জন রায়। ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৩। দে'জ পাবলিশিং,  
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৭৩।

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম। তৃতীয় সংস্করণ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) :  
২০০০ খ্রীঃ, ১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রসূন ঘোষ। উপন্যাসের নানা স্বর। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫। এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১,  
নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৭০০০৯০।

প্রদীপ বসু। বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যা চর্চা (নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ভাবনার ইতিবৃত্ত)। প্রথম প্রকাশ,  
জুলাই, ২০১১। চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ বি রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা  
৭০০০০১২।

বিপ্লব মাঝি। উপন্যাসের ভাষা। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৭। অঞ্জলি পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ

মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

বিজিতকুমার দত্ত। বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস। চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মাঘ ১৪০২। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

বিনয় ঘোষ। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৬৮। তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৯। প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

বিবেক সিংহ। ব্যোমকেশে শরদিন্দু শরদিন্দুর ব্যোমকেশ। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৪। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

মার্ক ব্লক। ইতিহাস লেখকের কাজ। ভাষান্তর - আশিস কুমার দাস, সম্পাদনা - প্রভাত দাশগুপ্ত। প্রথম বাংলা অনুবাদ সংস্করণ, ২০০৪। কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বিপ্লব গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

মানসকুমার সাঁতরা (সম্পাদিত)। ইতিহাস ও সাহিত্য : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২। উষা প্রেস, ৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৪।

মীনাঙ্কী মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস। প্রথম প্রকাশ, ২০০৩। খীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কোলকাতা-৭০০০২৬।

মৃগাল নাথ। ভাষা ও সমাজ। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯। সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯/সি শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ)। প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৬। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাস চিন্তা। প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৩। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

রমাপ্রসাদ চন্দ। গৌড় রাজমালা। প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০০৫। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম

চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ন্যারেটলজি : ছোটগল্প : ছোটদের গল্প। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৪।  
কোরক, দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯।

রবিন পাল। বাংলা ছোটগল্প : কৃতি ও রীতি। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৩। ব্রহ্মপুত্র প্রকাশন,  
শেখপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০৯৬।

রোমিলা থাপার। ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ - ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রথম প্রকাশ,  
জানুয়ারি, ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,  
কলিকাতা-৭০০০৭২।

রবীন্দ্র গুপ্ত। উপন্যাস জিজ্ঞাসা। গ্রন্থনিলয়, প্রথম প্রকাশ, ২৮শে আগস্ট, ১৯৯৫, কলকাতা-  
৭০০০০৯।

শ্রাবণী পাল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ, ২০১২, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫  
ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী-১১০০০১।

শিশিরকুমার দাশ। বাংলা ছোটগল্প। প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৬৩, পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর,  
২০০৭। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

শিশিরকুমার দাশ। কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল (অনুবাদ)। প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণের  
তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৩। প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা-৭০০০০৪।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬-২০০৭, মডার্ন  
বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

শ্রীভূদেব চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২, পঞ্চম প্রকাশ,  
পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬-২০০৭। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-  
৭০০০৭৩।

শ্রীভূদে চৌধুরী। ছোটগল্পের কথা। প্রথম প্রকাশ, ২০ মে, ১৯৯৪, পশ্চিম বাংলা আকাদেমি,  
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০।

শ্রীহরিশচন্দ্র পাল (সঙ্কলন)। গোসানীমঙ্গল। প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৩৮৪। শ্রীচন্দ্রশেখর পাল,  
সুনীতি রোড, কুচবিহার-৭৩৬১০১।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা। প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০২। বাউলমন প্রকাশন,  
২৮ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা-৭০০০১৯।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভারত সংস্কৃতি। ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৫। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

সুমিতা চক্রবর্তী। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়। প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪। পুস্তক বিপণি, ২৭  
বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর,  
২০০৩। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

ক্ষেত্রগুপ্ত। রমণীয় শরদিন্দু। প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০৮। গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা  
লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

ক্ষেত্রগুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি। প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, চতুর্থ প্রকাশ,  
মার্চ, ২০০৪।

ক্ষেত্রগুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০০২। গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি  
পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

গ. ইংরাজি গ্রন্থ :

**Forster, E.M. Aspects of the Novel.** First Indian Edition 2004. Doaba Pub-  
lications, 4497/14, Gurunanak Market, Nai Sarak, Delhi-11006.

**Lukacs, Georg. The Historical Novel.** Translated from the German by  
Hannah and Stanley Mitchell. First Published in England by Merin Press  
1962. Penguin Books Ltd. England.

**Maiti, Provatansu, Studies in ancient India.** First Edition, 1964. Twelve  
Edition, 2001. Shreedhar Prakashani, Publishers and Book Seller, 203/4D  
Bidhan Sarani, Kolkata-700006.

ঘ. পত্র-পত্রিকা :

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক)। বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী  
বিশ্ববিদ্যালয়। অষ্টাদশ সংখ্যা। মার্চ, ২০০১।

তাপস ভৌমিক (সম্পাদক)। কোরক সাহিত্য পত্রিকা (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা)। জানুয়ারি-  
মার্চ, ১৯৯৬। বইমেলা।

তাপস ভৌমিক (সম্পাদক)। কড়ি ও কোমল। ক্রোড়পত্র : শতবর্ষে শরদিন্দু, প্রকাশ কাল, ১৯৯৯।

তাপস ভৌমিক (সম্পাদক)। কোরক, সাহিত্য পত্রিকা। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক।  
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০০।

তাপস ভৌমিক (সম্পাদক)। কোরক সাহিত্য পত্রিকা। ১৪১১। বিষয়, চিঠিপত্র।

শ্রাবণী পাল (প্রধান সম্পাদক)। বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা। বাংলা বিভাগ। রবীন্দ্রভারতী  
বিশ্ববিদ্যালয়। চতুর্বিংশতিতম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০৬।

## পরিশিষ্ট

এই অধ্যায়ে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাচীন শব্দ ও জনপদের উল্লেখ করে তার পরিচয় ও ব্যবহারের তাৎপর্য আলোচনা করব। এখানে কিছু প্রাচীন শব্দ ও জনপদের পরিচয় দেওয়া হলো : পটমহাদেবী, মিথিলা, কুমরাহার, উজ্জয়িনী, বিজয়নগর, গৌড়, পুরোডাশ, স্থপতি, পরাত, নবপত্রিকা, ইন্দ্রকীলক, কুটমল, মুঙ্গের, বৈশালী, লিচ্ছবি, কঞ্চুকী ইত্যাদি প্রাচীন শব্দ ও জনপদের ব্যবহার ও পরিচয় সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো। উল্লিখিত প্রাচীন শব্দ ও জনপদগুলি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে কায় নির্মাণে ও প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্গঠনে কতটা জরুরী তারও বিশ্লেষণ করবো। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে প্রাচীন ‘কঞ্চুকী’ শব্দটির ব্যবহার আখ্যান নির্মাণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে নিচে তার আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য ভাঙারে লক্ষ করা যায় সুপ্রচুর প্রাচীন শব্দ ও জনপদের ব্যবহার। এগুলি কেন, কীজন্য তিনি ব্যবহার করেছেন তার সঠিক তথ্য ও যুগ মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করে মর্মোদ্ধার করাই আমাদের কাজ। কারণ আমরা জানি শব্দই ব্রহ্ম আর আধুনিক যুগে একটি শব্দের নানা অর্থ আমাদের চোখে এসে পড়ে। বক্তার তথ্য লেখকের অভিপ্রায়টিও জানা যায় এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। আমরা দেখি যে, শরদিন্দুবাবু শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ থেকে ভাষাতাত্ত্বিক প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করে ব্যবহার করেছেন। নিশ্চয় এর একটা স্বতন্ত্র অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। একদিকে একটি শব্দই একটি জাতির ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী হয়ে উঠতে পারে আবার পারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ধরিয়ে দিতে। উদাহরণ স্বরূপ শরদিন্দুর ‘বিষকন্যা’ গল্পে ‘কঞ্চুকী পরিধান করিলেন।’ (পৃ. ১৬১) কিন্তু যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ‘কঞ্চুকী’র পরিবর্তে ‘কঞ্চুক’ বলতে রাজী। সে যাইহোক শরদিন্দু বহু প্রাচীন শব্দ অনায়াসে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। ‘কঞ্চুকী’ কথাটির অর্থ হল - রাজ অন্ত:পুরের রক্ষক। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শরদিন্দুবাবুকে চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন — “জানিলাম, ‘টাউরি’ শব্দ কলিকাতা হাওড়া প্রভৃতি স্থান প্রচলিত আছে। আমি শব্দটির ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারি নাই। আপনার বিষকন্যা’য় একস্থানে আছে, ‘কঞ্চুকী পরিধান করিলেন’ — হইবে কঞ্চুক।” — আমি ‘বিষকন্যা’ গল্পটির নিবিড় পাঠে এরকম বাক্য পাই নি। সেখানে রয়েছে - “উল্কা যখন দেখিল মহারাজ সত্যই আসিলেন না, তখন সে বুকের কঞ্চুকী করবীর মালা ফেলিয়া দিয়া কেশ এলাইয়া সেই হিন্দোলায় গিয়া বসিল।” (বিষকন্যা, পৃ. ১৭১) অন্যত্র এই গল্পটিতেই আরও

চারবার ব্যবহৃত হয়েছে এই কঞ্চুকী শব্দটি। যেমন - “বিশ্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম! - কঞ্চুকী মহাশয় আমাকেও একটা শুকপক্ষী দিয়াছেন।” (বিষকন্যা, পৃ. ১৬৫) সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গল্পকার শরদিন্দু কঞ্চুক শব্দটিকে একবার রাজ অস্ত:পুরের রক্ষক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অন্যত্র এই গল্পটিতে আবার এক ধরনের পরিধান বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শরদিন্দু অম্নিবাসের ষষ্ঠ খণ্ডের ‘প্রাচীন শব্দে অর্থ’ অংশটিতেও কিন্তু এই ‘কঞ্চুকী’ শব্দটির করা হয়েছে রাজ অস্ত:পুরের রক্ষক হিসেবে। (পৃ. ৪২২) অন্যান্য গল্পেও আমরা এই শব্দটির ব্যবহার দেখি যেমন ‘মৃৎপ্রদীপ’ গল্পে — “সেতুমুখে কঞ্চুকীসেনা অহোরাত্র পাহারা দিতেছে।” (তদেব, পৃ. ৬০) অন্যদিকে রাজশেখর বসুর ‘চলন্তিকা’ ও শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’ (প্রথম সংকলিত) -এ এই ‘কঞ্চুকী’ শব্দের অর্থ রাজাস্তপুরের রক্ষক। ‘কঞ্চুক’ শব্দের অর্থ বর্ম, কবচ, কাঁচুনি, জামা ইত্যাদি। তবে ‘কঞ্চুকী’ অর্থে ‘বিষকন্যা’ গল্পে পরিধান বস্ত্র হিসেবে একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন। এই গল্পেরই অন্যত্র রাজাস্ত:পুরের রক্ষক হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করেছেন। তবে শরদিন্দু কি জেনেই এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিংবা না জেনে করেছেন — তবে জেনেই করে থাকবেন বলে আমাদের ধারণা। এছাড়াও তাঁর গল্পে আরও অনেক প্রাচীন শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। যেমন — ‘পুরোডাশ’, ‘স্থপতি’, ‘পরাত’, ‘নবপত্রিকা’, ‘ইন্দ্রকীলক’ ইত্যাদি। এই শব্দগুলি কিন্তু জাতিস্মর ধারার গল্পগুলি পাঠে লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দগুলি ব্যবহার করে তিনি করে তিনি পুনঃরায় প্রাচীন সময়কে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতেও এই একই প্রবণতা লক্ষণীয়। ‘প্রপাপালিকা’ শব্দটি ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসে ব্যবহার করে প্রাচীন কালের একটি রূপকেই পাঠকের সামনে তুলে আনতে চেয়েছেন। ‘প্রপা’ শব্দটি ‘ঋকবেদ’-এ ও ‘মনুসহিতা’য় পাওয়া যায়। ‘প্রপাপালিকা’ শব্দটির অর্থ জলসত্র। এগুলি পৃথিক মানুষের কল্যাণেই ব্যবহৃত হ’ত। লোকসমাজে প্রচলিত জলসত্র নামক ব্রতকথাও এই প্রপাপালিকা শব্দটির প্রাচীনতারই দ্যোতক। লক্ষণীয়, ‘কঞ্চুকী’ শব্দটি ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসেও রাজপুরীর রক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘রৌপ্যনির্মিত বাণ’ অর্থাৎ আধুনিক কাজললতা শব্দটিও এই উপন্যাসের পরিশিষ্টাংশে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের বিবাহ রীতি অনুসারে বিয়ের সময় কন্যার হাতে এই রৌপ্যনির্মিত বাণ রাখার নিয়ম ছিল। এটিও শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক। ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভূমিমাপের হিসেব কীভাবে করা হ’ত তার পরিচয় পাই ‘কুল্যাবাপ’ নামক শব্দটির ব্যবহারে। ‘কর্চরিকা’ শব্দটি ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। ‘ন্যাগ্রোধপরিমণ্ডলা’ শব্দটি ব্যবহারে লেখকের সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকর্ষণের কথা জানতে পারি। উপন্যাসিক শরদিন্দু ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসে ‘শহীদী’র শরবৎ পাণ করা অর্থে স্বর্গে

যাওয়াকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এভাবেই ঔপন্যাসিক প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করে সেকালের সমাজজীবন ভাবনাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ফলে উপন্যাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে প্রাচীন শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা স্পষ্ট লক্ষণীয়।

## নির্ঘণ্ট

অ

অতিপ্রাকৃত গল্প iv

অমিতাভ ২৩

অশীন দাশগুপ্ত ২১

আ

আদিম ২, ২০, ৬২

আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প ১৪২, ১৪৪

আনন্দমঠ ২০২

ই

ইন্দ্রতুলক ২৩, ২৪, ২৫

ইতিহাসাশ্রিত ৩৮, ৪৮, ৫১, ১৮৩

ইতিহাসাশ্রিত গল্প iv

ইতিহাস i

ইলছোবা ১৩

ইছামতী ১৭

উ

উপন্যাস ৬

উপলক্ষমাত্র ২

উত্তর ঐতিহাসিক ২

উত্তর জ্যোতিষ ৩২

উইঁ উনপঞ্চাশ ১৭৩

এ

একরাত্রি ১১

একস্বপ্ন ৮১

ও

ওহো ১৭৪

ক

কালের মন্দিরা ২, ৫, ২৩, ১২৪

কর্ণসুবর্ণ ১৫১

কালিদাস ১৭১

কুমারসম্ভবের কবি ১৭২

করণা ১৬

খ

খ্যাপন ৯৮

গ

গৌড়মল্লার ১৩৮, ১৩৯, ১৪০

জ

জঙ্গলগড় ১৮

জাতি ১৩২

জয়পাল ১৪০

জয়নাগ ১৪৭

ঝ

ঝিন্দের বন্দী ১১, ২০

ড

ডায়ালেকটিক্যাল ২০৮

ডক্কা নিশান ১৬

ত

তুঙ্গভদ্রার তীরে ১৮২, ২১০

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫

ন

নরপতি ১৪০

নানাসাহেব ১৬

নূরমহল ১৫

নয়পাল ১৬৮

প

প্রতিভাসুন্দরী ১৬

পুনর্নির্মাণ ২৩৯

ফ

ফুলজানি ১২

ব

বঙ্গের শেষ বীর ১৬

বীর পূজা ১৪

বাঙ্গালীর বল ১৪

ভ

ভালোবেসে ১৮৭

ভদ্রার ১৯৯

ভাষা ২০৮

ম

মহীপাল ১৫৮

মন্ত্রের সাধন ১৬

ময়ূখ ১৬

মোহনলাল ১৫

য

যোগরানী ১৬

র

রাজারামকৃষ্ণ ১৫

রাণীভবানী ১৫

ল

লুৎফউল্লা ১৬

লক্ষ্মীকর্ণ ১৬৮

শ

শীলভদ্র ১৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯, ১৬৩

শশাঙ্ক ১৬

শক্তিকানন ১২

স

স্বপ্ন সুন্দরী ১৬

সালুভ ১৮৫

সর্বঞ্জ ২৩৪

হ

হ্যালুসিনেশন ১৪৬

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৪৬

হিজল

ISSN 2349-8013

প্রকাশ : জুন, ২০১৭



হিজল ISSN 2349-8013 জুন ২০১৭

# হিজল

বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী

ষাণ্মাসিক-পত্রিকা

(রেফারিড জার্নাল)

বর্ষ-২৪, সংখ্যা-১ম

জুন, ২০১৭

সম্পাদক

সৌরভ রায়

E-mail address: hijal680@gmail.com, souvra680@gmail.com

Website: hijalpatrika.wordpress.com

হিজল ISSN 2349-8013 জুন ২০১৭

www.hijalpatrika.com

হিজল

Hijal

ISSN 2349 - 8013

A bi-annual journal based on researchoriented literary and cultural discourse.

(Refereed Journal)

বর্ষ - ২৪, সংখ্যা - ১ম

প্রকাশ - জুন, ২০১৭

সম্পাদক : সৌরভ রায়

অক্ষর বিন্যাস - দীপতনু মাল্টিমিডিয়া, শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার

প্রচ্ছদ - বিদ্যুৎ সূত্রধর

মুদ্রণ - টেকনো ওয়ার্ল্ড, শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার

বিনিময় - ১০০ টাকা মাত্র

রাজু সাহা কর্তৃক

শামুকতলা, পোঃ সান্তালপুর, জেলা - আলিপুরদুয়ার, ৭৩৬২০৬ থেকে প্রকাশিত।

E-mail address : hijal4680@gmail.com, sourav4680@gmail.com

Website : [hijalpatrika.wordpress.com](http://hijalpatrika.wordpress.com)



## শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসশ্রিত কথাসাহিত্যের কখনকৌশল ও ভাষারীতি

সাবলু বর্মণ

“বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সমাজচিত্র বেশি পাই না।”<sup>১</sup> কথাটা অংশত সত্য হলেও এক বাক্যে স্বীকার করা যায় না। কারণ একজন লেখক দেশ-কাল-সময়শ্রয়ী ইতিহাস-নির্ভর আখ্যান রচনা করেছেন তাতে হয়তো ‘ব্যক্তি চরিত্র’ বা ‘বীর চরিত্র’ (Hero worship) বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বলা যায়, মহৎ করে দেখানো হয়েছে ইতিহাসের বীর যোদ্ধা ও পৌরুষদীপ্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের। তবে সমাজচিত্র বড় হয়ে ওঠেনি তা নয়। প্রকৃত ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাসে অতীতের স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী সমান গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়। প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত হয় না; ইতিহাসের সত্যেরও হয় না অপলাপ। এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসবীরের পারিপাশ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজচিত্রটাই বিধৃত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসশ্রয়ী কথাসাহিত্যগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতিহাসশ্রয়ী দু’একটি ছোটগল্পে ইতিহাসবীরের চরিত্র পুনঃসৃষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজ পারিপাশ্বিকতা বাদ পড়েনি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই চরিত্র পূজা তিনি করেন নি। সেকালের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই তা বোঝা যায়। যেমন — ‘কালের মন্দির’, ‘গোড় মন্দির’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ও ‘কুমারসম্ভবের কবি’। ‘কুমারসম্ভবের কবি’তে কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি বিধৃত হলেও সেকালের সমাজ নগর জনপদ ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা যায়, সেকালের সামগ্রিক সমাজজীবন যেন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসটির আখ্যানবস্তুতে।

বস্তুত এক সময় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকগণ বীরবিক্রমকেশরী ইতিহাসের রাজা-সম্রাট-বাদশাহগণের চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী থেকেছেন। তখন ইতিহাস বীরেরাই বড় জায়গা দখল করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের তিনের দশকের কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রবণতায় জল ঢাললেন। তিনি ইতিহাসের প্রকৃত চর্চা ও অনুশীলনে ব্রতী হলেন। ইতিহাস মানে কি শুধুই বীর ব্যক্তি চরিত্রের উপস্থাপনা? তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে। তাইতো ইতিহাসের প্রকৃত রূপ বলতে যা বোঝায় সেই প্রকৃত বিষয়টিই তিনি তার রচনায় স্থান দিলেন। বলা যায়, ইতিহাস হল — “মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল যথার্থ ইতিহাস।”<sup>২</sup> অতএব, বলা যায়, ইতিহাস মানুষের বেড়ে ওঠার কাহিনি। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে বেড়ে ওঠার কাহিনি যাদের শাস্ত্রত সত্য ঘটনা, সেহেতু ইতিহাস আলোচনায় সমাজ বাদ পড়তে পারে না নিশ্চিতভাবে। যাদের লেখায় সমাজ মূল্যবান নয়, শুধুই ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও সাধনা দুই-ই

একদেশদর্শিতার পরিচয় দেয়। কেননা ইতিহাস সৃষ্টি ও সংরক্ষণ যুগপদ সমাজের অন্তর্গত মানুষই করে।

যাইহোক, উনিশ শতকে ইতিহাসমূলক আখ্যান রচনার যে প্রবণতা তা ক্ষীণ হতে শুরু করেছে বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের হাতে। বস্তুলীন মনোভাব ও জনতার ছাপ দুই-ই এই সময়ের লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি — মানুষই ইতিহাস গড়ে আবার অর্বাচীন মানুষই ইতিহাস পুনঃসৃষ্টি করে। সাহিত্যের আধারে যাঁরা ইতিহাস পুনঃসৃষ্টি করেন তাঁরা লেখক সাহিত্যিক। ইতিহাসের সত্য ও তথ্যের নিরিখে কল্পনা মিশিয়ে প্রকৃত মানবরস সৃষ্টি করেন। যদি কেউ বলে থাকেন ইতিহাস লেখক কখনোই সেটা করেন না তা সম্পূর্ণ ভুল। শুধু কেটে ছেটে জোড়া দিয়ে সাজিয়ে দিলেই ইতিহাস লেখার কাজ সম্পন্ন হয় না। হাজার হাজার বছর পূর্বকাল ইতিহাস যখন কোনো একজন ঐতিহাসিক লেখেন তখন কি তার কল্পনা কাজ করে না? মনে হয় করে। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে — “Filled up the narrative of caesar's doings with fanciful details such as the names of the persons he met on the way, and what he said to them, the construction would be arbitrary: it would be in fact the kind of construction which is done by an historical novelist.”<sup>৩</sup>

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাস-প্রসঙ্গ আলোচনা করব। কারণ, সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক, চেতনাপ্রবাহধর্মী, কারাধর্মী, কাব্যধর্মী প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসধর্মী আখ্যানমূলক উপন্যাসের পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও প্রত্যেকটি প্রকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগঠনমূলক তবুও বলা যায় উপন্যাসের সত্যের খাতিরে প্রকরণগুলি এক গোত্রভুক্ত।

প্রকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার পূর্বে ‘প্রকরণ’ কি, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। গুণময় মাম্বা তাঁর “বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাত্মিক” বইয়ে ‘প্রকরণ’ বিষয়টিকে এভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি মূলত ‘Form’ এবং ‘Content’-এর মধ্যে ‘Content’-কে ‘Form’-এর অঙ্গ হিসেবেই দেখেছেন। কেউ কেউ আবার এই দুয়ের পার্থক্য নিয়েও মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন মার্কসীয় সাহিত্য দর্শনে এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। বাংলা রচনার ক্ষেত্রেও উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য চোখে পড়ে। গুণময় মাম্বার ব্যাখ্যায় ‘প্রকরণ’ হ’ল একথায় শিল্প। অন্যার্থে করণ বা রূপায়ণ, আর আঙ্গিক কথার অর্থ হ’ল অঙ্গের করণ। দু’টো কথাতেই করণ শব্দটি সমতুল অর্থে ব্যবহৃত হলেও দু’টো কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিল্প হচ্ছে সামগ্রিক রূপকৃতি আর শিল্পাত্মিক রূপকৃত্যের বিভিন্ন দিক। বলা যায়, বিষয় কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা, নাটকীয়তা, কবিত্ব, তত্ত্ব, ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দর্শন, লেখকের জীবন দর্শন, দৃষ্টিকোণ, প্রতিবেশ ও সময় বা কাল শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ। উক্ত অঙ্গের সংযোজনায গোটা শিল্পের ছাদ তৈরি হয়। শিল্প তার যথার্থ শিল্পীত রূপ পায়। উল্লেখ্য কোনো কোনো সমালোচক। Content এবং Form কে সূক্ষ্মতার দিক থেকে পৃথক করে দেখেছেন। আমরা বলতে পারি,

উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য চোখে পড়লেও একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের সমন্বয়ে শিল্প তৈরি হয়। এমনকি শিল্প শৈলীর পরিপূরকরূপ প্রকরণ বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়। প্রকরণ বিন্যাসে যে শিল্পী যত বেশি পারঙ্গম সাহিত্য জগতে তিনি তত বেশি আদরণীয় ও অবিস্মরণীয়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাস ও বিচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া যাক।

শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ কৌশল বিশ্লেষণে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে আখ্যান-বিন্যাস, চরিত্র বিশ্লেষণ ও ভাষাশৈলীর প্রসঙ্গ। তাঁর রচিত আখ্যান মূলত স্বতন্ত্র ধরণের। প্রথাগত আখ্যান নির্মাণ পদ্ধতির পথ ছেড়ে তিনি নিজস্ব রচনা রীতির ওপর নির্ভর করে সাহিত্য সৃজন করেছেন। সেক্ষেত্রে অতীত ইতিহাসের পটভূমি ও প্রতিবেশকে আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করে দূরকালের জীবনচিত্রকে বর্তমানকালের জীবনপটে বিধৃত করেছেন। এর জন্য কিন্তু তাকে জাতিস্মর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তার রচনা। অন্যদিকে চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপন ও ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার আখ্যানকে আরও মজবুত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রেখেছি। শুধু তাই নয়, তিনি কীভাবে, কী উপায়ে, এই অভিনব প্রকরণ কৌশলের প্রয়োগ ঘটালেন তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে গেলে প্রথমেই লেখকের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। তার মতে style দেখাবার প্রয়োজন নেই, মনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিটিকে প্রকাশ করাটাই একান্ত জরুরী। তাহলেই style আপনি স্বতোৎসারিত হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তিনি এও বলেন যে, ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতন, বেতো ঘোড়ার মতন নয় — শুধু গতিবেগ নয় — ছোট্টার মধ্যেও যেন সৌন্দর্য ফুটে বেরোয়। — এরকম মন্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিছক বাঁধাধরা style সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অমনোযোগী। তবে ভাষার যথাযথ প্রয়োগের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। কেননা, তিনি বলতেন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটিও যেন অযথা শব্দ এসে না পড়ে। তার ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যগুলিতে সেই কথারই যথাযথ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যটি লক্ষ করবার মতো — “শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তার ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তার ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগর সঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুশ্কিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই — স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর।” (শরদিন্দুর অমনিবাস ১-ম খণ্ডের ভূমিকাংশ)। সাহিত্যিক রাজশেখর বসুও শরদিন্দুর ভাষা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। লক্ষণীয় শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প উপন্যাস পাঠে তা উঠে এসেছে। তিনি যখন জাতিস্মর ধারার ইতিহাস প্রসঙ্গ মূলক গল্পগুলি লেখেন সেখানে ভাষা হয়ে ওঠে ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা। ওজস্বী, আড়ম্বরপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর। তাঁর ব্যবহৃত ভাষাই যেন চিনিয়ে দেয় এই গল্প-উপন্যাসটি তাঁর রচনা। এখানে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে

ধ্রুপদীযুগের জীবনচিত্রের পরিপূরক। প্রাচীন ভারতীয় প্রবহমান সংস্কৃতির চিত্র অঙ্কনে প্রবহমান ভাষারই ব্যবহার লক্ষণীয় তার লেখাগুলিতে। উদাহরণ আহরণ করলে বিষয়টি বোঝা যাবে। — “তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তসী; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংককফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে।” (সেতু, পৃ. ১৯৩) ‘সেতু’ গল্পটি ব্যতিরেকেও ‘রুমাহরণ’, ‘অমিতাভ’, ‘রক্তসন্ধ্যা’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে লেখক অতীত যুগ জীবনকে বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করতে গিয়ে উল্লিখিত ভাষা রীতিরই আশ্রয় নিয়েছেন। উপন্যাসগুলিতেও এর প্রমাণ মিলবে। অন্যদিকে খাঁটি ইতিহাসনির্ভর গল্পগুলিতে কিন্তু সাধু-চলিত ও চলিত-সাধু উভয় রীতির পরিচয় পাই। যেমন — ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পে — “ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কালরাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম’ খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না। এমন মানুষ আমি দেখি নাই। পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।” স্পষ্টতই লক্ষণীয় ব্যবহৃত এই ভাষা আমাদের অন্য চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে সাধুচলিত আবার চলিত-সাধুরীতির প্রয়োগ কী অপূর্ব! ‘গুরু-চণ্ডালী’ ভেদাভেদকে তিনি মান্যতাই দেননি। ফলস্বরূপ, প্রথম বাক্যের শেষে ‘পড়তে পড়তে’ চলিত রীতির ক্রিয়াপদ, পরক্ষণেই দ্বিতীয় বাক্যে কথকের কথায় ‘পড়িতে পড়িতে’ সাধু রীতির ক্রিয়াপদে পরিণত হয়েছে। এরকম বহু উদাহরণ চোখে পড়বার মতন। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, কথাকার ভাষার গতিকে প্রবহমান করতে চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরূপ উদঘাটন করতে, ক্রিয়াপদের জাড্যদোষ মুক্ত করতে, আখ্যানের সাবলীল গতি আনতে এরকম মিশ্র রীতির ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন। পেয়েছেন কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, ভারততাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদদের অকৃত্রিম প্রশংসাও। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির আরও সম্ভাবনাময় দিকগুলি কীভাবে প্রকটিত করা যায় সেদিকে লক্ষ রাখব।

তার উপন্যাসের ভাষাতে এসেছে ধূসর মায়াময় জগতের বাস্তব রূপচিত্র। প্রাচীন কালের অনির্দেশ্য চিত্রাঙ্কন, সংস্কৃতির অন্তর্বলয়, গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মানুষে মানুষে হানাহানি, জটিল জীবনাবর্ত, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা ও দ্বন্দ্বমথিত প্রেম তাঁর উপন্যাসগুলিতেও বর্তমান। ‘ভৃঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি থেকে উদাহরণ চয়ন করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। — “কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দুটি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্নিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল।” (ভৃঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৪৬) রূপাসক্তি, লোভ, লালসা, উদগ্রকামনা মানুষকে যে কতটা নৈতিক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ এই উপন্যাসের কম্পনদেব চরিত্রটি। নারীর প্রতি অনির্বাক্য মোহ শুধু সে যুগে

কেন এযুগেও বর্তমান, ভবিষ্যতেও থাকবে। লেখক শরদিন্দু কৌশলে মানুষের অমিতাচারী জৈবিক ক্রিয়াকে চিরকালের সমস্যা রূপে দেখাতে চেয়েছেন। বিপ্রতীপভাবে মহারাজ দেবরায়কে শৌর্ষবীর্য ও শান্ত সমাহিত জৈবিক মানুষ রূপে অঙ্কন করেছেন। জৈবিক চাহিদা মানুষের সহজাত। কিন্তু মানুষই পারে তাকে শুচিন্মিত করে তুলতে। যিনি পারেন তিনিই তো মহৎ। যিনি পারেন না। তিনি তো অসৎ। এই দুই বিপরীতমুখী ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব লেখক রূপদঙ্কের মতো চিত্রিত করেছেন। স্বভাবতই, প্রকরণ বিচার প্রসঙ্গে ভাষা, কাহিনি-বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে। এখানে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিচার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়নের অবকাশ রয়েছে।

প্রকরণ বিচারে শরদিন্দুবাবু যে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন তা তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যগুলি পাঠে স্পষ্টভাবে জানা যায়। লেখকদের জনপ্রিয় সর্বজনকথন রীতিকে আদর্শ করে তিনি তাঁর রচনাগুলির প্রাতিশ্চিকতা বজায় রেখেছেন - এতেই তাঁর মৌলিকতা ও সাহিত্যিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাসাহিত্য মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পের জগৎ নিয়ে তৈরি। উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু প্রাকরণিক যোগ থাকলেও বৈসাদৃশ্যই বেশী চোখে পড়ে। উভয়ের প্রাণ কথা হলেও সাহিত্য পদবাচ্য হিসেবে কথার স্ফুরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং উভয় শাখার পৃথক পৃথক মূল্যায়ন জরুরী হয়ে ওঠে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল্যায়নে সেই পথেই হাঁটা আবশ্যিক।

ছোটগল্পের সার্থকতা নির্ভর করে তার রূপ, রচনারীতি, গঠন-কৌশল ও বিষয়-বৈচিত্র্যের অভিনব উপস্থাপন ভঙ্গির ওপর। ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহারও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ছোটগল্পে ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন ছোটগল্পকারকে অতিসতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পরিমিত ভাষাবোধ, অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জন, ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষাই ছোটগল্পের একমাত্র কাম্য; নোতুবা অনৌচিত্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হতে পারে। ছোটগল্পের আখ্যান-নির্মাণে লেখকের স্বাধীনতা যেহেতু ন্যূন সেহেতু লেখককে স্বল্প পরিসরে খণ্ড-খণ্ড প্রতীতির মধ্যে দিয়ে জীবনের সামগ্রিক ছবি আঁকতে হয়। তবে বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ পরিসরের রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পও বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধিবদ্ধ ছোটগল্পের পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ পরিসরে অনেক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প রচনা করেছেন। বিংশ শতকের তিরিশের দশকের কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই পথেই হেঁটেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক সফলতাও অর্জন করেছেন। 'শঙ্খ-কঙ্কণ', 'বিষকন্যা' ইত্যাদি গল্পগুলি তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। এই গল্প-দ্বয়ে তিনি ছোটগল্পের সীমারেখাকে অতিক্রম করেছেন। তথাপি তার গল্প-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই গল্প-দ্বয় রসোত্তীর্ণতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। রস-সৃষ্টিই যেহেতু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য সেহেতু তিনি গল্পের আয়তন রচনার বিধিবদ্ধ নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির নিবিড় পাঠে দু'টি ভিন্ন পথের সন্ধান মেলে। একটি তাঁর খাঁটি ইতিহাসাশ্রয়ী ছোটগল্প এবং অন্যটি জাতিস্মর-প্রসঙ্গমূলক ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প। তার রচিত সর্বমোট সত্তেরোটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তার

মধ্যে 'ইন্দ্রতুলক', 'প্রাগজ্যোতিষ', 'আদিম', 'অষ্টম সর্গ', 'মরু ও সঙঘ', 'শঙ্খ-কঙ্কণ', 'রেবা রোধসি', 'চুয়াচন্দন', 'বাঘের বাচ্চা', 'তক্ত মোবারক', 'চন্দন-মূর্তি' প্রভৃতি গল্পগুলি বিস্ময়কর ইতিহাসের উপাদানে স্বমহিম হয়ে উঠেছে। আর 'রুমাহরণ', 'অমিতাভ', 'বিষকন্যা', 'সেতু', 'মুৎপ্রদীপ' ও 'রক্ত-সন্ধ্যা' প্রভৃতি গল্প যষ্ঠতে বিস্ময়কর ইতিহাস-প্রসঙ্গ জাতিস্মরণ প্রকরণ-কৌশলের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস-মূলক গল্পগুলিতে ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র, প্রতিবেশ, অতীতযুগের জীবনযাত্রা ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় উঠে এসেছে লেখকের গল্প বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। সেখানে লেখক ইতিহাসের ধূসর জগতকে নিপুণভাবে তুলে এনেছেন ছোটগল্পগুলির পাতায়-পাতায়। বর্তমানের প্রেক্ষিতে অতীতের রোমান্স, অতীতের আলোছায়া বেষ্টিত অধ্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগচিত্র ও জীবন-যাপন প্রণালী শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসশ্রিত ছোটগল্পগুলির প্রাণ। নিছক ইতিহাসের তথ্যকে তিনি তাঁর গল্পে স্থান দেননি, ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনাকে সত্যরূপ দান করবার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। অতীত গৌরবকে গৌরবান্বিত করে তুলতে ধ্রুপদী যুগের গাভীর্যপূর্ণ ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভবনের প্রতি তাঁর সনির্বন্ধ দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ইন্দ্রতুলক', 'আদিম', 'প্রাগজ্যোতিষ', 'অষ্টম সর্গ' প্রভৃতি অন্যান্য ইতিহাসশ্রিত ছোটগল্পগুলি তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ।

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের আখ্যান-নির্মিতির সন্ধানে তিনটি বিশেষ বিশেষ প্রকরণ কৌশল বা রচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি হল — প্রথম পুরুষবাচক তথা সর্বজ্ঞ কখনরীতির (Omniscient point of view) দৃষ্টি-ভঙ্গি, মধ্যম পুরুষবাচক ও উত্তম পুরুষবাচক কখনভঙ্গি। আবার কেউ কেউ উল্লিখিত প্রকরণ কৌশলগুলির পাশাপাশি ভূমিকানুগ কখন পরিস্থিতির (Figural narrative situation) কথাও বলেছেন। অন্যদিকে ছোটগল্পের নির্মাণ-কৌশল বিষয়টিও তিনটি পদ্ধতিতে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন — অপ্রত্যাশিত চমক (Whipcrack ending) বা পাঠকে স্তম্ভিত করে দেওয়া পদ্ধতি, এই চমক যারা পছন্দ করেন না তারা আবার ধীরগতিতেই গল্পের সমাপ্তিকেই পছন্দ করেন (Stair step ending), তৃতীয়ত; একদল গল্পকার আছেন যারা যুক্তিপূর্ণভাবে ছোটগল্পের নির্মাণ-কৌশল পদ্ধতিকে অবলম্বন করে ছোটগল্পের সমাপ্তি হোক সেটাই তারা পছন্দ করেন (Logically ending)। এছাড়াও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে মপাশা ও চেকভের ছোটগল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গে দু'ধরণের গঠন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। যথা; অপ্রত্যাশিত চমক (Whipcrack ending) এবং ধীর স্বাভাবিক পরিণাম। অর্থাৎ বলা যায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত আলো যেমন ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ছোটগল্পের সমাপ্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন এই গোষ্ঠীর লেখকগণ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলি কিন্তু চেকভের ঢং-এ কিছুটা লিখিত। যেমন লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো কথাসিদ্ধীরা। পাশাপাশি অমিতাভ দাসের 'আখ্যানতত্ত্ব' গ্রন্থে বাভেনিস্ত, রোলাবার্ত, প্রপ, তোমাশেভস্কি এবং চ্যাটম্যানের প্রসঙ্গ সূত্রে আখ্যান সম্পর্কে কিছু কিছু

পরিভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যা একে অপররের সমতুল বলে মনে করা হয়েছে। যেমন - Fabula, Sjuzhet, Discourse, Story ও Histoire। তবে আখ্যান সম্পর্কে Discourse শব্দটিকে অনেকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেকগুলো ঘটনার ক্রমবিন্যাস যখন কার্যকারণ সূত্রে, যুক্তি নিরিখে বর্ণিত হবে তখনই কিন্তু Discourse-এর জন্ম হয়। এই Discourse-ও অনেক সময় বাচন অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখি। আবার এই বাচনের কতগুলি উপাদান রয়েছে, যেমন - বিষয়, চরিত্র, সংলাপ, নিরীক্ষণ বিন্দু, সময় ও স্থান ইত্যাদি। এভাবেই একটি কাহিনি বা ঘটনা ক্রমপরম্পরায় আখ্যানের রূপ পায়। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বলবার অবকাশ রয়েছে। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে কিছু কথা বলা হ'ল। সমালোচক আলোক রায়ও তাঁর 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে 'ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড'-এর প্লটের গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সর্বজ্ঞ কথনরীতিটি বেশ জনপ্রিয় রীতি। এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই বিশ্বের খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকেরা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এই কথনরীতিতে একজন লেখক কথকের ভূমিকা পালন করেন এবং প্রত্যেক চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মেজাজ অনুযায়ী তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে আখ্যান-বস্তুতে স্থান দেন। কথক ক্ষমতাবলে তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের বিশেষ বিশেষ গুণের ও ভাবাদর্শের বাণী বাহকরূপে সৃজন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের প্রধান বাণীবাহক চরিত্র গোরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও এই রীতির উপন্যাস ও ছোটগল্পে পটভূমিকানুগ করে চরিত্র গুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। এই সমস্ত আখ্যানে লেখকের ভাষা হয় মূলত বর্ণনামূলক ভাষা। এই বর্ণনামূলক ভাষার মাধ্যমে একজন লেখককে তাঁর সৃষ্ট উপন্যাস ও ছোটগল্পকে রসাবেদনের স্তরে উন্নীত করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পিতরূপদান করাই বাঞ্ছনীয়। লেখক প্রকৃতির বর্ণনা, সমাজের বর্ণনা, পারিবারিক জীবনচিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি আখ্যান-বস্তুর রসানুভূতির নিরিখেই করে থাকেন। বর্তমান এ প্রবন্ধটিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাত্মক কথাসাহিত্যের আখ্যান কীভাবে গঠিত হয়েছে তার সম্যক পরিচয় তুলে ধরা যাক।

বাংলা কথাসাহিত্যের তিরিশের দশকের কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রথম পুরুষবাচক কথন ভঙ্গিটিকে আয়ত্ত করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সেখানে তার ভাষা হয়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীদের অন্তরঙ্গ প্রাণ। এক্ষেত্রে কথাকার প্রবহমান ধ্রুপদী, সংস্কৃতজাত তৎসম ভাষার বহুল প্রয়োগে দূর-অতীতের জীবন প্রণালীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। অনেকাংশেই তা সর্বাধিক সফলতাও অর্জন করেছে। শরদিন্দুবাবুর 'অষ্টম সর্গ' নামক গল্পটি থেকে উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে - "ঘাট নির্জন। অন্যদিন এই সময় বহু স্নানার্থিনীর ভিড় লাগিয়া থাকে; তাহাদের কলহাস্য ও কঙ্কণ কিঙ্কণী মুখরভাবে শিপ্রাকে উপহাস করিতে থাকে; তাহাদের ঘটোচ্ছলিত জল মসৃণ সোপানকে পিচ্ছিল করিয়া তোলে। আজ কিন্তু ভিড় নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণী বধু আকাশের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিয়া ঘট ভরিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিতেছে। ক্লেচ্ছ একঝাঁক কিশোরী বয়স্যা মঞ্জীর বাজাইয়া গাগরী ভরিতে আসিতেছে; তাহারাও অল্পকাল জলক্রীড়া করিয়া পূর্ণ ঘট কক্ষে চঞ্চল চরণে

সোপান আরোহন করিয়া প্রস্থান করিতেছে। নির্জন ঘাটে সন্ধ্যার ছায়া আরও ঘনীভূত হইতেছে।”

শুধু তাই নয়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির প্রধান অবলম্বন সংস্কৃতজাত তৎসম শব্দ সমূহ। কেননা ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে যেহেতু অতীত যুগের জীবনচিত্রের বর্ণনা দান করেছেন সেহেতু তিনি গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দের ব্যবহার করেছেন। বস্তুত ধ্রুপদী যুগের উপস্থাপনায়, যুগ চিত্রের বর্ণনায়, অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বর্ণনায় এই গুরুভার তৎসম জাতীয় শব্দই একমাত্র কাম্য। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি এ ব্যাপারে গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বঙ্কিমীয় ভাষা শরদিন্দুবাবুর লেখায় অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে। তবুও শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত সাবলীল। ভাষার এই সাবলীলতা সর্বদাই তিনি বজায় রেখে গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তার রচিত ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির পাঠে সত্যিই মন ভরে যায়। অন্য এক অলৌকিক আনন্দের জগতে আমরা প্রবেশ করি। কোনো কোনো ইতিহাসাশ্রিত গল্পের পরিসর দীর্ঘ হলেও ভাষার প্রবাহে, আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুতে পাঠককে শেষ অবধি ধরে রাখে। পটভূমির চিত্রাঙ্কনের সুনিপুণ বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য। বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পটভূমির ছবি তিনি আঁকতেন। বিষয় যদি গুরুগম্ভীর হয় সেই পটভূমিকার ভাষাও হবে অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ।

‘সেতু’ গল্পে প্রকৃতির যে রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে — “একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কম-অরুণিত সায়াহ্নে। উজ্জ্বলিনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুষ্ঠন নাই — লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুল চরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢুলু ঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কম প্রলিঙদেহা নাগরী এক তরুণলয় হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনও মৃগ নয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে — তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কম দিয়াছ। প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাত নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গৃঢ়-হাস্য মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুষন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কর্ণের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।” — গল্পের পাত্র-পাত্রীর অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলিয়ে শরদিন্দুবাবু এখানে গল্পের পটভূমি সৃজন করেছেন। অর্থাৎ চরিত্রের অন্তর্ভাগ্য বহিঃপ্রকৃতির আলোকে অঙ্কনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পটভূমি যেন পাত্র-পাত্রীদের অন্তর্ভাগ্যতকে চিনিয়ে দেয়।

লক্ষণীয় পটভূমি নির্মাণের ভাষাও অত্যন্ত বিলাল ভাষা, বিশেষ করে বসন্তোৎসবের বর্ণনার ভাষা পাঠককে বিস্মিত করে তোলে। কখনো কখনো করুণ রসের বর্ণনায়, কারণ্যময়তায় আমরা কেঁদে উঠি। ‘অমিতাভ’ গল্পের দিঙনাগের বাস্পোচ্ছ্বসিত কান্নাই তার প্রমাণ। লেখক সৃজনী বলে সহৃদয়-হৃদয়সম্বাদী পাঠকের অন্তরে করুণা মিশ্রিত ভক্তি বিগলিত রসের সঞ্চার

ঘটিয়েছেন। আবার কখনও কখনও ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রুরতা-নিষ্ঠুরতার প্রকাশেও সিদ্ধি অর্জন করেছেন। ব্যঙ্গকৌতুক তথা হাস্যরসের অবতারণা করে পাঠককে গুরুগম্ভীর বিষয়ের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, হাসির অন্তরালে কখনও কখনও মানব চরিত্রের অসঙ্গতির ছবি তুলে ধরতেও তিনি সদা তৎপর ছিলেন। 'বিষকন্যা' গল্পের বাটুক চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। — “বাটুক দ্রুত পলায়ন করিতে করিতে বলিল — মহারাজ, ও ইচ্ছা দমন করুন, আমি শয্যায় শুইয়া শুইয়া মরিতে চাই।” মহারাজ সেনজিৎ বাটুককে শূলে চাপিয়ে মারবার কথা বলতেই বাটুক উল্লিখিত কথাগুলি বলে। কথাগুলি শোনা মাত্রই আমরা হেসে উঠি। আমাদের মনে পুলকের সঞ্চার হয়। আবার নিষ্ঠুরতা ও ত্রুরতা প্রকাশে আমাদের মন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালের মানুষের জীবনের খুব বেশি মূল্য ছিল না, খুব সহজেই মানুষকে হত্যা করা হত। মানুষ সর্বদাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। সেই যুগচিত্রকে তুলে আনতে লেখক বিষয়োপযোগী ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

ভাষারীতি সম্পর্কে শরদিন্দুবাবু ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। তবুও তাঁর রচিত ইতিহাসশ্রিত গল্পগুলিতে সাধুরীতি ও চলিত রীতি উভয় প্রকার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচকেরা যাকে 'গুরু-চণ্ডালী' দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করলেও শেষ পর্যন্ত শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষা মোহনীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি যেন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে তৎসম, তদ্রূপ, সাধু-চলিত রীতির শব্দ এবং ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ভাষার জগতে এক অনন্যভূবন নির্মাণ করেছেন। যুগপৎ সাধু ও চলিত রীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহারে গল্পের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনভঙ্গি অতিশয় সাবলীল হয়ে উঠেছে। রাজশেখর বসু যথার্থই বলেছেন — “আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকেরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প ক'জন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই — আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধ হয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ।”<sup>৪</sup> প্লট বা আখ্যান, নির্মিত ভাষারীতি ও বর্ণনার কৌশলও সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আজও তাঁর গল্প সম্পর্কে পাঠকের ঔৎসুক্য রাজশেখর বসুর মূল্যবান মন্তব্যকেই স্মরণ করায়। জনপ্রিয়তার প্রতুলতার জন্যই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য আজও সমানভাবে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে — ইন্দ্রতুলক গল্পের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে —

“ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কাল রাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম —’

খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না। এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্য ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।’

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাল রাতে কি খেয়েছিলেন?'  
 পণ্ডিত বলিলেন, 'মনে নেই। গিম্বি বলতে পারেন।'  
 গৃহিণী বলিলেন, 'কঁকড়ার ঝোল আর ভাত।'  
 বলিলাম, 'বুঝেছি, ইংরেজিতে যাকে নাইট্ মেয়ার আপনি তাই দেখেছেন আমি এবার উঠি।'  
 পণ্ডিত বলিলেন, 'আরে বোসো, চা খেয়ে যাও। - ভূগোল পড়েছ?'  
 বলিলাম, 'ভূগোল? ইতিহাসের স্বপ্ন দেখলেন, তার মধ্যে ভূগোল। ইঙ্কুলে পড়েছিলুম বটে।"

মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদ ব্যবহারের কখনরীতিটিও কোনো কোনো সাহিত্যিকের রচনায় লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তার সফল প্রয়োগও লক্ষণীয়। তুই, তুমি প্রভৃতি সম্বোধনপদ অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের সঙ্গে চরিত্রের হৃদয়তা বাড়ায়। সেদিক থেকে লেখকের সৃষ্টি চরিত্রগুলো বাস্তবের কাছাকাছি চলে আসে। তবে সাহিত্যিকেরা এই রীতিটিকে সব সময় ব্যবহার করেন নি। স্বাভাবিক ভাবে এই রীতির সাহিত্যিকর্ম খুব বেশি চোখে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশের দশকের কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষের 'রেণু তোমার মন' উপন্যাসটি মধ্যম পুরুষবাচক কখনরীতিতে লেখা। শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে এই মধ্যম পুরুষবাচক কখনরীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'সেতু' গল্পটির প্রথম এবং শেষ কয়েকটি পংক্তি লেখক মধ্যম পুরুষবাচক কখনরীতির ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। সেখানে 'তুমি' মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষণীয়। কিন্তু তা উহ্য রয়েছে। লেখকের ভাষায় - "হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ... পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমস্ত্র স্বরে বলিল, লিখে রাখ, ওরা চৈত্র ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম ...।"

উত্তম পুরুষবাচক কখনরীতি প্রাচ্য ও পাক্যাত কথাসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় রীতি। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এই উত্তমপুরুষবাচক কখনরীতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে। মূলত আমি, আমরা ইত্যাদি সর্বনাম বাচক পদ ব্যবহার করে লেখক এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। Interior monologue বা আত্মকথন রীতিতে বিশেষত চরিত্রদের সচেতন-অসচেতন ক্রিয়ার বিষয়টিও লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে একজন চরিত্রের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভাব্যসূত্রে গড়ে ওঠে। এই তিন কালের যোগসূত্রও স্থাপিত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিস্মরমূলক গল্পগুলিতেও সেই সংযোগ সেতুরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'অমিতাভ', 'রক্ত-সন্ধ্যা', 'মৃৎপ্রদীপ', 'রুমাহরণ', 'বিষকন্যা' ও 'সেতু' এই গল্পগুলি মূলত জাতিস্মর তথা পূর্বজীবনের স্মৃতির কথা-প্রসঙ্গ নিয়েই রচিত হয়েছে। স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের সংযোগসূত্র গড়ে উঠেছে এই গল্পগুলিতে। পূর্বজন্মের, দূর অতীতের জীবন বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বিধৃত হয়েছে এই শ্রেণির গল্পগুলির আখ্যান বস্তুতে। লেখক এই শ্রেণির গল্পে কথকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। উত্তম পুরুষের জীবনবন্দীতে তথা আত্মকথনরীতিতে এই গল্পগুলি রচিত হয়েছে। 'আমি' সর্বনাম পদ ব্যবহার করেছেন লেখক এখানে। জাতিস্মরতার মধ্যে দিয়ে

লেখক খূসর মায়াময় জগৎকে বাস্তবসম্মত রূপ দানে সক্ষম হয়েছেন। রোমাদের মায়াবী স্পর্শে পাঠককে দূর অতীতের ছায়াবাজির জগতে নিয়ে গেছেন। আমি, আমাকে প্রভৃতি সর্বনাম পদগুলিকে গল্পের কেন্দ্র বিন্দুতে এনে গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন। 'রুমাহরণ' গল্পটি থেকে তার পরিচয় নেওয়া যাক। — "সেদিন পাইন গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এদেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী শিকারীর চেহারা, — হাতে একটা ধনুক কিংবা বর্শ থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।" — এই পটভূমিই গল্পের প্রাণ কেননা পটভূমি বর্ণনার সূত্র ধরেই কথক গল্পের কথাবস্তুর গভীরে প্রবেশ করেছেন। বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন করতে করতে কথক অতীত জীবনে প্রবেশ করে অতীত যুগ জীবনের তথা জন্মান্তরের কথা পরিবেশন করেছেন — "এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিংবা যেন কোন অতীত যুগ হইতে ছিড়িয়া আনিয়া অর্ধঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।" বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, আখ্যান-নির্মাণে পটভূমির গুরুত্ব কতটা। প্রকৃতির বর্ণনা, কোনো কোনো আকস্মিক ঘটনা, আকস্মিক দৃশ্যাবলী প্রভৃতি সূত্র ধরে জাতিস্মরতায় প্রবেশ করেছেন লেখক। লক্ষণীয় দীর্ঘ প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি একে অপরের পরিপূরক। এক্ষেত্রে আধুনিক ছোটগল্পের বিধিবদ্ধ সীমাকে অতিক্রম করেছে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি। প্রকৃতির দীর্ঘ বর্ণনা, চরিত্রদের রূপ বর্ণনা, ঘটনার ঘনঘটা গল্পের আখ্যান নির্মাণে প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। গল্পের আখ্যান অনেকটাই শিথিল বিন্যস্ত ও বিস্তৃত হয়ে পড়ায় গল্পের আখ্যানে এসেছে কিছুটা সঙ্গতিহীনতা ও শিথিলতা। 'অমিতাভ' গল্পটি তার প্রমাণ। দীর্ঘ গল্প বলে যাওয়াটা — আখ্যানের দৃঢ়তাকে নষ্ট করে দেয়। তথাপি বলা যায়, তার গল্পের একমুখীভাব ও প্রাঞ্জল ভাষা গল্পের যাবতীয় দোষ-ত্রুটিকে ছাপিয়ে গেছে। 'শঙ্খ-কঙ্কণ', 'বিষকন্যা', 'তক্ত মোবারক', 'রুমাহরণ' প্রভৃতি গল্পগুলির আখ্যানের ক্ষেত্রে আধুনিক ছোটগল্পের আখ্যান-নির্মিত থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে লেখক আখ্যান নির্মাণ করেছেন। এ সমস্ত গল্পের প্লট মূলত দীর্ঘ পরিসরের। বোধ হয় লেখকের আখ্যান নির্মাণই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ছোটগল্পের নিয়ম-নীতির দিকে তাঁর খোঁক ছিল না। ফলত গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হলেও আধুনিক ছোটগল্পের সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে। গল্পের মহামুহূর্ত বা প্ল্যাইম্যাক্স (Pointing finger) অঙ্কনে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের প্রারম্ভিক ঘটনা বর্ণনার পর তিনি ক্রমবর্ধিস্ফূঃ ঘটনা বর্ণনা করে অন্তিম ঘটনা 'প্ল্যাইম্যাক্স' বা 'চরমতম ক্ষণের' সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে গল্পের সমাপ্তি অংশে তিনি গল্পের উৎকর্ষাকে বাড়িয়ে তৈরি করেছেন মহামুহূর্ত অংশটি। 'বিষকন্যা' গল্পের মহামুহূর্ত এরকম —

“উচ্কা — প্রাণময়ি —’ বিপুল আবেগে উচ্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন — আনন্দ-বেদনা।  
উচ্কা তাহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল — ‘প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনিভাবে আমায় মরিতে দাও।’  
সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণমিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি ঝরিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা উচ্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাহারই বক্ষ নিষ্পেষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।”

কী মর্মান্তিক এই দৃশ্য। ট্র্যাজেডির চরমতমরূপ এখানে প্রকাশিত। শুধু কি তাই, গল্পের আদ্যন্ত ঘটনা-চরিত্র কোনো-না-কোনো দিক থেকে ট্র্যাজিক মাত্রা পেয়েছে।

অন্যদিকে এই সতেরোটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে আখ্যান-নির্মাণের ভাষা হয়ে উঠেছে দু’ধরণের। এক, সাহিত্য গুণাশ্রিত ভাষা, দুই পাত্র-পাত্রীর মনজিয়ার ভাষা। একদিকে তিনি ভাষাকে মনোহারী করে গড়ে তুলেছেন অন্যদিকে পাত্র-পাত্রীদের মনোগহনের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে অন্তর্মুখিন ভাষারীতি নির্মাণ করেছেন। ফলত ভাষা কখনো হয়ে উঠেছে রোমান্টিক ছাঁচের কখনো বা শাগিত গোত্রের।

শরদিন্দুবাবুর আখ্যান-নির্মিত কৌশলপণার দিকে তাকালে আরও কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ইতিহাসাশ্রিত গল্পের আখ্যান নির্মাণে তিনি কখনো বর্তমান থেকে অতীতে প্রবেশ করেছেন আবার কখনো বা অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে কখনো বা বর্তমান থেকে অতীতে প্রবেশ করে অতীতেই কাহিনির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। শরদিন্দুবাবুর জাতিস্মর-মূলক গল্পগুলি তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা গল্পগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট করে দেখাতে পারি : ‘অমিতাভ’ গল্পে চিত্রটি এরকম —

বর্তমান জীবন = কেরানী।

অতীত জীবন = রাজভাস্কর পুণ্ডরীক।

বর্তমান জীবন = অতীত জীবন থেকে পুনরায় ফিরে এসেছেন এবং ঘরের কোণে বসে লেখায় মগ্ন থেকেছেন।

অতীত জীবন = মায়াময় জগতে প্রবেশ ও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গের কথা (আড়াই হাজার বছর পূর্বের কথা)।

‘অমিতাভ’ গল্পে তিনি বর্তমান জীবনে কেরানী হিসেবে জন্মেছেন এবং পূর্বজন্মে রাজভাস্কর পুণ্ডরীক ছিলেন। অতীতে প্রবেশ করে তিনি সেই পূর্বজন্মের জীবন-বৃত্তান্তের কথা তুলে এনেছেন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তিনি অতীত জীবনকে দেখেছেন জাতিস্মরপ্রকরণ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ‘অমিতাভ’ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য জাতিস্মর-মূলক গল্পগুলিতে এরকম গল্প বলার রীতি লক্ষণীয়। ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘রুমাহরণ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’ প্রভৃতি জাতিস্মর-মূলক গল্পগুলির বর্ণনারীতি, বাচনভঙ্গি মূলতঃ একই ধরণের। এগুলিতেও কখনো বর্তমান কখনো অতীত আবার কখনো বা অতীতেই কিংবা বর্তমান কালে ফিরে এসে কাহিনির

যবনিকা টেনেছেন।

এইভাবে শরদিন্দুবাবু অভিনব কৌশলে প্লট রচনা করে পাঠককে রোমাঙ্গের জগতে নিয়ে যান। এই ধরণের আখ্যান বর্ণনা সত্যিই পাঠককে মুগ্ধ করে তোলে। প্রথাগত আখ্যান-নির্মাণের রীতি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মূলত জাতিস্মর-মূলক প্রকরণ-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কী করে পুরাতন পাত্রে নতুন রস পরিবেশন করা যায় সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছেন বিস্তর। কখনো কখনো প্লট রচনায় তিনি অকৃপণ প্রশংসাও পেয়েছেন। ভাষা রীতির মূল্যায়নে তাঁর আত্মমত হল — Style দেখাইবার চেষ্টা করিবে না, মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই style আসিয়া পড়িবে। (লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮, দ্বাদশ খণ্ড)

সুতরাং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পসমূহের ভাষারীতি, আখ্যান নির্মাণ পদ্ধতি, উপস্থাপনভঙ্গি, পটভূমি নির্মাণ, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যেমন চিত্রিত হয়ে উঠেছে তেমনই হয়েছে ব্যঞ্জনাময় ও প্রতীকধর্মী। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ছোটগল্পের আঙ্গিক ও রচনা-রীতি তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে সবিশেষ ধরা না পড়লেও উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সুনিপুণ পরিবেশনা আধুনিক ছোটগল্পের প্রকৃত রসাস্বাদনের স্তরে নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, শরদিন্দুবাবুর প্লট রচনা ও বর্ণনার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই ইতিহাসাশ্রিত গল্প-সমূহের সৃষ্টি কৌশল প্রক্রিয়ারই গভীরে। যাইহোক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলির ব্যাখ্যা ও বিচার অনেকটাই একদেশদর্শিতার পথ থেকে সরে এসে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করায় ইতিহাসাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলির ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গের কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনই প্রকরণ বিকল্পণের দিকটিও যথার্থ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

এবার অতীতাশ্রয়ী দু'একটি উপন্যাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া যাক। ইতিহাসাশ্রয়ী ছোটগল্পের প্রকরণ কৌশল যেমন অত্যন্ত প্রশংসাধন্য তেমনই অতীতাশ্রয়ী ইতিহাসমূলক উপন্যাসেরও রচনাকৌশল পাঠক-সমালোচকের প্রশংসা লাভ করেছে। বলা যায়, ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়টিও মূলত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাসেরও শিল্পশৈলী নির্মিত হয়েছে। ইতিহাসের চরিত্র, আখ্যান, ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা ও জীবনযাপন প্রণালী এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে আখ্যান রচনাও তাঁর রচনামূল্যকে অনোন্যমাত্রা দান করে। তাঁর গদ্যরীতি মূলত ঝা চকচকে। কোনো মরচে নেই। স্বচ্ছতোয়া নদীর মতো বেগবান। জড়তা নেই, আড়ষ্টতা নেই। শুধু গতিময় ও বেগমান। পদ্য নয়। অথচ পদ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গদ্যের চলন ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ধারণার পরিচয় আমরা পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার চাল দেখে তাই-ই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় — “এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। ... সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, ... সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রাম্মার ঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার সঙ্গে মৃদঙ্গর বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। ...

গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতি ভঙ্গি আর্বাধা।”<sup>৫</sup> শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গতি ঠিক তাই। তার চলন সর্বত্র। অবাধ গতি। নদীর ঘাট, রান্নারঘর বাসর ঘর সর্বত্র। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে — “চাঁদ অবশ্য অনেক আগেই উঠিয়াছিল, দিকচক্র হইতে প্রায় একরাশি উর্ধ্বে-আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণচন্দ্র, কিন্তু পরশ ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহারই আলোকে বিদ্যুন্মালার ঘুমন্ত মুখখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত বেণী চুলগুলি বিব্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিগু অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে অযত্নভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, বড়ের আক্রোশে উন্মলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিষ্কিণ হইয়াছে।”<sup>৬</sup> এভাবেই তিনি তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যানগুলির গদ্য প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এক নূতন রীতির গদ্য রচনামৌলিক পাওয়া যায়। সাধু চলিতে এমন মেশামোশি আর অন্য কোনো লেখকের রচনায় অন্তত এভাবে দেখা যায় না। বললে অত্যাধিক হবে না যে, চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পাশাপাশি সাধুরীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহার এত স্পষ্ট, এত সাবলীল এত গতিময় — তা তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যান পাঠে আমাদের বিস্মিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, শুধু সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারও র তাঁর লেখাগুলিকে অনন্যসুলভ করে তুলেছে।

পাঠের দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে। আর ভাষা ও ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভাষা ব্যবহারে অযথা অহেতুক পদ ব্যবহার করতে চাননি। প্রতিবেশ পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট বিষয়ানুসারী ভাষা ব্যবহারে তিনি পক্ষপাতী। তিনি যে সময়ের সমাজ জীবনেতিহাস উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে ধরতে চেয়েছেন তা ভাষার মাধ্যমে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। এমনকি ভাষার মাধ্যমে তৎকালীন সামগ্রিক জীবনচিত্র বিধৃত হয়ে উঠেছে তাঁর এই ধরনের লেখাগুলিতে। ক্লাসিক্যাল যুগের চিত্রকে ফোটোনোর জন্য তিনি ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা একাধারে ধ্রুপদী ও আধুনিক। ভাষার প্রবাহ সময়ের নিরিখে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। কারণ ভাষা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয় না, গুরুত্ব দেয় বিষয়কে। বিষয়ের গুরুগম্ভীর চালে বা হালকা চালে চরিত্র ও গুরুগম্ভীর ও হালকা চালের ব্যক্তি হয়ে উঠে। তাই তো খুব স্বাভাবিকভাবে শরদিন্দুর ‘কালের মন্দির’র স্কন্দগুণ্ড আর শশিশেখর নামক দুই ভিন্ন চালের চরিত্র পেয়েছি। অন্যদিকে ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার ছবি দুই বিপ্রতীপতায় অঙ্কিত। যদিও অ্যারিস্টটলের ভাষায় — চরিত্র অপেক্ষা আখ্যানের গুরুত্ব অধিক তবুও চরিত্র ছাড়া আখ্যান নিশ্চল ও নিস্তরঙ্গ। অনুজ্জ্বল চরিত্র সম্বলিত আখ্যান তাৎপর্যহীন ও এককালীন। যেমন — ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ এবং ‘আলালের ঘরের দুলাল’ জাতীয় আখ্যানধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের চরিত্রদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর ফুটে ওঠে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। তাদের মুখে ব্যবহৃত ভাষাও আখ্যান বিন্যাসকে করে তোলে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতার্থক। অবশ্য এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, শরদিন্দুর অন্যতম আখ্যান নির্মাণ কৌশল হ’ল — এক, এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচয় উদঘাটন। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসে বিগ্রহ-বীরশ্রী,

অনঙ্গ-বাকুলির চরিত্র তারই প্রমাণ। দুই সূচনা পর্বে কথিত আখ্যানের অর্ধসমাণ্ডি ও পুনরায় সমাণ্ডি অংশের সঙ্গে সংযোগ সূত্র স্থাপন। এতে ঔপন্যাসিকের বুদ্ধিদীপ্ত মননেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা, সাবলীলতা, স্পষ্টতা, কথার সামাজিক তারতম্য, ব্যক্তিগত স্বরের বৈচিত্র্যময় ভিন্নতা<sup>১</sup> আখ্যানকে আরও কালজয়ী করে তোলে।

রহস্যলাপ ও হাস্যরসের সংলাপ পরিবেশনেও শরদিন্দুসিদ্ধহস্ত —

‘বলরাম বলিল — ‘বাপু, কে তুমি? তোমার নাম কি? এখানে কি চাও?’

লোকটি বলিল — ‘আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আমার নাম চতুর্ভূজ নায়ক।’

বলরাম বলিল — ‘কাকে পাহারা দিচ্ছ?’

চতুর্ভূজ নায়কের গৌঁফ এবং দাড়ির সঙ্গমস্থলে একটু শ্বেতাভা দেখা দিল — ‘তোমাদের পাহারা দিচ্ছি।’

বিস্মিত হইয়া বলরাম বলিল — ‘আমাদের পাহারা দিচ্ছ? আমাদের অপরাধ?’

‘তোমরা গোপনীয় রাজকার্যে ব্যাপৃত আছ। পাছে বাইরের লোক কেউ আসে তাই মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি।’

‘বুঝলাম। রাত্রেও কি পাহারা থাকে?’

‘থাকে।’

‘তুমি একা পাহারা দাও, না তোমার মতন চতুর্ভূজ আরো আছে?’

এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজিক সম্মানের তারতম্যে ভাষার মেজাজ ও পরিস্থিতি

বদলে গেছে। বলরাম পার্শ্বচরিত্র। তাই তার ভাষাতেও এসেছে চটুল ও দুলাকি চাল। ভাষা

উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রাণ। তাই ভাষা শুধুই একটি আখ্যানের বহিঃরঙ্গ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না।

অন্তঃরঙ্গ সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করে। ভাষার কারণে অনেক কবি সাহিত্যিকের রচনা মাটি হয়েছে।

বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কমলকুমার মজুমদারের ভাষা অনেকটাই সুখপাঠ্য নয়।

কমলকুমারের ভাষার গতি প্রকৃতি অনন্য। তাঁর ভাষার প্রাণ আছে কিন্তু — ‘তাঁর অন্তর্জলী যাত্রা

উপন্যাসের নতুনরূপ ও ভাষা আমাদের মুগ্ধ করলেও, কমলকুমার-এর উপন্যাস সাধারণ পাঠকের

জন্যে না।’<sup>২</sup> ভাষায় ভর করে একজন কথাকার সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মনৈতিক,

অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক সর্বোপরি জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করেন ভাষা-বিন্যাসের ওপর

নির্ভর করে। তদুপরি ভাষার সৌন্দর্যে উপন্যাস ছোটগল্পের সৌন্দর্যও ফুটে বেরোয়। ভাষা মাটি

হ’লে উপন্যাস ছোটগল্পের আখ্যান-বিন্যাস, চরিত্র-বিন্যাস ও ভাষা-বিন্যাস সমস্তই মাটি হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিখুঁতভাবে বিচার বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্ক থেকে ভাষাকে

কীভাবে প্রাজ্ঞল ও স্পষ্টরূপে ব্যবহার করা যায়, তার নব নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তার রচিত

কথাসাহিত্যগুলিই উজ্জ্বল প্রমাণ। সমালোচকের ভাষায় — ‘...আশ্চর্য এই—আপনার লেখায় এ

রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধহয় তার কারণ আপনার গ্লটের বা বর্ণনার

দুনির্ব্বার আকর্ষণ।’<sup>৩</sup> (চিঠি, তারিখ ০২.০৩.১৯৫৩) বাস্তবসম্মত জীবনযেবা ভাষার আকর্ষণও

তদরূপ। ‘কুমারসম্ভবের কবি’ উপন্যাসটিতে কবি কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনির পশ্চাতে

দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বমখিত প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। পাত্র-পাত্রীরা যেন সকলেই বাস্তব মর্মর পৃথিবীর। সকলেই যেন যশপ্রাপ্তি-খ্যাতি ও যশহীনতা-খ্যাতিহীনতার লড়াই করছেন। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের জীবনধারণ ও পালনের লড়াই — এক কথায় ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের শেষে মানবিকতায়, প্রেম-বিহ্বলতায়, অহঙ্কার-শূন্যতায় রাজরাণী রাজপ্রসাদ থেকে পর্ণকুটিরে নেমে এসেছেন। এক্ষেত্রে লেখক সম্পদের চেয়ে, ঐশ্বর্যের চেয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। তাই ভাষাও হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষা, “কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন — ‘কিন্তু দেবী, এ যে অসম্ভব। এই দীন পর্ণকুটিরে — না না, এ হতে পারে না —’

হৈমশ্রী বলিলেন — ‘যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন। সেখানে আমিও থাকতে পারব।’

কালিদাস বলিলেন — ‘না না, তুমি রাজার মেয়ে —’

হৈমশ্রী বলিলেন — ‘আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে, এখন আমি মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।’”<sup>২১</sup>

রাজার মেয়ে হৈম আজ পর্ণকুটিরে স্বামীর সঙ্গে থাকবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। নিজেকে আর রাজার মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতে সে নারাজ। এখন থেকে সে কালিদাসের স্ত্রী। সত্যিই লেখক রাজেশ্বর্যের অন্তরালে ভারতীয় দাম্পত্য সম্পর্কের শাস্ত্র সত্যরূপ প্রকটিত করতে চেয়েছেন। হৈমশ্রী যেন আধুনিক নারী। স্বামীর পরিচয় দিতে সে কুণ্ঠা বোধ করেনি। স্বামীর পরিচয়ে সে বাঁচতে চায় — পিতার পরিচয়ে নয়। এ যেন সত্যিকারের একটি খাঁটি আধুনিক দাম্পত্য সম্পর্কের মিলনধর্মী উপন্যাস। অতীতের ছোঁয়া, স্পর্শ, কুহেলিকা রয়েছে ঠিকই কিন্তু অতীতের কুহেলিকা উপন্যাসের আখ্যানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ভাষার শাণিত রূপ হৈমশ্রী ও কালিদাসের চরিত্রকে সেকালের পারিপার্শ্বিকতা থেকে টেনে নামিয়েছে বাস্তবের মাটিতে। কথোপকথনধর্মী ভাষা প্রয়োগের ফলে চরিত্ররাও অনেক সময় নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বন্দ্বময়তার সঙ্গে নাটকীয়তাও এসেছে সমানে সমানে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও এই ব্যক্তি চরিত্রের পরিস্ফুটন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই।

‘অর্জুন বলিল — ‘তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগদত্তা।’

বিদ্যুৎমালা বলিলেন — ‘আমি কাউকে বাগদান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব?’

‘তোমার পিতা তোমাকে দান করেছেন।’

‘আমি কি পিতার তৈজস? আমার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই!’

‘শাস্ত্রে বলে স্ত্রী জাতি কখনো স্বতন্ত্র্য পায় না।’

‘ও শাস্ত্র আমি মানি না। আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।’”<sup>২২</sup>

উপরিউক্ত কথাগুলি থেকে কি আমাদের মনে হয় শরদিন্দুর লেখাগুলি ইতিহাসের ভারে ভারাক্রান্ত? অলৌকিক জীবন বিন্যাসের ছবি? ইতিহাসের গুরুগম্ভীর জীবন কি এতে পাওয়া যায়? রাজপুত্র রাজকুমারির জীবন-নাট্যের ভাষা কি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করায়? না। এ

ভাষা, এ চিত্র বর্তমানকালের। বাস্তব-মর্মর জীবনের ছবি। ইতিহাসে একজন রাজকুমারির কি এত স্পর্ধা থাকতে পারে? আমাদের মনে হয় না। তাই বলা যায়, এ নারী বর্তমানের, বাস্তবের, ও আধুনিক মননের। স্বভাবতই ভাষাও হয়ে উঠেছে বাস্তবের চরিত্রের অনুসারী সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা। যে নারীর মধ্যযুগে বাকস্বাধীনতার অধিকার ছিল না। সে নারী কীভাবে অকপটে উচ্চারণ করে 'ও শাস্ত্র আমি মানি না।' এতো মধ্যযুগীয় নারীর মনের কথা নয় — মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে নির্মিত আধুনিক চিন্তানের নারীর আঁতের কথা।

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের কৌশল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই তাকে বলতে শোনা গেছে স্টাইল দেখানোর চেষ্টা করবে না, মনের ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করলে স্টাইল আপনি এসে পড়বে। এমন কথা যিনি বলতে পারেন। তিনি কি ভাষা সম্পর্কে নিবিড় চিন্তা না করে থাকতে পারেন। আর চিন্তা করেছেন বলেই তাঁর সৃষ্ট ভাষা এত অনায়াস সুন্দর, প্রাণবন্ত ও চলমান। মূলত ভাষার আকর্ষণীয় শক্তির জন্যই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি পাঠকের আকর্ষণ বাড়ায়। আর এই আকর্ষণের কারণেই তাঁর এ জাতীয় লেখাগুলি বহু চর্চিত ও সমাদৃত। তাই তাঁর বইগুলি আজও পাঠক সমাজের কাছে জনপ্রিয়।

#### নির্দেশিকা :

১. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪০
২. তদেব, পৃ. ১
৩. R. G. Collingwood, The Idea of History, p. 240.
৪. তদেব, পৃ. ৩
৫. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ছন্দ-মীমাংসা ও অলঙ্কার সমীক্ষা, পৃ. ২৭০
৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫১২
৭. বিপ্লব মাঝি, উপন্যাসের ভাষা, পৃ. ১৬
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৬৩
৯. বিপ্লব মাঝি, উপন্যাসের ভাষা, পৃ. ৩২
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৬
১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯
১২. তদেব, পৃ. ৫৭১

লেখক - সাবলু বর্মণ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

হিজল

**Hijal**

ISSN 2349-8013

A bi-annual Journal based on research-oriented literary and cultural  
discourse

(Refereed Journal)

বর্ষ - ২৪, সংখ্যা - ১ম

প্রকাশ : জুন, ২০১৭



Website : [hijalpatrika.wordpress.com](http://hijalpatrika.wordpress.com)

বিনিময়: ১০০ টাকা মাত্র

রাজু সাহা কর্তৃক শামুকতলা, পোঃ সান্তালপুর, জেলা-আলিপুরদুয়ার, ৭৩৬২০৬ থেকে প্রকাশিত

E-mail address: [hijal4680@gmail.com](mailto:hijal4680@gmail.com), [sourav4680@gmail.com](mailto:sourav4680@gmail.com)